উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম ঃ তুলনামূলক আলোচনা

অভিসন্দর্ভ

GIFT

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

382343

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মুহাম্মদ আবদুল হক
এম.এ. (ঢাকা)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Library
382343

জুন, ১৯৯৮ইং

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মদ আবদুল হক কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত ''উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম ঃ তুলনামুলক আলোচনা'' শীর্ষক থিসিসটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা থিসিসটির চূড়ান্ত কপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

382343

(ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ত্বাহা হোসাইন

382343

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তাওফীক আল-হাকীম।

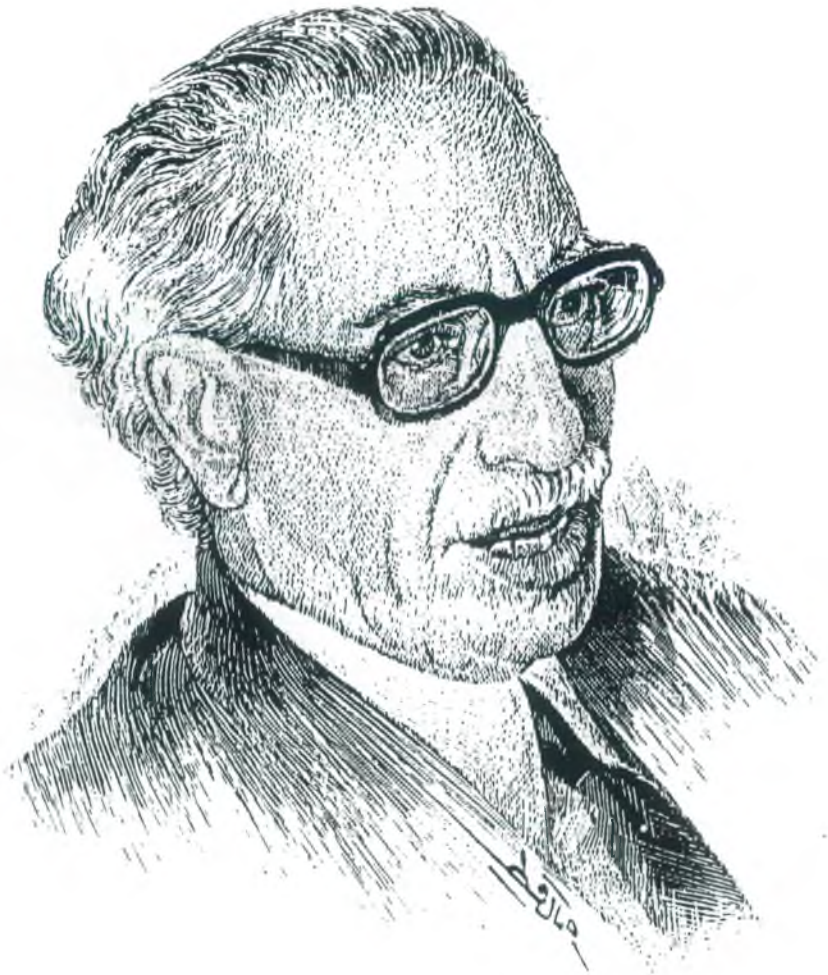

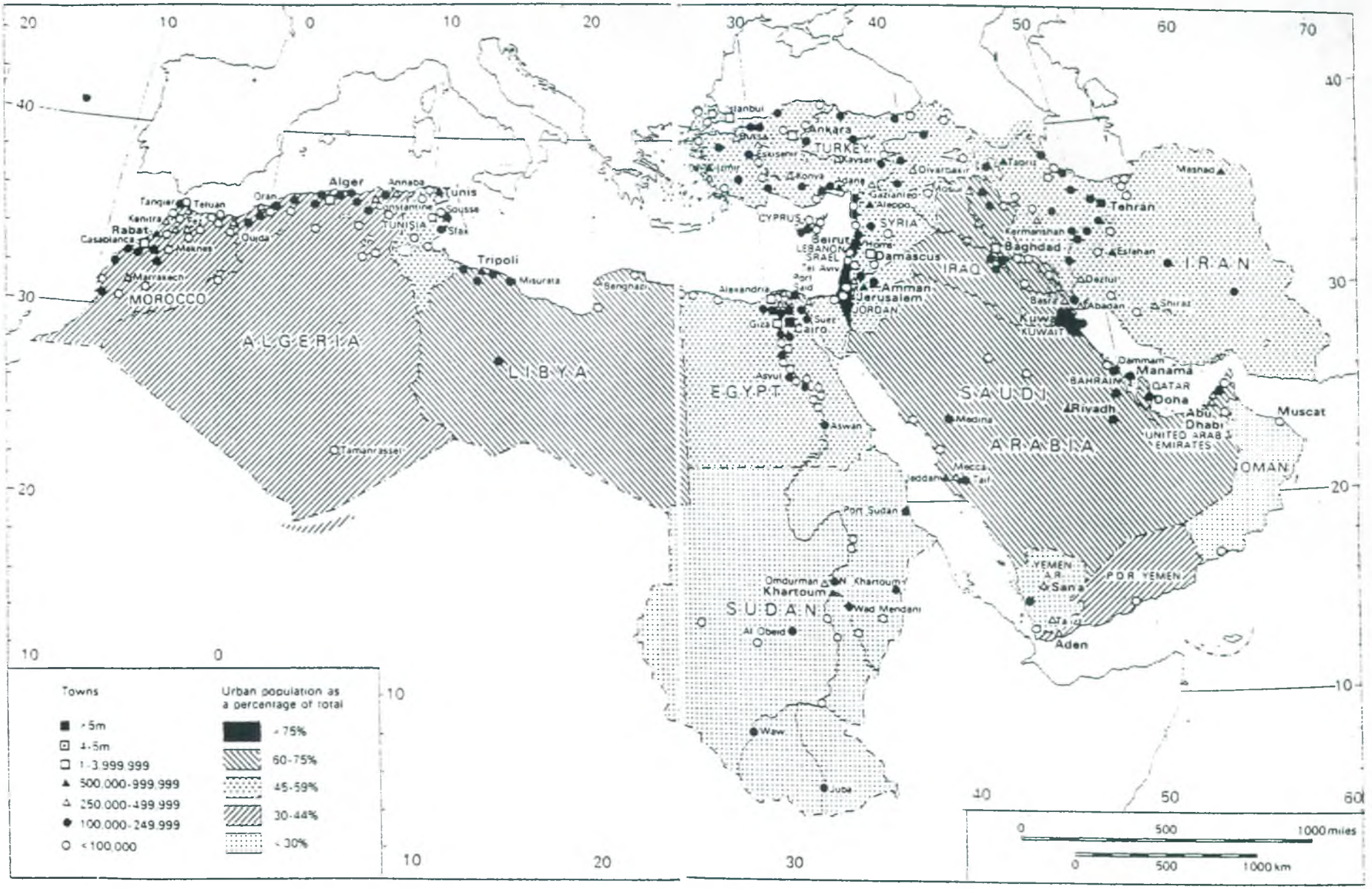

তদানিন্তন আরব বিশ্বের একটি মানচিত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ আধুনিক আরবী উপন্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১০-২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ত্বাহা হোসাইনের জীবনী	৩০-৬০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ তওফীক আল-হাকীমের জীবনী	৬১-১০৯
চতুর্থ অধ্যায়ঃ উপন্যাসিক হিসেবে ত্বাহা হোসাইন	১১০-১৪২
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপন্যাসিক হিসাবে তওফীক আল-হাকীম	১৪৩-১৯৪
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	১৯৫-২১৫
সপ্তম অধ্যায়ঃ বিশ্ব সাহিত্যে তাঁদের উপন্যাসের স্থান	২১৬-২১৯
গ্রন্থপঞ্জী	২২০-২২৬

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

আরবী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষার অন্যতম। বর্তমানে ২১টি দেশে আরবী ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রচলিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় আরবী সাহিত্যের রয়েছে দীর্ঘ যুগের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আরবী সাহিত্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অন্যতম।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আরবী সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আরবী কথা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা আধুনিক আরবী উপন্যাস। ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পে সমৃদ্ধ আধুনিক আরবী উপন্যাস আন্তর্জাতিক মানে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত। ইতিমধ্যে ১৯৮৮ খৃ. সালে আধুনিক আরবী উপন্যাসিক মিসরের নাজীব মাহ্‌ফূজ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

নাজীব মাহ্‌ফূজ নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি তাঁর সবিনয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন মূলতঃ এই পুরস্কার ডঃ ত্বাহা হোসাইন, তওফীক আল-হাকীম এবং আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ এই তিন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সাহিত্যে নাজীব মাহ্‌ফূজের পূর্বসূরী। তাই আধুনিক আরবী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এদের প্রসঙ্গ অবশ্যই আসতে হবে। উল্লেখিত তিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে ডঃ ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসের আঙ্গিক, টেকনিক, বৈশিষ্ট্য, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করাই হচ্ছে বক্ষমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

'উপন্যাসিক হিসেবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমঃ তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে যেসব বিষয় যেভাবে সাজানো হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা। ভূমিকায় আধুনিক আরবী উপন্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডঃ ত্বাহা হোসাইনের জীবনী বর্ণিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবনের সাথে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সহ সাহিত্যে তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান এবং তাঁর রচনাবলীর পর্যালোচনা রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তওফীক আল-হাকীমের জীবনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে উপন্যাসিক হিসেবে ত্বাহা হোসাইন শীর্ষক নিবন্ধে তাঁর ৫টি উপন্যাসের বিবরণ ও সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপন্যাসিক হিসেবে তার রচনাশৈলীর মূল্যায়ণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে উপন্যাসিক তওফীক আল-হাকীমের স্থান ও মান নিরূপন করা হয়েছে এবং তাঁর ৫টি উপন্যাসের বিভিন্ন আঙ্গিকে ও শৈল্পিকরূপ চিত্রিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে সপ্তম অধ্যায়ে বিশ্ব সাহিত্যে তওফীক আল-হাকীম ও ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের সঠিক স্থান সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূল্যায়ণ করে আলোচনা করে গবেষণা প্রবন্ধের উপসংহার টানা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা ক্ষেত্রে রচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সতর্ক সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। তাই দেশ ও বিদেশের অনেকের কাছেই গবেষক গভীরভাবেভাবে কৃতজ্ঞ। ১৯৯০ খৃ. সালে গবেষক সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন কোটি গ্রন্থের সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ শাওকী দায়ফ ও অধ্যাপক ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর এর আধুনিক আরবী সাহিত্য বিষয়ের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ গবেষকের যথার্থ সহায়ক হয়েছে। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা প্রতিনিয়ত গবেষণা কর্মকে আরো গতিশীল করেছে। বাংলা উপন্যাসের উপর রচিত অভিসন্দর্ভ অধ্যয়ন করেও সমালোচনার নীতিমালা অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কাজে আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, এম.এ (ঢাকা), পি এইচ.ডি (আলীগড়), প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তিনি পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ দিয়েছেন । এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি আমার শিক্ষক বৃন্দের মধ্যে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন জনাব আ.ত.ম.মুছলেহ্ উদ্দীন এম.এ.(ট্রিপল) ঢাকা, সহযোগী অধ্যাপক আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, এম.এ. ঢাকা, পি.এইচ.ডি. লন্ডন, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক নাজির আহমদ, এম.এ. ঢাকা, চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান, এম.এ.ঢাকা, ডিপ্লোমা ইন মর্ডাণ এরাবিক খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয় (সুদান), অধ্যাপক আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ এম.এ. ঢাকা পি এইচ.ডি.ঢাকা, অধ্যাপক উর্দু ও ফার্সী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে জনাব মাহ্ফূজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ডঃ আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, আবদুস সালাম আজাদী, শিক্ষক, মালয়েশীয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মুহম্মদ গিয়াসউদ্দীন, প্রভাষক, আরবী বিভাগ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, সহকারী অধ্যাপক আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবদুল্লাহ্ আল-মারুফ উপ পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জনাব আবদুল জলিল গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আমি তাদের সবাইকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিসরীয় শিক্ষক ডঃ হায়েল, ডঃ আবুল ফতুহ্, ফিলিস্তীনি শিক্ষক ডঃ খলীল সহ অন্যান্য আমার শিক্ষক ও আমার বসনীয় বন্ধু আদনানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, তিনি আমাকে গবেষণা উপকরণ সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমার শ্রদ্ধেয় কবি আবদুস সাত্তার আমাকে ত্বাহা হোসাইনের কয়েকটি বই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। আমি তাঁর স্নেহধন্য। বাংলাদেশে মিসরীয় বিজ্ঞ রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলে আমি উপকৃত হয়েছি। আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগারের সহকারীদের প্রতি। নিউ জেরক্স ওয়ার্ল্ড কম্পিউটারের জনাব মাজহারুল ইসলাম গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সুন্দর মুদ্রনে শ্রম দিয়েছেন আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জুন, ১৯৯৮ খৃ.
ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আরবী উপন্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আরবী উপন্যাসের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কিংবদন্তী, লোককাহিনী, গীতিকাহিনী, ছোট গল্প, উপাখ্যান, এসব পর্যায় অতিক্রম করে অতঃপর এক সময় পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক আরবী উপন্যাসের সূচনা হয়। পাশ্চাত্যের লেখকগণ আধূনিক আরবী উপন্যাসকে তাদের সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট বিষয় বলে মনে করেন এবং এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রভাবকেই মুখ্য বলে দাবী করেন। আরবগণ আধুনিক আরবী উপন্যাসের যাত্রা শুরুর ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রভাবকে স্বীকার করেন তবে তারা এর পিছনের দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অস্বীকার করেন না।

আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক ডাঃ শাওকী দায়ফ বলেনঃ আরবী সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাস একেবারে নতুন নয়, বরং প্রাক ইসলামী যুগের সাহিত্যেও অনেক গল্প বা উপন্যাস খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলো আরবদের জীবন ও তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হয়েছিল[১]। আর পবিত্র কুরআনে অনেক গল্প বা কাহিনী রয়েছে, যার মধ্যে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী, এবং যে জনপদ ও জনগোষ্ঠীর নিকট তারা প্রেরিত হয়েছেন তাদের সম্পর্কিত কাহিনী রয়েছে। উমাইয়্যা যুগে এ সাহিত্যের তেমন উন্নতি হয়নি। পরবর্তী সময়ে আব্বাসীয় যুগে অনেক গল্প লিখা হয় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে আরবীতে অনেক গল্প অনুবাদ করা হয়। যেমন, ভারতীয় গল্প বা উপাখ্যান থেকে ইব্ন আল- মুকাফফা 'কালীলা ওয়া দিমনা' আরবীতে অনুবাদ করেন।

পশুপাখির কথোপকথন এর মাধ্যমে রম্য রচনায় এসব গল্পে সামাজিক চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও 'সীরাতু আনতারা' নামক আরবদের নিজস্ব রচনা সমৃদ্ধ গল্প সংকলন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও শব্দালংকারের দিক থেকে এসব কথা সাহিত্য খুবই

---

১. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর,
(কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬১ খৃ.) পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ ছিল। এমনিভাবে 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা' (এক হাজার এক রজনী) যা বাংলা সাহিত্যে আরব্য উপন্যাস বা আরব্য রজনী বলে পরিচিত। এ সব বৃহৎ আকারের গল্প সংকলন খুবই জনপ্রিয় ছিল। অতঃপর ছান্দিক গদ্যে রচিত ছোট গল্প ও একাঙ্কিকার সূচনা হয়। আল্‌ফ লায়লার চলচ্চিত্ররূপ (এ্যারাবিয়ান নাইট্‌স) পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মাকামাত সাহিত্য এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে। পাশ্চাত্য ভাষায় এর ব্যাপক অনুবাদ হয়, এবং এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। তখন ছিল আব্বাসীয় যুগের মুসলিম সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগ। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে মুসলিম সাম্রাজ্য গোটা পৃথিবীর মধ্যে প্রভাবশালী শক্তি ছিল। অতঃপর আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়, তখন থেকে আরবী সাহিত্যের পতনও ঘনিয়ে আসে। গল্প ও রম্যরচনার ক্রমবিকাশও বাধাগ্রস্থ হয়।

বস্তুতঃ কোন জাতির উত্থান-পতনের সাথে তাদের ভাষা-সাহিত্যের পতন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আরবী সাহিত্যের পতনের সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আব্বাসীয় যুগের পতনের পর থেকে শুরু হয় আরবী সাহিত্যের বন্ধ্যাত্বের যুগ। মিসরে ফরাসী নৃপতি নেপোলিয়নের অভিযানের সাল ১৭৯৮ খৃ. কে ঐতিহাসিকগণ আধুনিক আরবী সাহত্যের রেঁনেসা যুগ ও বন্ধ্যাত্বের যুগের সীমারেখা বলে উল্লেখ করে থাকেন।

উপনিবেশিক আমলে মুসলমানদেরকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধরত দেখা যায়, এ প্রচেষ্টা থেকে তারা নিজস্ব সাহিত্য রচনা ও তার উন্নয়নে নিষ্ঠাবান হতে শুরু করে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পড়ে আরব উপনিবেশের উপর। আরবী ভাষা সাহিত্য তথা আরবদের জীবন ও সংস্কৃতি সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সে প্রভাব আরব সমাজ জীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সাড়া জাগায়।

সাহিত্যের ইতিহাস বেত্তাগণ বলেনঃ সাহিত্য জীবনের গন্ডি রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই তারা প্রতিটি যুগ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে সাহিত্যের প্রভাব বলয়ের সাধারণ জনজীবন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে সাহিত্য জীবন আর বিশেষভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর রাজনৈতিক জীবনকে পরিস্ফুটিত করে তুলেন। যেহেতু মিসরে ফরাসী আক্রমণ একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। অতএব মিসরের ইতিহাস ও জনজীবনের উপর রয়েছে এর বিরাট প্রভাব। আর ফরাসী সমর নায়ক নেপোলিয়ন একই বছর ১৭৯৮ খৃ. সিরিয়াও জয় করেন। আর সিরিয়ায় ইতিপূর্বে খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে ইউরোপের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় গোটা পৃথিবীতে কমবেশী পড়েছিল।

নেপোলিয়নের সাথে শুধু যে সেনাবাহিনী ছিল তা নয়, বরং তার সাথে ছিল বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও অনুবাদকের একটি দল। আর নেপোলিয়ন সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র। এসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু রচনা প্রকাশ পাওয়ায় আধুনিক আরবীর যাত্রা শুরু হয়। ১৮০১ খৃ. ফরাসীরা মিসর ত্যাগ করে। অবশেষে ১৮০৫ খৃ. মাম্লূক বংশের ধ্বংস সাধন করে আলাভী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী পাশা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি এক বিশাল রাজ বংশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিজের ক্ষমতা নিরংকুশ করার তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি মিসরকে আধুনিক ইউরোপের ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। সামরিক স্কুল, প্রকৌশল বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় এবং অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক ও সাহিত্য আরবীতে অনুবাদ করার উদ্যোগ নেন। এ সময় অনেক ফরাসী ও ইংরেজী বই আরবীতে অনূদিত হয়। এসবের মধ্যে কিছু ফরাসী ও ইংরেজী গল্প, উপন্যাস ও নাটকের বইও ছিল। অতঃপর যখন বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিদল ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে আসে তখন আরবী সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তারা প্রথমে ব্যাপক অনুবাদের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। মিসরে এদের হাতে আধুনিক আরবী উপন্যাসের পথ চলা শুরু হয়। আরবীতে ব্যাপক রচনা শুরু হয় ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ধারায় নতুন আঙ্গীকে অথবা নতুন ইউরোপীয় রচনাশৈলীতে রচিত এ সব গল্প ও উপন্যাস আধুনিক আরবী উপন্যাসের সুচনা পর্ব হিসাবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করা যায় সিরীয় লেখকদের কথা, যাদের মধ্যে খৃষ্টান মুসলমান উভয় শ্রেণীই ছিল। আর তারা অধিকাংশই ছিল পাশ্চাত্য আদর্শ কর্তৃক প্রভাবিত। তৎকালীন সিরিয়ার লেবাননে ইংরেজরা সর্ব প্রথম মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে সরাসরি আরবদের মধ্যে তাদের চিন্তা চেতনা বিতরণ শুরু করে। এখানেই আধুনিক আরবী উপন্যাসের সুতিকাগার। তবে প্রথমে কিংবদন্তী উপাখ্যান, ধর্মীয় কাহিনী ও লোক কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। সিরিয়ায় খ্রীষ্টান মিশরীয় কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশের একটি কৌশল হিসেবে কাজ করেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজ চিন্তা এবং খৃষ্ট ধর্ম সিরিয়ায় সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। সৃষ্টি হয় আধুনিক বৈরুত শহর। নতুন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে লেবানন নামক নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। শুরু হয় খ্রীষ্টান-মুসলমান সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষ এখনো শেষ হয়নি।

বৈরুতের খ্রীস্টানদের হাতেই আরবী ভাষায় ইউরোপীয় সাহিত্য রচনার ও অনুবাদের সূত্রপাত হয়। রাজনৈতিক সংঘাতের এক পর্যায়ে বেশকিছু লেবাননী যাদেরকে মিসরীয় লেখকগণ সিরীয় মুহাজির বলে উল্লেখ করেছেন মিসরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহিত্যিক ছিলেন যাদের মাধ্যমে বৈরুতের আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়।

মধ্য প্রাচ্যে ইউরোপীয় মডেলের প্রথম শহর বৈরুত, যা প্রাচ্যের প্যারিস হিসেবে খ্যাত। আধুনিক মুদ্রণব্যবস্থা ও ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বৈরুত থেকে অন্যান্য আরবদেশে রপ্তানি হতে থাকে। আধুনিক উপন্যাস ও আধুনিক আরবী নাটকের কার্যক্রম যাত্রা শুরু হয় এখানেই। মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বৈরুত দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত আরব বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। অধুনা কায়রো ও সৌদী আরব প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পরে খনিজ তেল উত্তোলনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদী আরব অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া রাষ্ট্র ভেঙ্গে লেবানন নামে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে লেবাননের সাথে আধুনিক সিরিয়ার রাজনৈতি দ্বন্দ্ব স্থায়ীরূপ লাভ করে। ইতিপূর্বে সিরিয়ার মানচিত্রে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশে দেশে আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আদর্শিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চলতে থাকে। ইতিপূর্বে তুর্কী খিলাফত দুর্বল হয়ে অনেকটা তুরস্ক নিয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একে একে মুসলিম বিশ্বে জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে নতুন নতুন দেশের জন্ম হতে শুরু হয়। এসবের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃক বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। শেষ পর্যায়ে ২১টি স্বাধীন আরবদেশ আরব লীগ গঠন করে। ইতিপূর্বে ২য় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শুরু হয় ইউরোপীয়ান খেদাও আন্দোলন।

খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে আরব বিশ্বে আদর্শিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। সমাজে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়- প্রাচীন পন্থী ও ইউরোপীয় বা আধুনিক পন্থী। এসময়কার সাহিত্যে গল্প উপন্যাস রচনায় এসব দ্বন্দ্ব সংঘাত ও প্রেক্ষাপট সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী এই দু'সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে আরবের আধুনিক পন্থীদের মধ্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজতন্ত্রের উত্থান, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন গল্প উপন্যাসের বিষয় হিসেবে চরিত্রে স্থান পেয়েছে। তেমনিভাবে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষেও উপন্যাস, নাটক রচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন- উমর আল-দাসূকী তাঁর বিখ্যাত 'ফী আল-আদব আল-হাদীছ' গ্রন্থে। পরবর্তী সময়ে গল্প উপন্যাস রচনার এ ধারায় কৃতিত্ব নিয়ে যায় মিসরীয় লেখকেরা। বস্তুতঃ গোটা আরবী সাহিত্যের কৃতিত্বই অনেকটা একচেটিয়া মিসরীয়দের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর তাঁর 'তাতাওওর আল-রিওয়াইয়াহ্ আল-আরাবিয়্যা আল-হাদীছা ফী মিসর' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে এ সময় থেকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের রচনা ধারায় ইংরেজী ও ফরাসী বলে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। যা বর্তমান যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কেননা ফরাসীদের মিসর জয় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মিসর অধিকাংশ সময় ফরাসী বা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশ ছিল। অন্যান্য আরব দেশ ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও এ থেকে বেশী ব্যতিক্রম ছিল না। তাই ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা সহিত্যের প্রভাব আরবী সহিত্যে খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিদেশে প্রেরিত মিসরীয় ছাত্র ও প্রতিনিধিদল যখন মিসরে ফিরে আসে তখন তৎকালীন সরকার একটি অনুবাদ প্রতিষ্ঠান খোলেন। আর এই অনুবাদ কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় রিফা'আত আল-তাহ্তাভীকে (১৮০৯-১৮৭৩ খৃ.), এই তাহ্তাভীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেঁনেসা যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব[২]। তাঁর হাতেই রেঁনেসা পূনর্জাগরণ যুগের আরবী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক মন্দা, নৈতিক অবক্ষয়, নারী নির্যাতন, শ্রেনী সংঘাত, উপনিবেশবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর এ প্রেক্ষাপট ও বিষয়কে নিয়েই আধুনিক ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনার সূচনা হয়। তবে গাল্পিক ও উপন্যাসিকের একটা অংশ প্রাচীন বিষয় ভিত্তিক রচনা অব্যাহত রেখেছেন। কেউবা গীতি গল্পে আবার কেউ হয়তবা নতুন আংগিকে ছন্দবদ্ধ অথবা ইউরোপীয় ষ্টাইলে। এ ছাড়াও একটা অংশ মুসলিম সভ্যতা ও ইতিহাস ঐতিহ্যকে তাদের রচনার বিষয় করে কথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় গল্প উপন্যাসেও তাদের অবদান রেখেছেন। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ, মোস্তফা লুৎফী আল-মান্ফালূতী, আব্দুল হামীদ যোয়ার্দ্দার প্রমুখ। আধুনিক আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম অনুবাদক রিফাআত আল-তাহ্তাভী অনেক বিদেশী গল্প-উপন্যাস, নাটক আরবীতে অনুবাদ করেন। বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজী কথা সাহিত্যের এক

---

২. রিফাআ'ত আল-আহ্তাভীঃ আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেঁনেসা যুগের প্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন রিফাআত আল-তাহ্তাভী। ১৮০১ খৃ. সালে তিনি মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হজরত হুসাইন (রাঃ) এর বংশধর। তিনি জামে' আল-আযহারে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সে গমন করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ কেন্দ্রের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এবং বিদেশী ভাষা থেকে অনেক পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। যারা পরবর্তী যুগে আধুনিক আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭৩ খৃ. সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিপুল সাহিত্য তিনি নিজে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করেন। তবে সমালোচকগণ বলেছেন তার অনুবাদ সাহিত্যমানে তেমন উন্নত ছিলনা। তাঁর ভাবসম্প্রসারণ ও শব্দচয়ন দুর্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন প্রথম অনুবাদক তাই তার অনুবাদের পর অনেক আলোচনার সমালোচনা হয়েছে। আর তাকে এই ক্ষেত্রে অগ্রপথিক বলে প্রাধান্য দেয়া হয়।

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আধুনিক মিসরে জ্ঞান বিজ্ঞানের রেঁনেসার অগ্রদূত[৩]। তাহ্তাভীর অনুবাদ ছাড়াও নিজস্ব রচনাবলী ছিল। পরবর্তী সময়ে তার ছাত্রদের মধ্যে একজন যোগ্য অনুবাদক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন উসমান জালাল (জন্ম ১৮২৮ খৃ. মৃ. ১৮৯৮ খৃ.) তার ভাষা ছিল সহজ ও প্রাঞ্জল। তিনি যেমন অনুবাদে দক্ষ ছিলেন তেমনিভাবে তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনায় নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন।

অতঃপর বিভিন্ন লেখক গল্প উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসেন। ইবনাতু আল-মামলূক নামে মুহাম্মদ ফরীদ আবু হাদীছ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন[৪] কবি হাফিজ ইব্রাহিম ও আহমদ শাওকীও গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তবে এরা গদ্য সাহিত্য থেকে কবিতায়ই নিজেদের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শাওকী ছন্দবদ্ধ গদ্যে প্রাচীন কাহিনীকে নতুন আংগিকে রচনা করেন।

বিদেশে প্রেরিত মিসরীয় ছাত্র ও প্রতিনিধিদল যখন মিসরে ফিরে আসে তখন তৎকালীন সরকার একটি অনুবাদ প্রতিষ্ঠান খোলেন। আর এই অনুবাদ কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় রিফা'আত আল-তাহ্তাভীকে (১৮০৯-১৮৭৩ খৃ.), এই তাহ্তাভীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেঁনেসা যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । তার হাতেই রেঁনেসা পূনর্জাগরন যুগের আরবী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে আরবী গল্প ও উপন্যাসে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনঃ সিরিয়ার বুতরুস আল্-বুস্তানী (১৮৮৪ খৃ.) বিখ্যাত প্যান ইসলামের উদ্যোক্তা, সমাজ সংস্কারক জামাল আল্-দ্বীন আফগানীর অন্যতম শিষ্য মিসরের মুফতী মুহাম্মদ

---

৩. উমর আল-দাসুকী, ফী আল-আদব আল-হাদিছ, (কায়রোঃ দার আল-ফিক্র) প্রথম খন্ড পৃ.৩৩।

৪ . উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, (লাহোরঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস,১৯৭৬খৃ.) ১৩শ খন্ড, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুহ্ (১৯০৫ খৃ.) মিসরের মোস্তাফা লুৎফী আল্-মানফালুতী (১৯২৪ খৃ.), সিরিয়ার খৃষ্টান সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান (১৯২৪ খৃ.), লেবাননের সাচবাদিক ও সাহিত্যিক সায়ীদ আল্-বুস্তানী (১৯২৭ খৃ.) এবং ইয়াকুব সারুফ (১৯২৭ খৃ.), সিরিয়ার ফারাহ্ আনতুন (১৯২২ খৃ.), লেবাননের দার্শনিক কবি জিবরান খলিল জিবরান (১৯৩১ খৃ.), ইরাকের ইবরাহীম হিল্মী আল-উমর (১৯৪১ খৃ.), মিসরের ইব্রাহীম আব্দ আল্-কাদির আল্-মাযিনী (১৯৪৯ খৃ.), ও মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল (১৯৫৬ খৃ.)। এদের হাতেই আরবী গল্প ও উপন্যাসের চারাগাছ প্রতিপালিত হয়ে পত্র পল্লবে ফুলে ফলে শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে বিশ্ব দরবারে ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়। এদের উপন্যাসের টেকনিক ও ষ্ট্যাইল বিদেশী হলেও বিষয় বস্তু ও মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় এরা স্বকীয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে উপন্যাসের সার্বজনীনতার জন্য কিছু সংখ্যক উপন্যাস ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে[৫]।

এ সময়কার আরবী গল্প ও উপন্যাসে মিসর তথা আরবের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজনীতি বিষয় নিয়েও গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনটিতে হয়তবা ঐতিহাসিক চরিত্র ক্ষুন্ন করা হয়েছে। যেমনঃ আবু হাদীছের ঐতিহাসিক উপন্যাস[৬]। আবার কোথাও আংগিক ও রূপ ঐতিহাসিক রাখা হয়েছে।

মিসরীয় আধুনিক শিক্ষিতরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতির চাহিদা ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজে পায়। শুধু তাই নয়, প্রথমে অনূদিত অনেক ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাস ও নাটক মিসরীয় সমাজ কাঠামো ও জীবন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। তথাপি আধুনিক শিক্ষিত যারা গোটা জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ তারা তা গ্রহণ করে[৭]। প্রফেসর গীব বলেছেন, 'আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে মিসর।' আর মিসরীয়দের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে মুহাম্মদ হোসাইন হাইকেল বলেছেন 'আরব বিশ্বের মধ্যে মিসর শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর ছিল বলে

---

৫. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪ খৃ.) পৃ.১২৯।

৬. H.A.R. Gibb, The Egyptian Novel, Bulletin of the School of oriental studies (London London Institute, Voll. VII, pp.1-22, 1935).

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের হাতে আরবী উপন্যাস রচনা ও উন্নত হওয়া সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মিসরের ধনী ও অভিজাত শ্রেণী উপন্যাস রচনায় তেমন সহযোগিতা করেনি। তাই সাধারণ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর সহযোগিতায় উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে এসব উপন্যাসের চরিত্র অংকন করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ মিসরের জাতীয় জাগরণ এবং নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের গর্ববোধ উপন্যাস রচনায় মিসরীয়দেরকে উৎসাহিত করেছে। চতুর্থতঃ রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক বিষয়ক উপন্যাস রচিত হয়েছে[৯]।

এ সময়কার গল্প উপন্যাসে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সামাজিক কুসংস্কার, সামাজিক নিপীড়ন, নারী নির্যাতন, এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও এ সব রচনা সোচ্চার ছিল। আধুনিক আরবী উপন্যাসের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডঃ আবদ আল-মুহসিন তাহা বদর তাঁর 'তাতাওওর আল-বিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যা' গ্রন্থে[৯]। উক্ত গ্রন্থে আধুনিক আরবী উপন্যাসকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

ক. আল-রিওয়াইয়া আল-তা'লিমিয়া (শিক্ষামূলক)।

খ. আল-রিওয়াইয়া আল-তাহ্লিলিয়া (কাহিনী মূলক)।

গ. রিওয়াইয়া আল-তারাজামা আল-যাতিয়া (জীবনী ভিত্তিক)।

ঘ. আল-রিওয়াইয়া আল-তাসলিয়া অ-আল-তারফিয়া (বিনোদন ও রোমান্স ভিত্তিক)।

ঙ. আল-রিওয়াইয়া আল-ফান্নি (শৈল্পিক উপন্যাস)

মৌলিকভাবে উপন্যাস চার প্রকারই। শিল্পমান রক্ষা করে রচিত হলে প্রথম প্রকার উপন্যাসই শৈল্পিক উপন্যাস হতে পারে।

---

৯. আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রম বিকাশের উপর প্রথম গবেষক ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৬২ খৃ. সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল "তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবীয়্যা আল-হাদীছা ফী মিসর" (১৮৭০ খৃ.- ১৯৩৮ খৃ. পর্যন্ত) ১৯৬২ খৃ. সালের ডিসেম্বরে এটা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়।
১৯৯২ খৃ. সালে বইটির পঞ্চম সংস্করণে নতুন সংযোজনসহ ষাটের দশক পর্যন্ত আরবী উপন্যাস নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কায়রো থেকে দার আল-মা'আরিফ কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী যুগে আরেকদল গল্পকার ও উপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়। যারা আরব্য উপন্যাসকে আর একটু উন্নতির পক্ষে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে তাইমূর পরিবার এর আয়েশা তাইমূর, মুহাম্মদ তাইমূর, মুরাহ্ ইলাহী, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ত্বাহা হোসাইন, তওফীক আল-হাকীম, নাজীব মাহ্ফূজ, মিখাইল নায়ীমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখানে সংক্ষেপে মিসরের কয়েকজন উপন্যাসিক ও তাদের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

মুস্তাফা লুৎফী আল-মানফালুতী

১৮৭৬ খৃ. সালে মিসরের মানফালুত শহরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। কুত্তাব থেকে কুরআন হিফজ ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন মুফতী মহাম্মদ আবদুহু। আবদুহুর চিন্তাধারা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। অতঃপর কর্মজীবনে সাংবাদিকতা ও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারী চাকুরি করেছেন। তিনি উপন্যাসিকের চেয়ে গল্পকার হিসাবেই অধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি কয়েকটি ফরাসী নাটক ও উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন। তবে তার ফরাসী বা অন্যান্য বিদেশী ভাষায় উপর ভাল দখল ছিল না। বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় বিদেশী ভাষার রচিত গ্রন্থের সারমর্ম বুঝে নিজে আরবীতে লিখতেন। এভাবেই তিনি অনেক অনুবাদ, গল্প ও উপন্যাস লিখেন। তবে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনার চাতুর্যতায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কখনো তার গল্পে অপ্রচলিত কিছু কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আল্-মান ফালুতীর গল্প সংকলন আল্-আবারাত (অশ্রুমালা) পাঠ করে সত্যিই পাঠকের অশ্রুসংবরণ করা সম্ভব হয় না। সবকয়টি গল্পই করুণ ও ট্রাজেডিপূর্ণ। গ্রানাডায় মুসলিম রাজত্বের পতনের কাহিনী পাঠ করে পাঠকের হৃদয়ে গ্রানাডার মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি ভেসে উঠে। ডঃ মুজীবুর রহমান বাংলায় মিসরের ছোট গল্প নামে আল-আবারাতের অনুবাদ করেছেন[১০]। এ ছাড়াও তার প্রবন্ধ সংকলন আল-নাজারাত তৎকালীন আরবী কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

---

১০. ডঃ মুজিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী

১৮৮৭ খৃ. সালে কায়রোর পল্লী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষক একাডেমীতে ভর্তি হন। এখানেই তিনি ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে রচনাশৈলী ও সেক্সপিয়ারের রচনাবলীর প্রতি আগ্রহী হন। শিক্ষা শেষ করে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। এখানে থাকাবস্থায়ই তিনি ইংরেজীতে 'কালীলা ওয়া দিমনার' আংশিক অনুবাদ করেন। তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইব্রাহীম আল-কা-তিব' ১৯৩২ খৃ. প্রকাশিত হয়। ছোট গল্প সংকলন 'আল-তরীক' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃ. সালে অতপর 'মিদু ওয়া শোরাকাত' ছালাছাতু রিজাল ওয়া ইমরা'তু।

আল্-মাযিনীর উপন্যাসে নারী পুরুষের প্রেম ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অংকিত হয়েছে। 'ইব্রাহীম আল-কাতিব' উপন্যাসের নায়ক ইব্রাহীম। নায়কের পত্নী এক সময় একটি ছেলে রেখে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। নায়কের সাথে অনেকদিন পূর্ব থেকেই তার এক খালাত বোনের সাথে প্রেম ছিল। সে প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নায়ক প্রেমিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মেয়ের অভিভাবকগণ সে প্রস্তাব এই বলে অগ্রাহ্য করে দেয় যে, প্রেমিকার বড় বোন এখনো অবিবাহিত, অতএব বড়বোনকে রেখে ছোট বোনকে বিয়ে দেয়া হবেনা। এতে মনক্ষুন্ন ও ভারাক্রান্ত হলেন প্রেমিক ইব্রাহীম।

অতঃপর ইব্রাহীম লাইলী নামক এক যুবতীর প্রেমে পড়ে, এবং প্রেমকে সে পূর্বের ব্যর্থ প্রেমের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ইব্রাহীম এর দ্বিতীয় প্রেমও ব্যর্থ হয়। অতঃপর ইব্রাহীম তার মায়ের পছন্দ অনুযায়ী ছামীরাকে বিয়ে করে।

এই উপন্যাসের লেখক একটি প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানে নাটকের ন্যায় সংলাপ রয়েছে। কোথায়ও প্রকৃতির শোভা দৃশ্যমান হয়। আর প্রেমের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মানসিকতা ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। শালীনতার সাথে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক মিসরের সামাজিক জীবনের প্রেম কাহিনী তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল

১৮৮৮ খৃ. সালে মিসরের এক সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বয়সে কুরআন হিফ্জ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে আইন কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়ণ কালে তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। অতঃপর তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক লুৎফী সাইয়েদের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। লুৎফী সাইয়েদের (১৯৬৪ খৃ.) রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চিন্তাধারা কর্তৃক তিনি প্রভাবিত হন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস গমন করেন এবং সেখানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্যারিসে থাকা কালীন তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস 'যয়নাব' রচনা করেন। যা আধুনিক আরবী উপন্যাসের মধ্যে সর্ব প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে ঐতিহাসিকগণ ও সাহিত্য সমালোচকগণ উল্লেখ করে থাকেন[১১]। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং যৌথভাবে মিসরের স্বাধীন সাংবাদিকতার সূচনা করেন। আরবী গদ্য সাহিত্যকে উন্নত করতে আত্মনিয়োগ করেন। মিসরের নারী শিক্ষার পক্ষে তিনি জনমত গড়ে তোলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় হাইকাল অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার অনেক গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫৫ খৃ. সালে তার উপন্যাস 'হা কাযা খুলিকাত' প্রকাশিত হয়। আধুনিক মিসরের মহিলাদের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত এটি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। নারী প্রকৃতিসহ মিসরের নারীদের চরিত্র ও স্বভাব এবং নারী স্বাধীনতা সহ বিস্তারিতভাবে মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যয়নাবঃ আধুনিক আরবী উপন্যাসের মধ্যে সকল উপাদান নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস যয়নাব। তাই যয়নাব নিয়ে সাহিত্য সমালোচকগণ ও ঐহিতাসিকগণ ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইউরোপের প্রাচ্য বিষয়ক পন্ডিতগণও 'যয়নাবের' গুনাগুন ও দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনাধর্মী আলোচনা করেছেন। এটা মিসরের সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের বিশেষ করে কৃষকদের জীবন নিয়ে রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। প্রেম-বিরহ, অর্থনৈতিক দৈন্য, সামাজিক প্রথা, সব কিছুর চরিত্র

---

১১. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে হোসাইন হাইকাল তার যয়নাব উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ফরাসী উপন্যাসের অনুসরণে তিনি যয়নাব রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯১৭ খৃ. সালে যয়নাব প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়[১২]। সাহিত্যের শিল্পগুণের মূল্যায়নে কেউ এর বিভিন্ন ত্রুটি উল্লেখ করলেও, নতুন আংগিকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস রচনায় মুহাম্মদ হোসাইন হাইকালের কৃতিত্ব ও অবদান সকলেই স্বীকার করেছেন। ফরাসী গল্প ও উপন্যাসের প্রভাব যয়নাবের চরিত্রে প্রতিফলিত হলেও মিসরের সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাইকালের এই উপন্যাস সার্থক ও নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মিসরের কৃষকের কন্যার হাসি-কান্নার চরিত্র আরবী উপন্যাসে অনুপম ভাবে তিনি প্রথম তুলে ধরেছেন। যয়নাব উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হিসেবে নায়িকা যয়নাব এবং নায়ক ছিল হামেদ। যয়নাব থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছেঃ

تلك النفس القاسية التى تنظر لكل جمال فى الوجودساخرة، لأنها لاتفهم منه شيأ، وتحسب ان الحياة الجد هى التى يقضيها صاجبها بين العمل والتسبيح --- وان هم لاابناء مصريولون لتبين عليهم مظاهرالرجولية من السن الخامسة فاذابلغوا أيام الرجولية الصحيحية احسوا بالتعب من طول ماجملوا هذا المطهر، وسقطتهم صفاته وان بقى عليهم لباسه -

পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন এবং বর্তমানেও অনেক উপন্যাস রচিত হচ্ছে। সাহিত্য শিল্পে এবং উপস্থাপনায় হয়ত যয়নাব থেকে উন্নত উপন্যাস তারা রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাদের উপন্যাসের প্রথম মডেল হিসাবে যয়নাব কাজ করেছে। মিসরের গ্রামীণ জীবনের সমাজ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যয়নাব উপন্যাসে। যদিও হাইকাল ও ত্বাহা হোসাইন সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ত্বাহা হোসাইন হাইকালের পরেও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। তাই তাদের যৌথ প্রচেষ্টা ও সাহিত্য সাধনাকে ত্বাহা হোসাইন একাই আর একধাপ অগ্রসর করে নিয়ে যেতে

---

১২. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ২৭৫।

১ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, যয়নাব পৃ. ১২৯, ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হন। যেমন সামাজিক উপন্যাস রচনায় ত্বাহা হোসাইন আরো যোগ্যতার পরিচয় দেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল ১৯৫৬ খৃ. সালে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

মাহমূদ তাইমূর

১৮৯৪ খৃ. সালে মিসরের বিখ্যাত তাইমূর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহমদ তাইমূর পাশা ছিলেন একজন পন্ডিত ও সাহিত্যিক। আর তাদের বাড়ী ছিল তৎকালীন মিসরের জ্ঞানীগুনী, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিকদের আড্ডাখানা। এমনকি মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ এবং পাশ্চাত্যের প্রাচ্য বিষয়ক পন্ডিতগণও এখানে আসা যাওয়া করতেন। তার বড় ভাই মুহাম্মদ তাইমূর ও বোন আয়শা তাইমূর বিখ্যাত সাহিত্যিক, গল্পকার ও উপন্যাসিক ছিলেন। তবে তারা উপন্যাসিক থেকে ছোট গল্পকার হিসাবেই অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহমূদ তাইমূরও প্রথম জীবনে গল্প রচনায় অধিক সময় ব্যয় করেন। ছোট গল্পে বলতে গেলে তাইমূর পরিবার আধুনিক আরবীতে রেঁনেসার জন্মদেন। অতঃপর মাহমূদ তাইমূর এর ভাই মুহাম্মদ তাইমূর ১৯২৫ খৃ. সালে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করায় তার পক্ষে অধিক রচনা রেখে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তথাপি তিনিও অনেক গল্প ও নাটক রচনা করে যান। মাহমূদ তাইমুরের উপন্যাসের মধ্যে 'নিদাউল মাজহুল' 'সালওয়া ফী মুহিব আল্-রীহ' উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। 'হাকলাত আল-শায়' 'ইবনুজালা' ইত্যাদি।

আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে মাহমূদ পরিবারের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে মাহমূদ তাইমূর গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসাবে আধূনিক গদ্য রেঁনেসা যুগে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এদের হাতে আধুনিক গল্প ও উপন্যাস যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর বোন আয়শা তাইমূর বিখ্যাত কবি ও গল্পকার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ত্বাহা হোসাইন (১৮৮৯ - ১৯৭৩ খৃ.)

আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল এবং আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ডঃ ত্বাহা হোসাইন। তাঁর ৫টি উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আদীব। তবে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আল-আইয়্যামেও উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি অনেক ছোট গল্প রচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে হবে।

আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ (১৮৮৯ - ১৯৬৪ খৃ.)

আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ ১৮৮৯ খৃ. সনে মিসরের আসওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আক্কাদের জন্ম। সম সাময়িক ডঃ ত্বাহা হোসাইন ও ইব্রাহীম আবদ আল-কাদের আল-মাযেনীও একই সনে জন্ম গ্রহণ করেন[১৩]। অসাধারণ মেধার অধিকারী আক্কাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত হয়েছিল। ১৯০৩ খৃ. সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছু দিন সরকারী চাকুরি করে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন[১৪]।

আক্কাদ সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি হিসেবে, নাট্যকার, উপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক, সাহিত্য সমালোচনাসহ সকল সাহিত্যের ময়দানে সক্রিয় থাকার পরেও তিনি রাজনৈতিক জীবনেও ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তি জীবন ছিল তাঁর সংগ্রামমুখর, কলম ছিল বলিষ্ঠ। সমসাময়িক ডঃ ত্বাহা হোসাইনের মত তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছে। তওফীক আল-হাকীম, ত্বাহা হোসাইন ও আব্বাস মাহমুদের যৌথ প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্য বিশেষ করে কথা সাহিত্য চরম উন্নতি লাভ করে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিরাট সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে কথা সাহিত্যে 'সারা' উপন্যাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মুহাম্মদ হোসাইন হাইকালের 'যয়নাব' এবং ত্বাহা হোসাইনের 'আদীব' এবং তওফীক আল-হাকীমের 'আওদাত আল-রূহ' এর সাথে 'সারা' তুলনীয়।

---

১৩. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর,তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যা আল-হাদিছা, দার আল-মা'আরিফ, পঞ্চম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯২ খৃ. পৃ. ২৮৩।

১৪. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনিভাবে আল-মাযেনীর 'ইব্‌রাহীম আল-কাতিব' এসব উপন্যাসের সাথে আলোচিত। অনেকে আল-আয়্যামকেও এর সাথে যুক্ত করে আলোচনা করে থাকেন। ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে 'আওদাত আল-রূহ'কে 'সারা' উপন্যাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সব উপন্যাস থেকে 'সারা'কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন[১৫]।

তওফীক আল-হাকীম

১৮৯৮ খৃ. সালে মিসরের এক পল্লী গাঁয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষকদের মাঝে তার বাল্যকাল কাটে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রথমে কায়রো শহরে আসেন। এখানে মাহমূদ তাইমূরসহ অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাথে তার পরিচয় হয়। তখন থেকে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। নাটক রচনা দিয়েই তার রচনার সূত্রপাত হয়। ১৯২৪ খৃ. সালে তিনি আইন শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিস গমন করেন। সেখানে ফরাসী সাহিত্যের সাথে সরাসরি পরিচয় হয়। তওফীক আল-হাকীমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "আওদাত আল-রূহ" (আত্মার প্রত্যাবর্তন) ১৯৩৩ খৃ. সালে ইহা প্রকাশিত হয়।

আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তওফীক আল-হাকীমই বেশী পরিচিত নাম। উপন্যাস ছাড়াও তিনি অনেক নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে "মুহাম্মদ" নাটক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন কাহিনী নিয়ে রচনা করে তিনি গোটা পৃথিবীতে আলোচিত হয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধর্মীয় কাহিনী নির্ভর নাটক উপন্যাস রচনা করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী। ইসলামী চরিত্র বিষয়ক নাটক ও উপন্যাসও তার কম নয়।

ভাষার প্রাঞ্জলতা, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার রচনায় যা লক্ষণীয় তা হলো তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সাথে মানুষের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের সাথে তওফীক আল-হাকীমের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য চর্চায় তারা পরস্পর সহযোগী ছিলেন এমনকি যৌথভাবে

---

১৫. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যা আল-হাদিছা, পৃ. ৩৬০, ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের বর্তমান পর্যায়ে তওফীক আল-হাকীমের দক্ষ হাতে তা আরেক ধাপ উন্নত হয়েছে।

নাজীব মাহ্‌ফূজ

নাজীব মাহফূজ আরবী সাহিত্যে শুধু মাত্র নয় বরং বিশ্ব সাহিত্যে পরিচিত নাম। তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব সমাজে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক আরবী উপন্যাস তথা আরবী সাহিত্য মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৮ খৃ. সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত "ছুলাছিয়াত" উপন্যাসের জন্য আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আরবী সাহিত্যের গর্ব এই কথা সাহিত্যিক ১৯১১ খৃ. সালে মিসরের কায়রোর জামালিয়্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ২য় মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে আরবী কথা সাহিত্যে গুণগত পরিবর্তন আসে। এই সময় ইতিহাস ভিত্তিক কথা সাহিত্য নতুন শিল্প আবেগ ও রোমান্সিজমে রচনা হতে শুরু করে এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে নাজীব মাহফূজের ছুলাছীয়্যাত-এ[১৬]।

নাজীব মাহফূজ বাল্যকাল থেকে কায়রোতে অবস্থান করেন। ১৯৩৪ খৃ. সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনের সিংহভাগ তিনি কাটিয়েছেন চলচ্চিত্র বিভাগে। ১৯৭২ খৃ. সালে চাকুরি থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র বিভাগে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি করেন। সরকারী উচ্চপদে বহাল থাকলেও সাহিত্যের নেশা ছিল তাঁর আজন্মের এবং সাহিত্য প্রীতির নিরলস কর্মোদ্যমই তাঁকে গৌরবের সুউচ্চ শিখরে আসীন করেছে।

ইতিহাস ভিত্তিক রোমান্সিজম ও আবেগ নিয়ে উপন্যাস রচনার শিল্প অনুসরণ করার সাথে সাথে তিনি রূপক ও ছদ্ম ধারাকেও অন্যতম শিল্প কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য তিনি সরকারী চাকুরি করেও অব্যাহত গতিতে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে

---

১৬. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

তার বিশাল সাহিত্য ভান্ডার গড়ে উঠে। আধুনিক আরবী উপন্যাস রচনায় নাজীব মাহফূজের পূর্বসূরী হচ্ছেন ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ এবং তওফীক আল-হাকীম।

১৯৮৮ খৃ. সালে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি বলেছেন এই পুরস্কার আমাকে না দিয়ে ত্বাহা হোসাইন, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ ও তওফীক আল-হাকীমকে দিলেই অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো। আসলে এই তিনজন কথা শিল্পীর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে অগ্রসরমান আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যিক নাজীব মাহফূজ চরম শিখরে নিয়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রে নাজীব মাহফূজের অবদানকে যেমন খাটো করে দেখা যায় না তেমনিভাবে উক্ত তিনজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকের অবদানের ধারাবাহিকতার সাথে নাজীবকে আলাদা করারও অবকাশ থাকে না।

বিশেষ করে নাজীব মাহফূজ তওফীক আল-হাকীমের শিল্পের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে অগ্রসর হয়েছেন। তওফীক যেমন আজীবন বিরামহীনভাবে লিখে গেছেন নাজীবও নিরলসভাবে লিখে গিয়েছেন। তাদের সমসাময়িক বা পূর্বসূরীরা এইভাবে লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে মিসরে যখন নাস্তিক্যবাদীরা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তখন তিনি কমিউনিষ্টদের চিন্তার কাছাকাছি থেকে "আওলাদ হারাতিনা" নামক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ খৃ. সালে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ খৃ. সালে উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। অথচ লেখক হিসেবেও নাজীব মাহফূজ সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু নাজীব মাহফূজের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর কিছুসংখ্যক মিসরীয় লেখক পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতে চাচ্ছেন এবং বইটি বাজারে ছাড়ার জন্য খুব সোচ্চার হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে রক্ষনশীল মুসলিমদের পক্ষ হতে নাজীব মাহফূজ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে রচিত নাজীব মাহফূজের ছুলাছিয়্যাত বা ত্রয়ী নামক উপন্যাসটি ইংরেজী ফরাসী সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। বিশ্ব সাহিত্যে আরবী উপন্যাসের

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যমান ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৮ খৃ. সালে।

ছুলাছিয়্যাত (ত্রয়ী) নামের উপন্যাসটি আরবীতে ১২০০ পৃষ্ঠায় এবং ইংরেজী অনুবাদে ৩ খন্ডে ১৫০০ পৃষ্ঠায় ৫টি বৃহৎ উপন্যাসের সংকলন। তিন খন্ডে প্রকাশিত এবং বিষয়বস্তু হিসেবে তিন যুগ তিন প্রজন্ম নিয়ে রচিত এই সামাজিক উপন্যাসটি'তে তিনি মিসরীয় সমাজচিত্র দক্ষতার সাথে অংকন করেছেন কায়রোয় বিখ্যাত তিন গলির ধারা বিবরণী বর্ণনার মাধ্যম। এখানেই তার ত্রয়ি নামকরণের যুক্তিকতা।

তিন ধারা নামে তিনি সবকিছুকেই তিন দিয়ে বিভাজন করেছেন। নামকরণের এমন কৌশল খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম পূর্ব প্রাচীন মিসরীয় ফেরাউনী যুগ থেকে তিনি উপন্যাসের প্লট শুরু করেছেন শেষ করেছেন আধুনিক মিসরের আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের প্রভাবিত ইউরোপীয় ধারার মিসরে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ধারা বিবরণীর মাধ্যমে হিসেবে রাজধানী কায়রোয় তিন গলিকে বেছে নিয়েছেন মহাকালের নিরব স্বাক্ষী হিসেবে।

গলি তিনটির নাম হচ্ছে- "জুকাক আল-মিদাক" "খান আল-খলীলি" এবং "সানদাকিয়া"। ৫টি উপন্যাস হচ্ছে- জুকাক আল-মিদাক, বায়ন আল-কাসরাইন, কাসর আল-শাওক, আল-সুক্কারিয়া ও সারসারা ফাউক আল-নীল।

নাজীব মাহফূজ ৩৮ বছর সরকারী চাকুরিতে উচ্চপদে থেকেও তাঁর নিরলস সাহিত্য সাধনা চালিয়ে গিয়েছেন। সরকারী চাকুরি জীবনে জনগণের সাথে সেতু বন্ধন হিসেবে তিনি বিরতিহীনভাবে ৩০ বছর কায়রোয় মিদাক গলিতে অবস্থিত "কিরশা" কফি হাউজে বৈকালিক আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন। নাজীব মাহফূজ কিছু কবিতা ও নাটক লিখলেও তিনি মূলত উপন্যাসিক ও গল্পকারই ছিলেন। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাস নাট্যরূপ পেয়েছে[১৭]। পাঠকের চাহিদা এবং তিনি

الروائي القاص

১৭. ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, নাজীব মাহফুজের সাহিত্যে জীবন সত্য, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আষাঢ় ১৪০০, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ছিলেন এই সুবাদে তাঁর প্রায় সব গল্প ও উপন্যাস নিয়েই পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

নাজীবের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশের অধিক এর মধ্যে 'আল-কাহিরা আল-জাদীদা' এবং 'বিদায়া ওয়া নিহায়া' উল্লেখযোগ্য।

আরবী উপন্যাস রচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । এক্ষেত্রে মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন এর লেখকদের ভূমিকাই অগ্রগামী। আধুনিক আরবী গল্প ও উপন্যাসে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি প্রগতিশীল মুক্ত জীবন দর্শন, প্রেম বিরহের চিত্রও ফুটে উঠেছে। বর্তমান আরবী উপন্যাস তার পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছে। তবে এখনও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাস রচনার সংখ্যা ও পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প[১৮]।

এসব উপন্যাসের ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্র হিসাবে আব্বাসীয় যুগে রচিত মাকামা সাহিত্য ও রম্য গল্প "আলফ লায়লা ওয়া লায়লা" কে উল্লেখ করা হয়। বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে আধুনিক আরবী উপন্যাস অন্য যে কোন ভাষায় রচিত উপন্যাস থেকে অগ্রগামী না হলেও আজ আর পিছিয়ে নেই। আর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দ্রুত আরবী উপন্যাস অনূদিত হচ্ছে। পাঠকের চাহিদাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস আজ সাড়া জাগানো সাহিত্য। ইতিমধ্যে ১৯৮৮ খৃ. সালে আধুনিক আরবী উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মিসরে আরবী উপন্যাসের চর্চা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হয়। একদল দক্ষ উপন্যাসিকের নেতৃত্বে আরবী উপন্যাস অগ্রসর হতে থাকে। এরা হচ্ছেনঃ ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ইবরাহীম আল-মাযিনি এবং তওফীক আল-হাকীম[১৯]। ২য় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক নাজীব মাহ্ফূজ[২০] ।

---

১৮. উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, পাকিস্তান, ১৩শ খন্ড, পৃ. ২২।

১৯. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যা আল-হাদীছা, পৃ. ২৮৩।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্বাহা হোসাইনের জীবনী

আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের জনক ডঃ ত্বাহা হোসাইন। সাহিত্যের সকল শাখা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সফল পদচারণা ছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে অষ্টম দশক পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরব্যাপী মিসরীয় বুদ্ধিজীবীদের শিরোমনি ছিলেন তিনি। মিসর তথা আরবী সাহিত্যের আধুনিকায়ণে তাঁর অবদান অপরিসীম।

বাল্য জীবনঃ ত্বাহা হোসাইন উত্তর মিসরের সায়ীদ নামক পল্লীতে ১৮৮৯ খৃ. সালে ১৪ই নভেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চিনির কোম্পানীতে চাকুরি করতেন এবং তিনি দুটি বিয়ে করেছিলেন। ত্বাহা হোসাইনের ভাইবোনদের সংখ্যা ছিল মোট ১৩ জন। আর ত্বাহা হোসাইন তাদের মধ্যে সপ্তম ছিলন এবং নিজ মায়ের সন্তানদের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক, কিন্তু আয়ের পরিমান বেশী ছিলনা। তাই বাল্যকালে ত্বাহা হোসাইন ও তার ভাইবোনেরা বিলাসিতার মুখে দেখেনি। তবে তার ভাইয়েরা সবাই ছিল মেধাবী ও প্রখর স্মরণ শক্তি সম্পন্ন। পিতা তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খুবই যত্মবান ছিলেন।

তিন বছর বয়সে ত্বাহা হোসাইন 'অফথ্যাল্‌মিয়া' রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ভুল চিকিৎসাই এর কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্তা এর বিনিময়ে তাঁকে প্রখর স্মরণ শক্তি ও ধী-শক্তি দান করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি মিসরের অগণিত বালকের হৃদয়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ত্বাহা হোসাইনকে প্রথম গ্রামের কুত্তাবে ভর্তি করে দেওয়া হয়। প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী বালক ন'বছর বয়সে পুরো কুরআন মুখস্ত করতে সক্ষম হন। অতঃপর অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রাচীন আরবী কবিতা মুখস্ত এবং আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক বই সমূহ আয়ত্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ে তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সবাইকে অবাক করে দেয়, এমনকি মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯০২ খৃ. সালে তিনি কুত্তাবের[১] পাঠ্যসূচী যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করে তৎকালীন মিসরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে' আল-আযহারে[২] ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

---

১. মিসরের সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়কে কুত্তাব বলা হত। এখানে কুরআন মুখস্তসহ আরবী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত। কুত্তাবের প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের দেশে মক্তব ব্যবহৃত হয়।

২. জামে' আল-আযহারঃ মিসরের ফাতেমীয় রাজত্বকালে খলীফা মনসুর নিযাব আল-আযীয (৯৭৫-৯৯৬) এটা স্থাপন করেন। আল-আযহার পৃথিবীর অন্যতমন প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র। কুরআন হাদীছ, তাফসীর, এলমে কালাম, তাওহীদ, ফিকাহ, উসুলে ফেকাহ, বালাগাত, মান্তিক, হিকমত, হাইয়্যাত, তারীখ, সরফ, নাহু, অংক, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। এটা যেমন প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল অতি পুরাতন। পরবর্তী যুগে মাঝে মাঝে পুরনো শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। ১৯২৮ খৃ. সালে মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে সেখানকার উলামাদের একটি প্রতিনিধি দলকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রেরণ করেন। যাতে করে তারা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখে এসে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তা প্রবর্তণ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তারা ফরাসী ভাষায় লিখিত কিছু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ আলী পাশার এই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা আল-আযহারের বেলায় তেমন সফল হয়নি। বরং তা পূর্বের ন্যায় চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যায়ে ১৯৬২ খৃ. সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদ আল-নাসের আল-আযহারে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা চালু করেন এবং আধুনিক বিষয় সংযুক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা ঃ তাঁর এক ভাই আগে থেকেই আল্-আযহারের ছাত্র ছিলেন। ভাইয়ের সহযোগিতায় তিনি পল্লীর বিদ্যালয়ের আংগিনা ছেড়ে রাজধানী শহর কায়রোর আল্-আযহারে ভর্তি হন[৫]। দু'ভাই এক সাথে থাকতে শুরু করেন। আযহারে এসে ত্বাহা হোসাইনের জীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। পরবর্তীতে তাঁর রচিত আজীবনীমূলক গ্রন্থ আল-আইয়্যামে তিনি এসময়কার স্মৃতি ও অনুভূতির ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষা উভয় বিষয়ই লেখা পড়া করেন।

ولبث الصبى دقائق لايميز ممايقول الشيخ حرفًا، حتى اذا تعودت اذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهم، وقداقسم لى انه احتقر العلم منذذلك اليوم، سمع الشيخ يقول ولوقال لها أنت طلاق، وأنت طلاق، اوانت طلاق، وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ ---

আল-কুরআন ও আল-হাদীস ছাড়াও নাহ্ভ (ব্যাকরণ), উসুলে ফিকাহ্, মানতিক (তর্কশাস্ত্র) ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও পন্ডিত সাইয়েদ আল-মারসাফী। ত্বাহা হোসাইন তার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন। ভবিষ্যৎ জীবনের সাহিত্য চর্চায় এই অধ্যাপক তার জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথমে ত্বাহা হোসাইন আল-মারসাফীর নিকট আল-মুবাররাদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলকামিল', আবু আলী আল-কালীর 'আল-আমানী', আবু তাম্মামের 'হামাসা' অধ্যয়ন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আল-আযহারে যখন ত্বাহা হোসাইন অধ্যয়ন করেছেন তখন তৎকালীন মিসরের বিপ্লবী সংস্কারক মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর (মৃ ১৯০৫ খৃ.) চিন্তাধারা মিসরের সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত যুবকদের চিন্তার রাজ্যে নতুন জাগরণ দেখা দেয়।

---

৫ ডঃ ত্বাহা হোসাইন, [illegible] পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু এককালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। ত্বাহা হোসাইন সরাসরি মুহাম্মদ আবদুহুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাননি। কিন্তু তার চিন্তাধারা ত্বাহা হোসাইনের চিন্তায় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর বিশিষ্ট ছাত্রদের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ ত্বাহা হোসাইনের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেমন আবদুহুর অন্যতম ছাত্র কাসিম আমীন নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের আহবান জানিয়েছিলেন। তেমনিভাবে পন্ডিত সাংবাদিক লুৎফী সাইয়েদ তার পত্রিকা 'আলজারিদা' মারফত দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও নৈতিক দিকের ওপর আধুনিক চাহিদা মূল্যায়ন করে চিন্তার বিপ্লবের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ত্বাহা হোসাইন সরাসরি এদের সংস্পর্শে আসেন। এই সংস্কার ও চিন্তাধারার প্রভাবে তার মধ্যে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার সূত্রপাত হয়। তিনি সব কিছুকে স্বাধীনভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে শিখলেন।

ত্বাহা হোসাইন এখন আর অন্ধভাবে কোন কিছু মেনে নিতে রাজী হলেন না। সনাতন ব্যবস্থার প্রতি তার বিদ্রোহের ভাব ও প্রতিবাদের সুর উৎক্ষেপিত হলো। সমালোচনা করতে শুরু করলেন অনেক প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে। তার এই সমালোচনা তিনি তার বক্তব্যে ও লেখনীতে প্রকাশ করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণশীল ও সনাতন পরিবেশে তার এই সমালোচনাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিশৃংখলার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করলো। ত্বাহা হোসাইন এতে বিচলিত হলেননা। আর নিজ মতামত ও চিন্তাধারা থেকেও পিছপা হলেন না। তিনি এ সময়কার তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে (অনুবাদ)।

"সেই বালক (ত্বাহা হোসাইন) খামের পাশে বসলো এবং চেয়ারের শিকল খেলনার ছলে নাড়তে নাড়তে অধ্যাপকের বক্তৃতায় মন দিল। অধ্যাপক হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বালক তাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারল এবং তার বক্তৃতার সমালোচনার কোন সূত্র খুঁজে পেল না। কেবল তার কাছে যা বেসুরো ঠেকলো তা এই যে প্রত্যেকটি হাদীছের উৎস এবং ব্যাখ্যাকারীদের নাম বর্ণনা। অধ্যাপক কিছু বলেই 'ইত্যাদি-ইত্যাদি' বলে তার বক্তৃতা বিলম্বিত করছিলেন। অধ্যাপকের এই সুদীর্ঘ নামের তালিকায় এবং অযথা উৎস সন্ধানের মধ্যে সেই বালক কোন অর্থ খুজেঁ পেল না।

Dhaka University Institutional Repository

সে অধ্যাপকের কাছে আসল হাদীছ এবং তার যথার্থ ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছুক। এবং যখনই সে অধ্যাপকের কাছে হাদীস শুনতে পেলো তখনই সে তা হৃদয়ংগম করলো এবং মুখস্ত করে ফেললো। কিন্তু সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় অধ্যাপকের বক্তৃতা আবার তার কাছে একঘেয়েমিতে পরিণত হলো। যেমন একঘেঁয়েমি লাগতো তাদের গ্রামের মসজিদের ইমামের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। যখন অধ্যাপক বক্তৃতা করতেন এবং ছাত্ররা সেই বক্তৃতার আলোচনায় গুঞ্জন তুলতো, তখন মনে হতো যেন আল-আযহার তন্দ্রার পর আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কণ্ঠস্বর মিলে এমন এক সুর ধ্বনি সৃষ্টি করতো যার সর্বোচ্চ সুর সর্বোচ্চ শব্দে গিয়ে মিলিত হলো। 'আল্লাহ সব কিছু জানেন' অতঃপর সেই ছেলের ভাই আসতো, কোন কথা না বলে তার হাতে ধরে অন্যস্থানে নিয়ে যেতো এবং বস্তার মতো তাকে একাকী এবং নিঃসংগ অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে যেতো। সেই বালক বুঝতে পারলো যে, তাকে আইনের ক্লাসে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সে অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ছাত্ররা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতো[৩]।"

এভাবে আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে তার দারুণ অনীহা সৃষ্টি হতে লাগলো। আযহারে অধ্যয়নকালে ত্বাহা হোসাইনের সহপাঠী ছিলেন অধ্যাপক হাসান যায়্যাত। যিনি ভবিষ্যৎ জীবনে আরবী সাহিত্য চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখেন। ত্বাহা হোসাইনের সাথে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, তাদের বন্ধুত্ব সারা জীবন অটুট ছিল। ১৯০৮ খৃ. সালে প্রথমে মিসরে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ত্বাহা হোসাইন এতে ভর্তি হন। এখানে তিনি মিসরীয় শিক্ষক নয় বরং পাশ্চাত্যের শিক্ষকদের নিকটও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। প্রাচ্য বিদ্যায় বুৎপত্তিসম্পন্ন অধ্যাপক রিনানের নিকটও তিনি জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পান এবং আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ইউরোপের সমালোচনার ধারা ও চিন্তা কর্তৃক তিনি প্রভাবিত হন এবং তা থেকে যোগ্যতা অর্জন করেন। রাতে তিনি শিক্ষকদের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতেন, এভাবে তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করে ক্লাসের ফরাসী বক্তৃতা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হন। তৎকালীন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফরাসী ভাষা। তার অধ্যয়ন কালে ১৯১৪ খৃ. সালে তিনি আবুল আ'লা আল-মায়াররির উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলে তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।

---

৩. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪ খৃ.) পৃ.১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রবন্ধটিই পরবর্তীকালে 'যিকরা আবিল আ'লা' (আবূ আ'ল-আলার স্মরণে) নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক ছিল ত্বাহা হোসাইনের ভবিষ্যৎ উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতার ইংগিতবহ। এই পুস্তকে তিনি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, পরিবেশ, পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাসহ তার নিজস্ব দর্শনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। আবুল আলা ছিলেন আব্বাসী যুগের এক অন্ধ প্রতিভা। তিনি ছিলেন আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এবং আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি। ডঃ ত্বাহা হোসাইন নিজেও অন্ধ ছিলেন। ভোমরা রাখে মধুর খবর, প্রতিভাই প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম তাই আবুল আলা সম্পর্কে গবেষণা করা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। একজন কবির মানসিক পটভূমিকার বিশ্লেষণ এবং তার কার্যাবলীর সার্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনা এটাই ছিল আরবী সাহিত্যে প্রথম। তার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খৃ. সালে। এটাই ছিল কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট। তার এই প্রবন্ধের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বৃত্তি দিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা নাজুক হয়ে যাওয়ায় এক বছর পরই তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। অতঃপর আর্থিক দৈন্য কেটে গেলে তাকে আবার প্যারিসে পাঠানো হয়। এখানে এসে তিনি মুক্ত দুনিয়া খুঁজে পেলেন, সেই মুক্ত পরিবেশ তিনি কামনা করছিলেন আযহারে থাকা অবস্থায়। এখন সরাসরি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে জড়িত হয়ে তিনি পাশ্চাত্যের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হন। তার সম্মুখে চিন্তার নতুন জগত উন্মুক্ত হয়।

ফরাসীর সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি গ্রীক সাহিত্য ও সমাজ দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯১৭ খৃ. সালে তিনি তাই আরো একটি ডক্টরেটের জন্য ফরাসী ভাষায় 'ইবনে খলদুনের সমাজ দর্শন' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং ডক্টরেট লাভ করেন।

১৯১৮ খৃ. সালে ত্বাহা হোসাইনের জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তা হচ্ছে তার বিবাহ। প্যারিসে অধ্যয়নকালে সুজন ব্রসো নাম্নী এক ফরাসী রমণী ডঃ ত্বাহা হোসাইনের সহপাঠীনি ছিলেন। তার সাথে ত্বাহা হোসাইনের ভাব জমে ওঠে। তিনি ত্বাহা হোসাইনকে বই পুস্তক পড়ে শুনাতেন। ত্বাহা হোসাইন সেগুলো শুনে শুনে তা আয়ত্ত করতেন। সুজন ব্রসো ডঃ ত্বাহা হোসাইনের

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হন। ১৯১৮ খৃ. সালে তার সাথে ত্বাহা হোসাইনের বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের হয়েছিল। তাদের কয়েকজন ছেলে মেয়ে হয়েছিল। এই মহিলা পরবর্তী কালে ত্বাহা হোসাইনের জ্ঞানার্জনে ও গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করতে থাকেন। তার সম্পর্কে ত্বাহা হোসাইন বলেনঃ সে আমার জীবনের দরিদ্রতাকে ঐশ্বর্য দিয়ে, হতাশাকে প্রত্যাশা দিয়ে আর হতভাগ্যকে সৌভাগ্য ও কল্যাণ দিয়ে ভরে দিয়েছে। তিনি আদর করে তার পত্নীকে 'আমার চলার ছড়ি' বলে ডাকতেন। তাদের ছেলে-মেয়ে সম্পর্কেও ত্বাহা হোসাইনের গ্রন্থে আলোচনা আছে।

শিক্ষকতা ও কর্মজীবনঃ ১৯১৯ খৃ. সালে ত্বাহা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তেমনিভাবে গ্রীক সাহিত্য ও সমাজ দর্শনের উপরও বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি পুস্তক ও সম্পাদনা করেন। তিনি অধ্যাপনার প্রথম দিনেই ছাত্রদের শিক্ষা দিলেন যে, কোন বিষয়ে পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। প্রত্যেকটি বিষয়কে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার আলোকে বিচার করা উচিত। তখনো মিসরের সুধীজনেরা এই ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি তার মুক্ত চিন্তার ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেন ফী আল-আদব আল-জাহিলী (জাহিলী সাহিত্য প্রসংগ)। ১৯২৬ খৃ. সালে তা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি এমন সব চিন্তাধারা পেশ করেন যা আরবী সাহিত্যের সর্বসম্মত নিয়মনীতি ও দৃষ্টি ভংগির বিপরীত ছিল। এই বই প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মিসরের সাহিত্য ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে হৈ হুল্লা পড়ে যায়। তখন সরকার এ বই এর প্রচার বন্ধ করে দেন।

এতে তিনি বলেনঃ যে সাহিত্যকে আমরা জাহিলী যুগের সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করি তার বেশীর ভাগের সাথেই জাহিলী যুগের কোন সম্পর্ক নেই। সে গুলোকে ইসলামী যুগে সৃষ্ট সাহিত্য বলে ধরে নেয়া যায়[৪]।

এ প্রসংগে তিনি আরবের উল্লেখযোগ্য বর্ণনাকারীদের বক্তব্য এবং এ বিষয়ে আলোচ্য পুস্তক থেকে অনেক প্রমানাদি পেশ করেছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে, এত সুন্দর প্রাঞ্জল কবিতা জাহিলী

---

৪. ত্বাহা হোসাইন, ফী আল-আদব আল-জাহিলী,(কায়রো; ১৯৩৩ খৃ) পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবিদের পক্ষে রচনা অসম্ভব ব্যাপার। বরং এগুলো জাহিলী কবিতার উন্নত সংস্করণ বলেই মনে হয়। এ থেকে বুঝা যায় খালাফ আল-আহ্‌মর এবং এদের মত অন্যান্য বর্ণনাকারী নিজেরা এসব কবিতা রচনা করে জাহিলী কবিতা বলে চালিয়ে দিয়েছে। ত্বাহা হোসাইনের 'ফী আল-আদাব আল-জাহিলী' এর প্রতি উত্তরে ধারাবাহিক ভাবে পুস্তক লেখা হতে থাকে। অন্যান্য সমালোচকরা এই নিয়ে বাক বিতন্ডা শুরু করে দেয় এবং এই মতামত মেনে নিতে অস্বীকার করে ত্বাহা হোসাইনের বিরোধিতায় অনেক পুস্তক রচনা করে। পাক-ভারতে যে সব পুস্তক এসেছে সেগুলোর মধ্যে তার বিরোধিতাকারীদের চেয়ে সমর্থনকারীদেরই সংখ্যা বেশী।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিমগণই এতে অংশ গ্রহণ করেন সবচাইতে বেশী। যে যুগে আর কোন গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এত তীব্র ঝঞ্জা বয়েছিল বলে জানা যায় না। তারা ত্বাহা হোসাইনের উক্তিকে পরম্পরাগত ইসলামী ভাবধারা ও ইতিহাসের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, গ্রন্থটি ইসলাম ও কুরআনের প্রতি হামলাস্বরূপ। তারা বলেন, এতে ইসলামী মতবাদ ও ভাবধারার প্রতি আঘাত লেগেছে। মোট কথা গন্থটিকে কেন্দ্র করে সারা মিসরের পরিস্থিতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। লোকেরা গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত সহ ত্বাহা হোসাইনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করে দেশান্তরিত করার দাবী জানান। বিষয়টি মিসরের পার্লামেন্টেও তোলপাড়ের সৃষ্টি করে। সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, গ্রন্থকারের উক্তি যথার্থ। মন্ত্রী পরিষদ এ ব্যাপারে ডঃ ত্বাহা হোসাইনকেই সমর্থন করে। মন্ত্রী জগলুল পাশা ঘোষণা করলেন, ডঃ ত্বাহা হোসাইনকে যদি দেশান্তরিত করা হয়, তা হলে আমি মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেব। তথাপি বিরুদ্ধ শিবির থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্বাহা হোসাইনই জয়লাভ করলেন। তাকে দেশান্তরিত করা হলো না। তার গ্রন্থটিও বাজেয়াপ্ত করা হলো না, ফলে মিসরে এই প্রথম বারের মত স্বাধীন চিন্তাধারা ও বাক স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩০ খৃ. সালে ডঃ ত্বাহা হোসাইন আর্ট কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন[৫]। কিন্তু ত্বাহা হোসাইনের স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব বেশী দিন তাকে এ পদে থাকতে দেয়নি। তিনি সত্য কথা বলতে কখনো দ্বিধা করতেন না।

---

৫. ইসালামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অগ্রিম সত্য কথা বলার দায়ে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইসমাইল সিদকীর বিরাগভাজন হন। তিনি ডঃ ত্বাহা হোসাইনকে সতর্ক করে বলেনঃ আপনি হয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করুণ নতুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করুণ। ডক্টর ত্বাহা হোসাইন তার নীতিতে অবিচল রইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর প্রতিবাদ করতে থাকেন।

১৯৩০ খৃ. সালের শেষের দিকে বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের নীতির বিরোধিতা করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন বছর তাকে কারাবরণ করতে হয়। কারাগারে তিনি নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু তার নৈতিক মনোবল কখনো ভেঙ্গে পড়েনি। কর্ম প্রেরণায়ও কখনো ভাটা পড়েনি। এ তিন বছর সময়ে তিনি মূল্যবান সাতখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি মিসর সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু এতে ডঃ ত্বাহা হোসাইনের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হলো। মধ্য প্রাচ্যের আনাচে কানাচে তার খ্যাতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। ১৯৩৩ খৃ. সালে ইসমাইল সিদকী প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হলে ডঃ ত্বাহা হোসাইন তার পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। ফলে মিসরের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঃ তিন বছর যন্ত্রণাদায়ক কারাবরণ করে ত্বাহা হোসাইন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন যে, যতদিন জাতি সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাই তিনি প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। অবৈতনিক শিক্ষা আন্দোলন হয়ত আজ বিপ্লবধর্মী পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে না, কিন্তু সে সময়ে মিসরে কেন পুরো আরব বিশ্বের জন্যেও তা ছিল একটি অভিনব এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা[৬]।

সে সময় মিসরে সাধারণ শিক্ষা ছিল ব্যয় বহুল। ত্বাহা হোসাইন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝান্ডা তুলে বলেনঃ জ্ঞান একটি পণ্য নয়, যা বাজারে বিক্রী করা হবে। এ হলো সূর্যরশ্মি এবং টাট্‌কা

---

৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,(ঢাকা, ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ৪৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

হাওয়ার ন্যায় প্রকৃতির একটি মুক্ত অবদান। যে ব্যক্তি তা ভোগ করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই বিনামূল্যে ভোগাধিকার দিতে হবে। অবৈতনিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে নেই বলে সরকার এই প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করল। আসল ব্যাপার ছিল তদানীন্তন রাজা ফারুকের মনে ভয় ছিল যে, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটলে দেশবাসী মিসরের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। ফলে, তার ক্ষমতায় বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না। ত্বাহা হোসাইন ভাবলেন বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই তিনি তার শিক্ষা আন্দোলনকে জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ দিকে সরকারের পক্ষ থেকে ত্বাহা হোসাইনের বিরোধিতা করা হয়। পত্র পত্রিকাকেও তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। কিন্তু ত্বাহা হোসাইন আপন নীতিতে অনড় রইলেন। ক্রমে ক্রমে দেশবাসীও তার পাশে এসে দাঁড়াল। ১৯৪৩ খৃ. সালের অক্টোবর মাসে মিসর পার্লামেন্ট ঘোষণা করল যে, আজ থেকে দেশে প্রাইমারী অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হলো। কিন্তু ত্বাহা হোসাইন এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার মাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনামুল্যে মধ্যাহ্নভোজ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

১৯৪২ খৃ. সালে তারই প্রচেষ্টায় আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি তার ভাইচ-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খৃ. সালে মিসর সরকার ডঃ ত্বাহা হোসাইনকে শিক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ করেন। এভাবে তিনি তার বহু দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান। তিনি মিসরে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। শুধু তাই নয়, সতর বছর অনুর্ধ্ব প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যেও তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে ত্বাহা হোসাইনের আদেশে অনেক ইংরেজী ও ফরাসী গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি মিসরের শত শত তরুণকে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন। রাজা ফারুকের স্বৈরাচারী নীতির সমালোচনা করায় মন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হন। সরকারের সমালোচনা করার জন্য তার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ খৃ. সালে মিসরে জেনারেল নাজীবের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাজা ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন। জেনারেল নাজীব অভ্যুত্থানে জড়িত সামরিক অফিসারদের এক সমাবেশে একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি ত্বাহা হোসাইনকে আমন্ত্রণ জানান। ত্বাহা হোসাইন সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন না। সে সভায় জেনারেল নাজীবের অনুরোধে ত্বাহা হোসাইন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মানবাধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। জেনারেল নাজীব তার বক্তব্য শুনে বললেনঃ ডঃ ত্বাহা হোসাইনের বক্তব্যই হবে আমাদের আগামী দিনের অভিযানের মূলমন্ত্র। এটাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা[৭]।

ডঃ ত্বাহা হোসাইন অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে অজ্ঞতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। অবাধ শিক্ষা, গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সফলকামও হয়েছেন। তিনি তার দেশে বাকস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি আরবী ভাষা পরিষদ, কায়রো আরবী বিজ্ঞান পরিষদ, দামেস্ক-এর সম্মানিত সদস্য ছিলেন। মাদ্রীদ, রোম, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে উচ্চ খেতাবে ভূষিত করে।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ঃ ডঃ ত্বাহা হোসাইন এমন একজন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন সমকালীন বিশ্বে তাঁর মত আরেকজন প্রতিভাবান ব্যক্তি খুজেঁ পাওয়া দুস্কর। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা, সংস্কারক, গবেষক, ঐতিহাসিক সমালোচক, প্রভাবশালী বাগ্মী, সাংবাদিক, সংস্কারক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, অনুবাদক, সর্বোপরি আধূনিক মিসর ও আধূনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম জনক।

ত্বাহা হোসাইন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সমালোচনায় আরব বিশ্বে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আধূনিক ও প্রাচীন সাহিত্য পর্যালোচনা এবং তার অভিজ্ঞতার ব্যাপকতার কারণে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের উপর তার প্রাধান্য ছিল। তিনি প্রাচীন আরবী সাহিত্য, মহানবীর জীবন চরিত এবং

---

৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করেছেন। সাহিত্যে, জাহিয, আবুল ফারাজ ইস্পাহানী এবং আবূ হায়্যান তাওহাদী তার প্রিয় লেখক। কবিদের মধ্যে তিনি বুহতুরি ও আবু আল-আ'লা-আল মাআ'ররীর ভক্ত ছিলেন।

চিন্তার দিক থেকে তিনি মুতাজিলা কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন এবং তাদের জ্ঞান চর্চার মর্যাদা দিতেন। ত্বাহা হোসাইন ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার ওপর তার নিজ ভাষার মতই দখল ছিল। তিনি পাশ্চত্য বেশভূষায় থাকতেন এবং তুকীটুপি পরিধান করতেন। পশ্চিমা সাহিত্যভাণ্ডার থেকে অনেক কিছু আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অনেক ফরাসী নাটক, গল্প, উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। তবে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের সমালোচনাও করেছেন। তিনি শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের জীবন ধারার দুর্বল দিকের প্রতি ইংগিত করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তার সমাধানও নির্ণয় করে দিয়েছেন[৮]।

ত্বাহা হোসাইনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ফরাসী, ইংরেজী, গ্রীক ও আরবীর হাজার হাজার বই সাজানো থাকত। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, তাই অপর কেউ তাকে পড়ে শুনাত। এ ব্যাপারে তার সবচাইতে বেশী সহায়তা করেন তার সহধর্মিনী সুজন ব্রসো। একবার তাকে ইউনেস্কো ডিরেক্টর জেনারেল করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মিসর সরকার এই বলে সেই প্রস্তাব রদ করে দেয় যে, মিসরের চক্ষু লাভের জন্য এই অন্ধের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সত্যিই মিসরের জন্য তার প্রয়োজন ছিল অত্যধিক, এই অন্ধের বদৌলতেই আজ মিসরের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষার আলোকে আপন জ্ঞান উজ্জ্বল করছে। তিনি শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব থাকাকালে অনেক শিক্ষাবৃত্তি মঞ্জুর করেন। তিনি তার তত্বাবধানে ইবনে 'সিনার কিতাবুশশিফা'র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেক্সপিয়ারের ইংরেজী নাটক অনুবাদের উদ্যোগ নেন। ফলে এই পর্যন্ত আটটি নাটকের আরবী অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে[৯]। নারী শক্তি ও নারী শিক্ষার জন্য ত্বাহা হোসাইন জোরালো আন্দোলন করেন। এবং পর্দা প্রথাকে তিনি নারীদের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি পর্দা প্রথার

---

৮. আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব (উর্দু),(ভারতঃ হায়দরাবাদ) পৃ. ১১৯।
৯. উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়া, ১২শ খন্ড, পৃ. ৬০০।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে সরাসরি বক্তব্য পেশ করেন। মিসরীয় আলেম সমাজ তার কঠোর সমালোচনা করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা শহীদ হাসানুল বান্না ত্বাহা হোসাইনের সাথে ইসলামের পর্দা প্রথা এবং মিসরীয়দের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুকরণের বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন। পরবর্তী সময়ে ত্বাহা হোসাইন পর্দার ব্যাপারে নমনীয় ভূমিকা পালন করেন। তবে নারী শিক্ষার জন্য সর্বদাই জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর মতবাদ সমূহঃ তিনি ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন। তিনি পূর্ব পুরুষদের দেয়া কোন বিষয়কে চোখ বুজে মেনে নিতে পারেননি। তিনি ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগির কষ্টিপাথরে সবকিছুর সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। তিনি আরবী সাহিত্যের সমালোচনা, ইউরোপীয় রীতিনীতি প্রবর্তন এবং বিজ্ঞানধর্মী গবেষণার দ্বার উদঘাটন করেন। ধর্মীয় ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগিতে ইসলামের সত্যাসত্য যাঁচাই করেন। তার এ নিরপেক্ষ ও যুক্তিধর্মী মনোভাবের ফলে পূর্ব পুরুষদের পরম্পরাগত ভাবধারার গায় আঁচড় না লেগে পারেনি। তিনি ছিলেন ইউরোপীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। তিনি জাতীয়তাবাদের উপর ভরসা না করে দেশবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, সাংবাদিকতা তথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার সাহিত্য মানবীয় মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। তবে ছোট গল্প ও উপন্যাসে মানব দরদই দীপ্তিমান।

সমালোচক হিসেবে ত্বাহা হোসাইন

ডঃ ত্বাহা হোসাইন আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। আহমদ আমীন সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম ভূমিকা পালন করলেও, সার্থকভাবে আরবী সাহিত্যের আলাদা বিষয় হিসেবে প্রথম এবং পূর্ণাংগ সাহিত্য সমালোচনা রচিত হয় ত্বাহা হোসাইনের সিদ্ধ হস্তে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ত্বাহা হোসাইন আরবী সমালোচনাকে জীবনী শক্তি দান করেছেন। আর আহমদ আমীন শুধুমাত্র সমালোচনার সূচনা করেছেন। আহমদ আমীন শুধুমাত্র সমালোচনার উপর একটি বই লিখেছেন। আর ত্বাহা হোসাইন অগণিত প্রবন্ধ ও বই লিখে আহমদ আমীনকে পিছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়েছিলেন। ত্বাহা হোসাইনই প্রথম ব্যক্তি যিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে উপকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর গুরুত্বারোপ করে আরবী সমালোচনাকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং নতুন পথে পরিচনালনা করেন। আরবী সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে অন্যান্য ভাষার সাথে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য করে গড়ে তোলেন। ডঃ ত্বাহা হোসাইনের সাহিত্য কর্মের সকল শাখার মধ্যে সমালোচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ[১০]। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যের শাখায় পারম্পরিক সমালোচনাও সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তার সমালোচনা ছিল সৃষ্টিধর্মী, আর সেগুলো আরবী সাহিত্যের রচনাশৈলীর উত্তম মানদন্ড বলে স্বীকৃত। অতএব, তার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা কঠিন যে, স্রষ্টা তাকে প্রকৃতিগত ভাবে সাহিত্যিক করেছিলেন না কি সমালোচক। তবে এটুকু বলা যায় যে, এ দুটি ধারা তার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সমালোচক, অপরদিকে তেমনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। গভীর সূক্ষ্মচিন্তার আলো এবং যথার্থ মুল্যায়ণ দৃষ্টিভংগি ছিল তার সমালোচনার মূল উপাদান। যা ব্যতিত তিনি এক কদমও অগ্রসর হননি।

তিনি যখন কোন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রথমেই তিনি সে সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের সকল শাখার উপর গভীর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করতেন, সাথে সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সূত্রের সাথে লেখকের কি সম্পর্ক ছিল তাও তিনি অনুসন্ধান করেছেন। অতঃপর লেখকের সাহিত্য কর্ম এসব দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত ছিল, তিনি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করতেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে থেকে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য কর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠবে তাও তিনি নির্ণয় করেছেন।

ডঃ ত্বাহা হোসাইন প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাশ্চাত্যের অনুসন্ধান ও যাঁচাইয়ের পদ্ধতিতে তিনি শুধু সফলকামই হননি বরং এ ক্ষেত্রে আরবী সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি আরবী সমালোচনা সাহিত্যে

---

১০. সাইয়্যেদ ইহতেশাম আহমদ নদভী, জাদীদ আরবী আদব কা-ইরতিকা, (ভারতঃ হায়দরাবাদ, ১৯৬৯ খৃ.) পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবের সূচনা করেন। আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগি নিয়ে তাকে পূর্ণতা দান করেন। তিনি মুক্ত চিন্তার প্রচলন করে অন্ধ বিশ্বাসকে পরিহার করে চলেছেন।

অনুসন্ধান গবেষণা, যাচাই-বাছাই, আধুনিকতা ও প্রগতির প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা এসব হচ্ছে ত্বাহা হোসাইনের সমালোচনার বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন কোন বিষয়ের উপস্থাপন করেন, তখন সে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সাহিত্যের সমালোচনা করে নিজস্ব সমালোচনা ধারা অনুযায়ী সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত চিন্তাধারা দিয়ে সমালোচনা করে চমৎকার পদ্ধতিতে তার দৃষ্টিভংগি তুলে ধরেন। পাঠক সে বিষয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা করতে পারে। তার সমালোচনা চিন্তার উৎস ছিল ফরাসী সাহিত্য। প্যারিস গমন ও ফরাসী সাহিত্য চর্চা তার মধ্যে এবং অন্যান্য আরবী সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান রচনা করেছে। তার ব্যক্তি জীবন ছিল ফরাসী জীবন ধারার সাথে সম্পৃক্ত। তাই তার চিন্তা চেতনা ও জীবন বোধ অবশ্যই অন্যান্য আরব চিন্তাধারা থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল।

ত্বাহা হোসাইন কোন কবির সমালোচনা করতে গিয়ে শুধু একদিক আলোচনা করতেন না। বরং সাময়িক জীবন ধারার সকল দিকও তুলে ধরতেন। উদাহরণস্বরূপ আবূ নুওয়াসের কথা বলা যায়। হাদীস আল-আর রিওয়াতে তিনি আবূ নুওয়াসের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা চরিত্রের অনুপম চিত্র অংকন করেছেন। এ প্রসংগে তিনি আব্বাসী যুগের চরিত্র ও সামাজিক প্রবণতা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এমন উদাহরণও উল্লেখ করেছেন যা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়না। যেমন আব্বাসী যুগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ এই যুগে খলীফা থেকে শুরু করে কবি ও উলামা সবাই চরিত্রের দিক দিয়ে অধঃপতিত ছিল। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।

রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সদস্য হয়েও ত্বাহা হোসাইন যৌবনে সীমাহীন মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়ে ইসলামী আকিদার পরিপন্থী চিন্তাধারা পেশ করে সমালোচিত হয়েছেন। যেমনঃ পর্দা প্রথা এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ সম্পর্কে তার মন্তব্যে মৌলবাদী মুসলিমগণ জোরালো

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা করেছেন। তিনি 'মুসতাকবিল আল-সাকাফাহ্ ফী মিসর' (মিসরের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি) গ্রন্থে বলেছেনঃ

'আমি মনে করি পাশ্চাত্য থেকে আমরা যতবেশী গ্রহণ করতে পারি, তার উপরই নির্ভর করে আমাদের জাতীয় উন্নতি। আমরা ইউরোপের কাছে সভ্য হতে শিখেছি। ইউরোপীয় লোকেরা আমাদেরকে টেবিলে বসতে, কাটা চামুচ এবং ছুরি দিয়ে আহার করতে, মেঝের উপর না ঘুমিয়ে বিছানায় ঘুমাতে এবং পশ্চিমা সাজে পোশাক পরতে শিখিয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা খেলাফত থেকে পথ নির্দেশ চাইনা। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় কোর্স স্থাপন করেছি। এটা অনস্বীকার্য যে, আমরা দিন দিন ইউরোপের নিকটবর্তী এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চলেছি'[১১]।

এ গ্রন্থে ত্বাহা হোসাইন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বদেশকে চোখ বুজে ইউরোপের অনুকরণ করার উপদেশ দেন। তিনি ইউরোপীয় তাহযীব তুমুদ্দুনের গুণ কীর্তন করেন, এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম সভ্যতাকে ভুলে সবকিছুই গ্রীক ও ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে পেতে চেয়েছেন।

উল্লেখিত দৃষ্টিভংগি নিয়েই ত্বাহা হোসাইন তার শিক্ষা সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার মতে ইসলাম এবং আরবী ভাষা মিসরকে প্রাচ্যধর্মী করে তুলতে পারেনি। প্রাক ইসলামী যুগে খ্রীষ্টান থাকা অবস্থায় মিসরীয় লোকদের যে তাহ্যীব তমদ্দুন ছিল, তাই তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি[১২]। ১৯৬১ খৃ. সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদ্ আল-নাসের ডঃ ত্বাহা হোসাইনের অনুপ্রেরণায় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম নিরপেক্ষ করে তুলে ধরেন। এপর্যন্ত এটি ছিল নিছক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ত্বাহা হোসাইনের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট নাসের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রশাসন, কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিষয় প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে ইসলামিয়াত বিষয়ে পাশ না করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব ছিল না।

---

১১. ত্বাহা হোসাইন, মুসতাকবিল আল-ছাকাফাহ ফী মিসর,(কায়রো) পৃ. ১১-১২।
১২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ৪৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ খৃ. সালে ত্বাহা হোসাইনের মুসতাকবিল আল-ফাকাফাহ্ ফী মিসর 'গ্রন্থটি দি ফিউচার অফ কালসার ইন ইজিপ্ট' নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। ত্বাহা হোসাইন যদিও তার প্রাথমিক জীবনে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ সংস্কারক মুফতী মোহাম্মদ আবদুহ্ থেকে স্বাধীন চিন্তার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, কিন্তু কালপ্রবাহে শেষ পর্যন্ত তার চিন্তাধারা সে পক্ষে স্থির না থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম সম্পর্কে ত্বাহা হোসাইনের চিন্তার পরিশুদ্ধতা ফিরে আসে[১৩]। এবং তিনি সাহাবীদের জীবনীর ওপর আকীদা নির্ভর গ্রন্থ রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে 'আলা হামিশ আল-সীরাহ এবং মিরয়াত আল-ইসলাম। (ইসলামের দর্পন) উল্লেখযোগ্য। মিরয়াত আত-ইসলামে' তিনি ইসলামের সৌন্দর্য ও মানব সভ্যতায় এর অবদান সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

ডঃ ত্বাহা হোসাইন জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন শহরতলীর একটি অনাড়ম্বর বাড়ীতে অধ্যয়ন করেই তিনি সময় কাটাতেন, এতেই ছিল তার আনন্দ। সংগীতের প্রতি তার বেশ আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ফরাসী, ইংরেজী, গ্রীক ও আরবীর হাজার হাজার গ্রন্থ সাজানো থাকতো। কেউনা কেউ তাকে বই পড়ে শোনাত। এ ব্যাপারে তার সবচাইতে বেশী সহায়তা করেন তার পত্নী সুজন ব্রসু। তিনি ছিলেন হাস্য রসিক মানুষ। তার সাহচর্যে এসে লোক আনন্দিত হত। ত্বাহা হোসাইনের খ্যাতি তাঁর জীবদ্দশায়ই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যে তাঁর গ্রন্থ ও চিন্তাধারার উপর অনেক সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ত্বাহা হোসাইন ছিলেন অন্ধ। কিন্তু এই অন্ধতা তাঁর জীবনে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি। কোন এক বন্ধু তাকে বলেছিল, অন্ধত্ব তোমার পথে একটি বড় বাধা স্বরূপ। তিনি হেসে বললেনঃ 'আপনি যেটাকে বাধা মনে করেন আমি সেটাকেই একটি নেয়ামত মনে করি। কেননা অনেক নিরর্থক ও ক্ষতিকর আকর্ষণ রয়েছে, সেগুলো আমাকে এ অন্ধত্বের দরুণ তাদের দিকে টেনে নিতে পারছেনা।' সুদীর্ঘ চুরাশি বছর বয়সে এই জ্ঞান তাপস চিন্তাবিদ নিয়তির নিমর্ম আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭৩ সালের ২৮শে অক্টোবর মিসরে পরলোক গমন করেন।

---

১৩. উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফ ইসলামীয়া, ১২শ খন্ড, পৃ. ৫৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ত্বাহা হোসাইনের রচনাবলীঃ

ত্বাহা হোসাইন আধুনিক আরবী সাহিত্যের স্থপতি। কবিতা ব্যতিত সাহিত্যের সকল শাখায় তার ব্যাপক ও স্বার্থক পদচারণা রয়েছে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরেরও বেশী। তবে তাঁর কিছু কাব্য গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। পাঠকের প্রিয় বই হিসাবে তার গ্রন্থ সমূহের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ত্বাহা হোসাইন ১৯৭৩ খৃ. সালে ইন্তেকাল করেছেন। অথচ তাঁর কোন কোন বই ১৫ থেকে ২০ বার পর্যন্ত সংস্করন প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকেই তার বইয়ের জনপ্রিয়তার অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যে তাঁর বহু গ্রন্থ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ত্বাহা হোসাইনের প্রথম বই 'আল-ও'য়াদ আল-হক্ক' অনূদিত হয় ১৯৭৫ খৃ. সালে।

নিম্নে ত্বাহা হোসাইনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমুহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নয়টি ভাগে তুলে ধরা হলঃ সাহিত্য ও সমালোচনা এবং ইতিহাস ও শিক্ষামূলক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ; গল্প ও উপন্যাস; যৌথ সম্পাদনার ভিত্তিতে রচিত; সম্পাদনা, তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে রচিত; অনুবাদ রচনা; ভুমিকা ও মুখবন্ধ লিখিত রচনাবলী; কবিতা ও কাব্য চর্চা; গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও চিন্তাধারা ভিত্তিক রচনাবলী; এবং তার উপর সংবদ পত্রে প্রকাশিত ও সমাবেশে প্রদত্ত বক্তব্য ভিত্তিক রচনাবলী।

এক ঃ সাহিত্য

১। *তাজ্‌দীদু যিকরা আবি আল্‌-আলা (আবুল আলার স্মরণে)* স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার অভিযোগে ত্বাহা হোসাইন যখন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন সে সময় ১৯১৪ খৃ. সালে এই গন্থটি রচনা করেন। বস্তুতঃ গ্রন্থটি তার গবেষণার পত্র, যা তিনি আবু আল-'আলা আল-মা'আররীর জীবন ও দর্শন এর উপর গবেষনাধর্মী জ্ঞান গর্ব ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। ত্বাহা হোসাইন ছিলেন অন্ধ, আর আবু আল-'আলা আল-মা'আররীও ছিলেন একজন অন্ধ কবি। তাই একজন অন্ধ আর একজন অন্ধের মর্যাদা ও অনুভূতি

Dhaka University Institutional Repository

সহজে বুঝতে সক্ষম ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এটা অধ্যয়ন করে ত্বাহা হোসাইনের যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এবং ভবিষ্যতে ত্বাহা হোসাইন একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হবেন বলে তারা ভবিষ্যদ্বানী করেন। তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তারা তাকে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

২। *ফাল্‌সাফাহ ইবনে খালদুন (ইবনে খালদুনের দর্শন)* কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। সেখানে গ্রীক দর্শন সহ অন্যান্য দর্শনের প্রতি আগ্রহী হন। সে সময় তিনি ইবনে খালদুনের সমাজ দর্শনের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

৩। *ফী আল-শি'অর আল-জাহিলী (প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা)* ১৯২৬ খৃ. সালে প্রথমে প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা এই নামে এই গ্রন্থ রচনা করেন, পরবর্তী বছর ১৯২৭ খৃ. সালে ফী আল্-আদব আল-জাহিলী তথা প্রাক ইসলামী যুগের সাহিত্য প্রসংঙ্গ নামে উহা প্রকাশ করেন। এটা ত্বাহা হোসাইনের বহুল আলোচিত ও সমালোচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক গবেষণা ধর্মী ইতিহাস ভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে জাহিলী যুগে রচিত কবিতাকে ইসলামী যুগের রচিত বলে যুক্তি দেখিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ আমার বিশ্বাস আমরা জাহিলী সাহিত্য বলে যাকে নামকরণ করেছি এর অধিকাংশের সাথেই জাহিলী যুগের সম্পর্ক নেই । বরং ইহা ইসলামী যুগে রচিত[১৪]।

তিনি আরো বলেন ঃ প্রাক ইসলামী যুগের জীবন সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে কুর'আনের মাধ্যমে জানা উচিত, জাহিলী কবিতার মাধ্যমে নয়-। বস্তুতঃ আমি জাহিলী জীবনকে অস্বীকার করছিনা বরং আমি স্বীকার করছি তথাকথিত জাহিলী সাহিত্যকে। তাই জাহিলী জীবন সম্পর্কে আমি জানতে চাইলে ইমরাউল কায়েস, নাবিগা, আ'শা এবং যুহায়রের সূত্রে আমি তা

---

১৪. ত্বাহা হোসাইন, ফী আল-আদব আল-জাহিলী, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তালাস করব না। বরং আমি অন্য সূত্রে তা জানার চেষ্টা করব। যেই সূত্রে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই, তা হচ্ছে আমি মহাসত্য গ্রন্থ আল কুর'আন পড়ব[১৫]।

এই গ্রন্থে ত্বাহা হোসাইন তার স্বাধীন মতামত অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করে বলেন ঃ "পূর্ব পুরুষগণ পরবর্তীদের তুলনায় অধম ছিলেন এ কথা আমি মনে করিনা। আবার এ কথাও বলি না যে তারা ছিলেন এদের তুলনায় উত্তম। বরং সবাই সমান এদের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করিনা। হ্যাঁ যারা তাদের সুপ্তপ্রতিভাকে বিনষ্ট না করে আপন প্রকৃতিকে উন্নত করেছেন, তারাই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। পূর্ব পুরুষগণও মিথ্যার শিকারে পরিণত হন, যেমন হচ্ছেন পরবর্তীগণ। পূর্ব পুরুষদের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা ছিল অধিকতর স্বাভাবিক। কেননা তখনও মানুষের বিবেক বুদ্ধি আজকের ন্যায় সমৃদ্ধি লাভ করেনি[১৬]।

এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর মিসরে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং দেশের সাহিত্যাঙ্গন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কেননা লেখকের এই মতামত ছিল প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় চিন্তাচেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

৪। *কাদাত আল-ফিকর (চিন্তার দিশারীগণ)* ১৯২২ খৃ. এই গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল সহ অন্যান্য দার্শনিকদের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৫। *আল-আয়্যাম (কাল প্রবাহ)* ১৯২৭ খৃ. সালে ৩ খন্ডে প্রকাশিত ত্বাহা হোসাইনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে নিজেকে গোপন রেখে সেই বালকটি বলে সব কিছু ব্যক্ত করেছেন। বাল্যকাল থেকে শুরু করে যৌবন পর্যন্ত এবং বিদেশ গমন সহ তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তার অনুভূতি তিনি অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাবে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন সার্থক শিল্পী হিসাবে। তিনি কোথায়ও আমি বা আমরা বলে ধরা দেননি। এ গ্রন্থটি আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক বিরাট অবদান। দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ভাষায় এর

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ হয়েছে। আর পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। এটি প্রথমে প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিক ভাবে মিসরের আল-জিলাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটাই হলো ইউরোপীয়দের চোখে সর্ব প্রথম আধুনিক আরবী সাহিত্য[১৭]। ইহা তিন খন্ডে প্রবাস জীবন সহ বিভিন্ন ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। 'ইজিপসিয়ান চাইল্ডহুড' নামে ১৯৩২ খৃ. সালে ইহার প্রথম খন্ড অনূদিত হয়[১৮]। আর ১৯৪৩ খৃ. সালে দ্বিতীয় খন্ড অনূদিত হয়। 'দি স্ট্রীম অফ ডেজ' নামে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য সমালোচকগণ আল-আয়্যামকে ত্বাহা হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন[১৯]। আল-আয়্যামকে অনেকে উপন্যাস বলেও উল্লেখ করে থাকেন, বস্তুতঃ ইহা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস যেমন তারা শংকরের মানচিত্র। এই পুস্তকের মাধ্যমে তৎকালীন মিসরের মধ্যবৃত্ত শ্রেনীর পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন অবগত হওয়া যায়। অতঃপর শিক্ষানীতি ও আল-আযহারের তৎকালীন শিক্ষার পরিবেশ ও জানা যায়। বিনা সংকোচে ত্বাহা হোসাইন তার বাল্য জীবন ও যৌবনের সকল অনুভুতিও ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-আইয়্যামে । তার এই গ্রন্থের কিছুটা তুলনা করা যায় সম্প্রতি প্রকাশিত আধুনিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ বাংলা কবি আল-মাহমুদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "যে ভাবে গড়ে উঠি" গ্রন্থের সাথে। এখানেও আল-মাহমূদ বিনা সংকোচে তার বাল্যকাল ও যৌবনের স্মৃতিকথা সহ সমসাময়িক ঘটনাবলী তুলে ধরেছেন[২০]।

৬. *মিন হাদীছ আল-শি'রওয়া আল-নছর (গদ্য ও পদ্যের কাহিনী থেকে)* ১৯৪৩ খৃ. সাল আব্বাসী যুগের আরবী কবিতা ও গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ।

৭. *মা'আ আল-মুতানাব্বী (মৃতানাব্বীর সাথে)* ১৯৩৬ খৃ. আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আল-মুতানাব্বীর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে ইহা লিখিত হয়েছে।

৮. *মা'আ আবী আল-'আলা ফী সিজনিহী (কারাগারে আবু আল-'আলার সাহচর্যে)* যেহেতু ত্বাহা হোসাইন আবু আল-'আলার মতই অন্ধ ছিলেন তাই আবু আল-'আলার সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল অত্যধিক। তাই তিনি তার সম্পর্কে এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

---

১৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ৪৭৩।
১৮. E.H. Paxton, An Egyptian Childhood, The Autography of Taha Hussain,(London 1932)
১৯. ডঃ শাওকী দায়ফ, আদব আল-আরাবী, পৃ. ২৭৩।
২০. আল-মাহমূদ, যেভাবে বেড়ে উঠি, (ঢাকাঃ অংগীকার প্রকাশনী, ১৯৮৫ খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

৯. *হাদীছ আল-আরাবি'আ (বুধবারের বার্তা)* ১৯২৫ খৃ. সালে প্রতি বুধবারে তিনি নিয়মিত পত্রিকায় যা লিখতেন পরবর্তী সময়ে তিন খন্ডে পুস্তক আকারে তা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয় ও প্রসংগ নিয়ে বুধবারের বার্তা প্রনীত হয়েছে। বিশেষ করে কবি ও কবিতা প্রবন্ধই তাতে প্রাধান্য পেত। ১৯২৫ সালে তিনি তার ঘনিষ্ট বন্ধু আহমদ লুৎফী সাইয়্যেদকে তা উৎসর্গ করেন।

১০. *আলা হামিশ আল-সীরাহ (পবিত্র জীবনী কোষ)* মহানবী এবং তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবীদের জীবন নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। এতে লেখক গবেষক ও ঐতিহাসিকের ভুমিকা পালন করেছেন। ভাব আবেগের উর্ধে উঠে তিনি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ রেখেই মহানবী ও তাঁর সাহাবাদের জীবনী আলোচনা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন নামেও এটা তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১১. *মুসতাক্‌বিল আল্-ছাকাফাহ্ ফী মিসর (মিসরের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ)* ১৯৩৮ খৃ. এই গ্রন্থে লেখক মিসরের জন্য একটি শিক্ষানীতি সহ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন।

১২. *(হাফিজ ওয়া শাওকী)* হাফিজ ও শাওকী আধুনিক আরবীর দুই জন সমসাময়িক মিসরীয় শ্রেষ্ঠ কবি। লেখক তাদের অবদান ও কাব্যিক গুণাগুন নিয়ে সমালোচনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

১৩. *আলও'আদ আল্ হক্ক (সত্য প্রতিশ্রুতি)* ১৯৪৯ খৃ. একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

১৪. *ফসূল ফীআল্-আদব ওয়া আল্-নকদ, (সাহিত্য সমালোচনা)* ১৯৪৫ খৃ. সাল। ত্বাহা হোসাইন আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন। গ্রন্থখানি এই বিষয়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১৫. *সওতু আবী আল্-'আলা (আবু আল-আলার মুখ পত্র)* ১৯৪৪-কায়রো।

১৬. *আল্-ফিতনা আল্-কোবরা(মহাবিপর্যয়)* প্রথম খন্ড উসমান নামে ১৯৪৭ খৃ. সালে ও ২য় খন্ড আলী ওয়া বানূহু নামে ১৯৫৩ খৃ. সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. *জান্নাত আল্-শওক (কন্টকময় উদ্যান)* সংস্কারমুলক উপন্যাস, ১৯৪৫ খৃ. কায়রো।

১৮. *ফী আল্-সাঈফ (গ্রীষ্মের আগমনে)* ভ্রমন-কাহিনী।

১৯. *রিহ্‌লা আল্-রবী'অ (বসন্তের যাত্রা)* ভ্রমন কাহিনী, ১৯৪৮ খৃ. কায়রো।

২০. *মিন বাঈদ (দূর থেকে)*।

২১. *সওতু বারীস (প্যারিসের মুখপত্র)* ফরাসী উপাখ্যান ও উপন্যাসের সমালোচনা গ্রন্থ। ১৯৪৩ খৃ. কায়রো।

২২. *(লাহ্‌জাত)* উপখ্যানের সমালোচনা, ১৯৪২ খৃ. কায়রো।

২৩. *আল্‌ওয়ান (বিচিত্রা)* প্রবন্ধ সংকলন।

২৪. *জান্নাঃ আল্ হাইওয়ান (জীবের উদ্যান)* সাহত্যি বিষয়ক চিঠিপত্র সংকলন, ১৯৫০ খৃ. কায়রো।

২৫. *মিরয়াত আল্-দমীর আল্-হাদিছ (আধুনিক চিন্তাধারার দর্পণ)* সামাজিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা।

২৬. *বাঈন, সমাজ জীবন* সম্পর্কে লেখকের মতামত, ১৯৫২ বৈরুত।

২৭. *আলিহাতু আল-ইউনান (গ্রীকের প্রভু)*।

২৮. *আল-হায়াহ্ আল-আদবিয়াহ্ ফী জাযিরাহ্ আল-'আরাব (আরব বিশ্বে জীবন ও সাহিত্য)*, ১৯৩৫ খৃ. দামেস্ক।

২৯. *মিন হুনাকা (এখান থেকে)*, ১৯৫৫ খৃ., কায়রো।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. *খৈসাম ওয়া নক্‌দ (দ্বন্দ্ব ও সমালোচনা)* ১৯৫৫ খৃ. বৈরুত।

৩১. *নকদ ওয়া ইস্‌লাহ্‌ (সমালোচনা ও সংস্কার)*, ১৯৫৬ খৃ. বৈরুত।

৩২. *মিন আদাবিনা আল-মুআসির (আমাদের সময়ের সাহিত্য)*, ১৯৫৮ খৃ. কায়রো।

৩৩. *মিন লগাভ আল-সাঈফ ইলা যাদ্দি আল-শিতায় (গ্রীষ্ম থেকে শীত)*, ১৯৫৯ খৃ., বৈরুত।

৩৪. *মিন আদব আল-তামছীল আল-গারভী (পাশ্চাত্যের উপমা সাহিত্য)* ১৯৬৯ খৃ. বৈরুত।

৩৫. *মিরআহ্‌ আল-ইসলাম (ইসলামের দর্পণ)* ১৯৫৯ খৃ.

৩৬. *(খাওয়াত্বির)* ১৯৬৭ খৃ. বৈরুত।

৩৭. *(কালিমাত)* ১৯৬৭ খৃ. বৈরুত।

৩৮. *মিন তারীখ আদাব আল আরাবী (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস হতে)* ১-২ খন্ড, ১৯৭০ খৃ. বৈরুত।

৩৯. *শায়খান*, ১৯৬০ খৃ. , কায়রো দুই খন্ডে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর জীবনী।

দুই ঃ গল্প ও উপন্যাস

১. *আদীব*, কায়রো, ১৯৩৫ খৃ.।

২. *আল-মু'আয যাবুনা ফীআল-আরদ (পৃথিবীর নির্যাতিতগণ)* উপন্যাস, কায়রো, ১৯৪৯।

৩. *শাজারাত আল-বু'স (দুঃখ বৃক্ষ)* কায়রো, ১৯৪৪ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

৪. *দোয়া আল-কারাওয়ান (কোকিলের ডাক)* কায়রো ১৯৩৬ খৃ.।

৫. *আল-হুব্ব আল-দা'য়ি (ব্যর্থ প্রেম)* কায়রো ১৯৪৬ খৃ.।

৬. *কাসর আল-মাস্‌হুর (যাদুর প্রাসাদ)* কায়রো ১৯৩৬ খৃ. সাহিত্য বিষয়ক চিঠি পত্র। কেউ এটাকে উপন্যাস বলেও উল্লেখ করেছেল।

৭. *(আহ্‌লাম শাহারযাদ)* প্রাচীন কাহিনীর নতুন সংস্করণ।

৮. *(সাফা)* কায়রো, ১৯৪৭ খৃ.।

৯. *আলমুতাজিলা (শাহারযাদের স্বপ্ন)* কায়রো, ১৯৪৭ খৃ.।

১০. *(নাযীর)* কায়রো, ১৯৪৫ খৃ.।

১১. *(ঈশা সাঈদাইন)* ১৯৪৮ খৃ.।

১২. *(আল-শুহুব আল-হুমর)* কায়রো ১৯৪৮ খৃ.।

১৩. *(আমীন)*, কায়রো, ১৯৪৬ খৃ.।

১৪. *(কাসিম)* কায়রো, ১৯৪৬ খৃ.।

১৫. *আল্‌-মুসাহারা আল-মাসহুরাহ্‌ (যাদুকরের যাদু)* ১৯৪৭ খৃ.।

১৬. *(মাওয়ারা'য়া আল- নাহর)*।

১৭. *(রফীক)*।

১৮. *(হাদিয়া)*।

Dhaka University Institutional Repository

তিন ঃ যৌথ সম্পাদনা

১. *আল-হায়াতু ওয়া আল-হারাকাত আল-ফী বারীতানিয়া (ব্রিটিশ জীবন ও চিন্তাধারা)* আহমদ হোসাইন পাশা ও অন্যান্যদের সাথে যৌথ ভাবে রচিত। কায়রো, ১৯৪১ খৃ.।

২. *(আরা'-হাররাহ্)* কুরদ আলী ও অন্যান্যগন, কায়রো, ১৯৪৫ খৃ.

৩. *(শরহি লুযূম মালা ইয়ালযাম)* ১ম খন্ড ইবরাহীম আল-আমবারী, কায়রো, ১৯৫৪ খৃ.।

৪. *হাউলা'ই'হুম আল্-ইখওয়ান (তারা সকলে ভাই)* মুহাম্মদ তাবেয়ী ও অন্যান্যগণ। কায়রো, ১৯৫৫ খৃ.।

৫. *(মুহাম্মদ ইকবাল)* হাইকালও আক্কাদ সহ কায়রো, ১৯৫৬ খৃ.।

৬. *(আল-উ'দওয়ান আল-ছুলাছী আলা মিসর)* কায়রো, ১৯৬৫ খৃ.।

৭. *(মা'আ আল-জাযীর)* কায়রো, ১৯৫৮ খৃ.।

৮. *লিমাযা নাকরাউ (আমরা কেন পড়ব)* আক্কাদ ও অন্যান্য গণ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.।

৯. *আল-ফিকর ওয়া আল-ফান্ন ফী আদাব ইউসুফ আল-সিবা'য়ী (ইউসুফ আল-সিবায়ীর সাহিত্যে শিল্প ও চিন্তাধারা)* তওফীক আল-হাকীম সহ, বৈরুত।

১০. *আল-তারবীয়াত আল-ওতানীয়াত (জাতীয় শিক্ষানীতি)* আহমদ আমীন ও অন্যান্য সহ, কায়রো, ১৯২৭ খৃ.।

১১. *আল-মুজমাল্ মিন তারীখ আল-আদব আল-আরবী (আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের মূলকথা)* আহমদ আমীন ও অন্যান্য কায়রো, ১৯২৭ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

চার ঃ সম্পাদনা

১. *নকদ আল-নছর লি ক্রদামাত ইবনে জা'ফর (কুদামার গদ্য সমালোচনা)* আবদ আল-হামীদ আল-আব্বাদী সহ, কায়রো ১৯৩৩ খৃ.।

২. *(কালীলা ওয়া দিম্না)* কায়রো, ১৯৪১ খৃ.।

৩. *তারীফ আল-কুদামা (আবুল আ'লার সাথে কুদামার পরিচয়)* কায়রো, ১৯৪৪ খৃ.।

পাঁচ ঃ অনুবাদ

১. *ছুহুফ মুখতারাহ্ (প্রাচীন গ্রীক কবিতা)*।

২. *(নুশওয়াত আল-হাকীম)* ১৯২৩ খৃ.।

ছয় ঃ ভূমিকা

১. *রাছা'য় ফাকীদ (শোকবার্তা)* আল-জারীদা, ১৯০৮ খৃ.।

২. *রাছা'য় মাহ্মুদ (শোকবার্তা)* ২-৩-১৯১০ খৃ.।

৩. *তাকরীজ মাকাল (ভূমিকা)* ১৭-১-১৯১৩ খৃ.।

৪. *(কসীদাহ্ জাদীদাহ্ আল-সিয়াসিয়াহ্)* ১৪.১১.১৯২৮ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

সাত ঃ কাব্য

১. *(রিসালাত আল-গোফরান)* কামিল কায়লানী, কায়রো, ১৯২৫ খৃ.।

২. *(রাসায়িল ইখওয়ান আল্-সাফা)* আল-যরকলী কায়রো, ১৯২৮ খৃ.।

আট ঃ গবেষণা

১. *(নাজরাত ফী আল-নজরাত)* ৩-৮-১৯০৯ খৃ. মিসর, আল-ফাতাহ্।

২. *(বাইনা আল্-আবারাত ওয়া আল-যফারাত)* ১৯-১০-১৯০৯ খৃ. মিসর, আল-ফাতাহ্।

৩. *হাদীছ আল-আরবী'আ (বুধবারের বার্তা)*।

নয় ঃ সমালোচনা

১. *(সালামাত মুসা)* একাদশ সংখ্যা আল-হিলাল ১৯২৭ খৃ.।

২. *(মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল)*, ২২-৯.১৯৩২ খৃ. আল-সিয়াসাহ্।

(সর্বমোট ৮২ টি গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হলো)।

Dhaka University Institutional Repository

ত্বাহা হোসাইনের রচনাশৈলী

ত্বাহা হোসাইন আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের জনক। তার রচনা ধারা আধুনিক আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী এবং গতিশীল করেছে। পাশ্চাত্যে ও অনারব বিশ্বে আধুনিক আরবী লেখকদের মধ্যে তার পুস্তক সবচেয়ে অধিক পঠিত। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ তার উন্নত ও আকর্ষনীয় রচনাশৈলী।

তাঁর বাচনভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন তাই তার পক্ষে নিজে কিছু লেখা সম্ভব ছিলনা। বস্তুতঃ তাঁর সকল রচনাই তার বক্তব্য। তিনি বলে যেতেন আরেকজন তা লিখতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করত তার পত্নী এবং অন্যান্য সহকারীগণ। শেষ বয়সে তার কয়েকজন সহকারী ছিলেন যারা তাঁর বক্তব্য লিখে নিত। পক্ষান্তরে ত্বাহা হোসাইন ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। তাঁর বক্তৃতায় ছিল বিদ্রোহের সুর ও প্রতিরোধের আহ্বান। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তার বক্তৃতা শুনতো। অতএব ত্বাহা হোসাইনের রচনাবলীতে বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যই অধিক। তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর রচনা শৈলীতে অন্যতম বাচনভঙ্গী এই যে, কখনো তার কথা এত দীর্ঘ হয় যে, পড়তে পড়তে পাঠক যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সকল বক্তব্য বোধগম্য হয়। তাঁর এই রচনাশৈলী অবশ্যই আকর্ষনীয় কিন্তু সমালোচনা বিষয়ের দৃষ্টিতে কিছুটা ত্রুটিযুক্ত। তিনি যেন উদাসীন ভাবে আবেগে বলে যাচ্ছেন, বলতে বলতে কয়েক পৃষ্ঠা শেষ করেও দেখা যায় তাঁর কথা শেষ হয়নি[২১]। বিশেষ করে তার এই ধারা গল্প বা নাটকে দেখা যায়। তিনি একান্ত সংলাপে অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেন পরবর্তী অধ্যায় পাঠ না করলে এ সংলাপ বা একান্ত ভাবনা সহজে বোধগম্য হয়না। যেমন আল-হুব্ব আল-দায়ি 'উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে গল্পের মূল নায়িকা একান্ত ভাবনা দিয়ে তিনি গ্রন্থ শুরু করেছেন। তেমনি ভাবে দো'য়া আল-কারাওয়ান 'উপন্যাসে কারাওয়ান বা কোকিলের সাথে সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করেছেন। কয়েক পৃষ্ঠা সংলাপের পর প্রধান নায়িকা আমিনার পরিচয় দিয়ে মূল গল্প শুরু করা হয়েছে।

---

২১. ডঃ সায়্যেদ ইহতেশাম আহমদ নদভী, জাদীদ আরবী আদব কা-ইরতিকা,(হায়দরাবাদ, ভারত, ১৯৬৯ খৃ.)পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

একই অর্থের জন্য তিনি একাধিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা বক্তাদের বৈশিষ্ট্য। শব্দ চয়নে তিনি ছিলেন পারদর্শী, আর উপস্থাপনায় তিনি আকর্ষনীয় ভংগীর পরিচয় রেখেছেন। বিষয় বস্তুকে তিনি সহজবোধ্য করে পেশ করেন। তাঁর বর্ণনা অনর্গল, আর একই বক্তব্য তিনি বার বার উল্লেখ করেন। তিনি নিজের বিশ্বাসের পরিপন্থী বক্তব্যকেও অত্যন্ত জোরালোভাবে যোগ্যতার সাথে উল্লেখ করেন। সাধারন পাঠক তা পাঠ করে কোন ক্রমেই উপলব্দি করতে পারে না যে, লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এর পরিপন্থী[২২]। তিনি বক্তব্য শেষ করা পর্যন্ত পাঠককে কৌতুহলী করে রাখেন। ত্বাহা হোসাইন সর্বদা গাম্ভীর্যতা ও শালীনতা বজায় রেখে বক্তব্য পেশ করেন, কখনোই বক্তব্যকে হালকা করে দেন না। যেমন দোয়া আল্-কারাওয়ান সহ অন্যান্য উপন্যাসে তিনি প্রেম, বিরহ, নারী নির্যাতনের বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিল। অথচ বক্তব্য ফুটায়ে তুলতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। ত্বাহা হোসাইন নিজস্ব মতামতকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে পেশ করেন এবং যুক্তি সহকারে উল্লেখ করেন, পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের প্রতি কোন কটুক্তি না করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। যেমন 'আদাব আল-জাহিলী' গ্রন্থে এবং এর উপর সমালোচনা করে লিখিত বইয়ের প্রতিউত্তরে রচিত বইতে তিনি নিজের মতামত যুক্তি সহকারে জোরালো ভাবে পেশ করেন। তিনি অত্যাধিক আবেগ এবং উত্তেজনা পরিহার করে বক্তব্য রাখেন। তিনি নিজেকে খুব বলে প্রকাশ করেন না এবং কখনো বা তার রচনায় অন্যান্য লেখক বা সাহিত্যিকের সহযোগিতা তিনি নিয়েছেন। যেমনঃ তওফীক আল-হাকীম। তার রচনাশৈলী ও বাচনভঙ্গীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলোঃ শেষ পরিণতির পর বক্তব্য শেষ করে দিয়ে পাঠকদেরকেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ভাব জাগিয়ে তোলেন। রচনায় মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন মতামত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ তিনি তার রচনায় ব্যবহার করেছেন। আর তার রচনায় তিনি কুরআনের বাচনভঙ্গীর অনুকরণ করেছেন। যেমনঃ

قال الفتى . إلى اين تريد ؟ قال ابو حذيفة اريد ان
أشهد الآلهة عن حلفنا .

الوعد الحق

---

২২. আবুল হাসান আলী নদভী, মুখতারাতুল আদব।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করে ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন এবং আরবীতে ফরাসী বই অনুবাদ করেছেন তাই তার রচনাবলীতে ফরাসী রচনাশৈলীর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যের প্রাচ্য বিষয়ক পন্ডিত কাচিয়া পেরি বলেছেন যে ত্বাহা হোসাইন এর রচনাশৈলী ছিল প্রাচীন ধারার অনুসরনে। তার রচনায় নিজস্ব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ও বহু চিন্তার সমাবেশ রয়েছে। তার মোট প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশী। বেদুইন জীবন চিত্র, চিত্রধর্মী রচনা, বিদেশী জীবনের সাথে মিসরীয় জীবনের তুলনা, ইত্যাদি ছিল তার রচনার বৈশিষ্ট্য । এছাড়াও তার রচনায় ফরাসী শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় এবং রূপক অর্থে আরবী শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর রচনায় কিছু ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে বলেও সমালোচকগন উল্লেখ করে থাকেন[২৩]।

---

২৩. Chachia, Pierre. Taha Hussayn his place in the Egyptian literary Renaissance, (London, 1956) PP.215-222.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তওফীক আল্-হাকীমের জীবনী

তওফীক আল-হাকীম আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের কিংবদন্তীর নায়ক। উপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ এ কথায় সাহিত্য সমালোচনাগণ একমত[১]।

জন্ম ঃ তওফীক আল-হাকীমের জন্ম হয় ১৮৯৮ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়ার বুহায়রা এলাকার দালেঞ্জা গ্রামে। এটি ছিল তাঁর বড় খালার বাড়ি। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার পার্শ্ববর্তী দেমানহূর এলাকায়। তাঁর পিতার নাম ইসমাঈল আল-হাকীম। পিতা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি কায়রোর আইন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। বিভিন্ন নিম্ন আদালতে চাকুরি করে একসময় তিনি পদোন্নতি পেয়ে নিম্ন আদালতের হাকীম হয়েছিলেন। দাদাও জামে আল-আযহারের ছাত্র ছিলেন। বিখ্যাত সংস্কারক ইমাম আবদুহ্ আল-আযহারে দাদার সহপাঠী ছিলেন। দাদা বেশভূষায় ও আদর্শে আবদুহুর মত ছিলেন[২]। কায়রোতে পিতার সহপাঠি ও বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক লুৎফী সাইয়্যেদ[৩]। তাওফীকের চারজন দাদী ছিল। তাঁর আপন দাদী উচ্চ বংশিয়া ছিলেন। দাদীর সূত্রে পিতা অনেক জমি বা খামারের মালিক ছিলেন। এভাবে পিতা একজন ভূস্বামী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন।

তওফীক আল-হাকীম নিজে ৩টি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। যৌবনে প্যারিসের প্রবাস জীবনের স্মৃতি কথা দিয়ে প্রথম জীবনকথা রচনা করেছেন 'যাহ্রাত আল-উমর' বা 'জীবনের ফুল' নাম দিয়ে, এতে তার সাহিত্য জীবন ও চিন্তাধারা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। তার বয়স যখন সত্তরের

---

১. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২১৪।
২. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর,(কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৩ খৃ.)দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

দশকে তখন তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে নিয়ে রচনা করেন জীবনী গ্রন্থ 'সিজন আল-উমর' বা জীবনের কারাগার। জীবনের কারাগারে তিনি জন্ম থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আত্মজীবনীর স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন। এ কথা তার নিজ বর্ণনা থেকে জানা যায়[৪]। শেষ বয়সে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'হায়াতী' বা আমার জীবন নামে। 'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাস ও 'তাআদালিয়া' সহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও তার জীবনী জানা যায়।

তাওফীকের মা ছিলেন তুর্কী। মিসরে তুর্কী বংশকে অভিজাত হিসেবে মনে করা হতো। মা নাবিক পরিবারের সদস্যা ছিলেন। যেহেতু তর্কী খেলাফত বা উছমানী রাজ বংশের শাসন কয়েকশত বছর থেকে মিসরে চলে আসছিল। অতএব তুর্কীরা শাসক হিসেবে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিসেবে মিসরে সম্মানিত ছিল। তাওফীকের মাতা সে বংশধারার শিক্ষিতা সংস্কৃতিমনা এবং আভিজাত্যের ধারায় গর্বিতা মহিলা ছিলেন। স্বামীর উপর তার বেশ প্রভাব ছিল। স্বামীকে তিনি সভ্যতা সংস্কৃতি শিখানোর চেষ্টা করতেন। পরবর্তী কালে রচিত তওফীক আল-হাকীমের জীবনী ভিত্তিক তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আওদাত আল-রূহ হতে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিচারণ বর্ণনার চরিত্র থেকে জানা যায়। তওফীক আল-হাকীমের পরিবার ছিল যৌথ পরিবার, যা তৎকালীন সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পিতা মাতা চাচা চাচী ফুফী দাদা দাদী ভাইবোন নিয়ে তাদের যৌথ পরিবারের আকার ছিল বিরাট। বৃহৎ কৃষক খামারের মালিক ভূস্বামীর পরিবারে খাদেম বা চাকর চাকরানীর সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিলনা। এদের বিস্তারিত বিবরণ তওফীক আল-হাকীমের 'আওদাত আল-রূহ; আত্ম জীবনী গ্রন্থ 'যাহারাত আল-উমর' এবং 'সিজন আল-উমরে' বর্ণিত হয়েছে। মা নিজেকে তওফীকের পিতা থেকে অধিক মেধাবী ও বুদ্ধিমতী বলে দাবী করতেন[৫]।

'দেম্‌নহুর' ছিল একটি পল্লী এলাকা। গ্রামীণ জীবনের সকল পরিবেশ ও উপকরণ এখানে উপস্থিত ছিল। গ্রামের পরিবেশ হলেও এখানে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের কোন উপকরণের কমতি ছিলনা। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তওফীক পরিবারের কোন সমস্যা ছিল বলে জানা যায়না। পরবর্তী

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পিতা দোতালা বাড়ি নির্মাণ করেন। সে সময় তওফীক ও তার ছোট ভাই কায়রোতে শিক্ষাবস্থায় ছিলেন[৬]।

যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ি ছিল যা একমাত্র তাদের পরিবারের জন্যই ব্যবহৃত হত। গ্রামের অন্যরা প্রায় সকলেই কৃষক ছিল। এধরণের গ্রামীণ কৃষক সমাজে তওফীক আল-হাকীমের বাল্যকাল কাটে। তাঁর মা তাঁকে গ্রামের কৃষকদের ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে দিতেন না। এমনকি গ্রামের বা প্রতিবেশীদের ছেলে মেয়েদের সাথে খেলতে দিতেও রাজী ছিলেন না। নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশে পরিবারের সদস্যদের আদর আপ্যায়নেই মা ছেলেকে রাখতে চাইতেন[৭]। কিন্তু তাওফীকের শিশু মন তা মানতে চাইতনা। তিনি মুক্তভাবে গ্রামের শিশুদের সাথে খেলতে চাইতেন। পরবর্তী কালে তিনি তার এ বাল্যকালের স্মৃতিকথা এবং তার পরাধীন বাল্যকালের কথা সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। মা নিজে যেমন মূল্যবান পোষাক পরিধান করে থাকতেন শিশুকেও সুন্দর দামী পোষাক পরিয়ে রাখতেন। মা ছেলেকে কৃষকদের শিশু থেকে পৃথক চিন্তা করতেন। তাকে অভিজাত শ্রেণীর শিশু হিসেবে পরবর্তী জীবনে সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বড় হতে হবে এ স্বপ্নই মা দেখতেন।

মা শুধু তার শিশুকেই নয় বরং স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সংস্কৃতিবান হয়ে চলার জন্য দস্তরমত শাসন করতেন। এ মায়ের প্রভাব পরবর্তী জীবন তাওফীকের উপন্যাস ও গল্পের নারী চরিত্র নির্মাণে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কেননা তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনমানসিকতা ও প্রয়োজনের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। অধিকন্তু তিনি তুর্কী মহিলা হিসেবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনে মর্যাদার আসনে পূর্ব থেকে স্থান দখল করে ছিলেন। মা শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি গল্পের বই পড়তেন। ছোট বয়সে তওফীকও গল্পের বই পড়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন[৮]।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।
৭. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব, পৃ. ২৮৮।
৮. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাওফীকের বিখ্যাত উপন্যাস 'আওদাত আল-রূহ' এর বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি তাওফীকের চাচা ফুফীদের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় যখন কায়রো থেকে তওফীক বাড়ি আসেন, তখন স্বামীকে তিনি ভৎর্সনা করেন এই বলে যে, তোমার কি কোন বুদ্ধি বিবেক কিছুই নেই, ছেলে এসেছে। তুমি তার পরীক্ষার খবর নিয়ে তোমার প্রশ্ন শুরু করলে। একবারও তার শরীর কেমন, তার চাচারা কেমন আছে, ফুফী কেমন আছে কিছুই জানতে চাইলেনা[৯]।

এমন সংস্কৃতিবান শিক্ষিত বুদ্ধিমতি এবং সুন্দরী মহিলার সন্তান ছিলেন তওফীক আল-হাকীম। পিতা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ও সাহিত্যামোদী। পিতার ব্যক্তিগত পাঠাগারে সাহিত্য সংস্কৃতিসহ ইসলামী ও বিজ্ঞান বিষয়ক শতশত বই ছিল। পিতা এসব পাঠ করতেন। তওফীকও এসব পড়তেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি পিতার কাছে ঋণী বলে উল্লেখ করতেন[১০]।

তওফীক পিতার ন্যায় সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। ছোট ভাই যুহায়ের মায়ের মতো হালকা পাতলা ছিলেন। সিজন আল-উমরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ত্বাহা হোসাইনের রচনায়ও তাওফীকের সুন্দর দেহ ও সুন্দর মনের বর্ণনা আছে। গ্রামীণ জীবনের অকৃত্রিম পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জীবনকে তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষাঃ পারিবারিক পরিবেশেই শিশু তাওফীকের শিক্ষার হাতে খড়ি। কারণ গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাওফীকের শুরু হতে একটু বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে তাঁকে একজন উস্তাদ কুরআন শিক্ষা দিতেন। এই উস্তাদের প্রশংসা তিনি তার স্মৃতিচারণ পুস্তকে করেছেন। শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন[১১]।

---

৯. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, দার আল-মা'আরিফ, কায়রো, পৃ. ১০।
১০. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ১৭০।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পরেই তাকে একটু দূরে অবস্থিত দেমানহুর এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়[১২]। অবশ্য তার নিজ বর্ণনায় স্কুলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বয়স আট বছর বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর যাতায়াতের মাধ্যমে ছিল তাদের ঐতিহ্যবাহী সুন্দর ঘোড়ার গাড়িটি যা ছিল গ্রামের ছেলেদের অন্যতম আকর্ষনীয় বিষয়। মা কখনো নিজেই ঘোড়ার গাড়িতে করে আদরের খোকাকে দেখতে চলে যেতেন। একান্ত মায়ের আঁচল থেকে একটু মুক্তি পেয়ে বালক তওফীক কিছুটা খুশীই হলেন কারণ এ সময়টা গ্রামের ছেলেদের সাথে খুশিমনে তিনি খেলতে পারতেন। তবুও তিনি মায়ের আঁচল থেকে পুরোপুরী মুক্তি পাচ্ছিলেন না কেননা স্কুলে থাকার পরিমাণ খুব বেশী হচ্ছিলনা। ছুটির দিন কখনো স্কুলে থাকা হয়নি। আর বাড়িতে এসে মায়ের আঁচলে থেকে গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলার সুযোগ ছিল না।

উল্লেখ্য যে, পরিণত বয়সে তাঁর বন্ধু ত্বাহা হোসাইন যে বয়সে কুরআন শরীফ হেফজ শেষ করেছেন তওফীক তখনো মায়ের আচলে লুকোচুরি খেলছেন। তবে তাঁর মায়ের ভালবাসা কখনোই তাকে উছৃংখল বা বিলাসী হতে সহায়তা করেনি। বরং মায়ের ভালবাসা আদর ছিল তাঁর প্রতি মায়ের অধিক সর্তকতার পরিচায়ক। মূর্খ কোন মহিলার মত তিনি ছেলেকে আবাসিক স্কুলে পাঠাতে আপত্তি করেননি। তেমনভাবে আপত্তি করেননি মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্য সুদুর রাজধানী শহর কায়রো প্রেরণ করতে। মায়ের প্রভাব নারী চরিত্র নির্মাণে তাঁর উপন্যাস ও নাটকে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। মায়ের পরিপাটি জীবন যাপন, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিবেশ তাকে সাংস্কৃতিক জীবনে শিল্পমন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে এজন্য তারপক্ষে শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক, নাট্যকার ও উপন্যাসিক হওয়া সহজ হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর পিতার অবদানও ছিল অসামান্য।

দেমানহুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার চেয়ে গ্রামীণ পরিবেশ ও বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করা তাঁকে অধিক আর্কষণ করেছে। তাই তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি এসব চিত্র তুলে ধরেছেন। ক'দিনের

---

১২. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন, কয়েকদিন মা খোকার খবর পায়নি বলে চিন্তিত ছিলেন অবশেষে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চাকরসহ দেমানহূর স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তওফীক (গল্পের নাম মুহসিন) গ্রামের ছেলের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল। পরিচিত সুন্দর ঘোড়ার গাড়িটি দেখে গ্রামের ছেলে সেদিকে মনোযোগী হয়েছে কিন্তু মুহসিন মায়ের আগমন প্রত্যক্ষ করে, না দেখার ভান করে খেলাধুলা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বন্ধুদের সাথে খেলা ছেড়ে আসা তার পছন্দ হয়নি। কিছুক্ষন পর মায়ের সাথে আসা লোকটি চিৎকার করে মুহসিনকে তাঁর মায়ের আগমনবার্তা পৌছায়। এবার তাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিলনা। মা পুরো বিষয়টি ভালভাবেই এবং সচেতন ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বুঝেছেন খোকা এখন খেলার সাথীদের সাথে জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছে, সে গ্রাম্য বন্ধুদেরকে ভালবাসতে শুরু করেছে[১৩]।

শুধু তাই নয় গ্রামীণ জীবনে বাল্যকাল থেকেই গভীর অনুভূতি দিয়ে গ্রামীণ জীবনের দরিদ্রতাকে প্রত্যক্ষ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল তওফীকের। বন্ধুদের পোষাক থেকে তার ভাল জামা কাপড়, বন্ধুদের অভিভাবক থেকে তার প্রতি অভিভাবকদের অধিক যত্ন এবং তার যাতায়াতের ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা রীতিমত তাকে লজ্জিত করত। গাড়িতে যাতায়াতের অনুভূতিতে তিনি সে বয়সে উপলব্ধি করতেন আমার জীবন যাত্রা দেখে নিশ্চয়ই আমার বন্ধুদের মনে কষ্ট অনুভব হয় এজন্য তিনি মনে মনে লজ্জিত হতেন এবং বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতিও মমত্ববোধ পোষণ করতেন। তিনি কামনা করতেন তাকে যেন পোষাকে ও পরিবেশে বন্ধুদের থেকে উপরে অথবা ভিন্নভাবে প্রকাশ করা না হয় এবং নিজেও নিজকে তিনি উপরে ভাবতে রাজী ছিলেন না। এ বয়সে তার এ অনুভূতি মহৎ ও উদার মনের পরিচয় বহন করে। এহেন উদার হৃদয়ই আস্তে আস্তে তাকে মানুষের জীবন সম্পর্কে, দেহমন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আকৃষ্ট করে। এ চিন্তাই পরবর্তী জীবনে তার গল্পে, নাটকে, পেশা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে এবং জনগণের মনের গভীরে তার সাহিত্য স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে।

---

১৩. তওফীক আল-হাকীম, -আওদাত আল-রূহ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীমের বাল্যকাল আলোচনার সময় তাঁর পারিবারিক জীবনের স্বচ্ছলতার আলোচনায় এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, তওফীক কোন ধনকুবের পরিবারের সদস্য ছিলেন বস্তুতঃ গ্রামীণ কৃষকসমাজে তার পরিবার নেতৃস্থানীয় ছিল তবে তাদের পরিবার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছিল না। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর যিনি সর্বপ্রথম আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন, তিনি উল্লেখ করেছেন-

তওফীক আল-হাকীম (১৯১৮ - ১৯৮৭ খৃ.) সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের ব্যতিক্রম ছিলেন। কেননা তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ডঃ ত্বাহা হোসাইন, ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্বাদ ও ইবরাহীম আবদুল কাদের আল-মাযেনী এরা সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিপালিত হন[১৪]।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তওফীক আল-হাকীমকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য রাজধানী কায়রোতে প্রেরণ করার জন্য তাঁর পিতা সিদ্ধান্ত নেন।

কায়রোতে তখন তাওফীকের দুই চাচা এক ফুফী সহ অন্যান্য কিছু আত্মীয় থাকতেন। একচাচা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অন্যজন ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। এক ফুফী ও ভাইদের সাথেই থাকতেন। পরবর্তী সময়ে ছোট ভাই যুহায়েরও কায়রোতে ভর্তি হয়।

তাওফীকের একমাত্র ছোট ভাই যুহায়ের কায়রোতে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ত। তওফীক যখন আইন কলেজে স্নাতক শেষ বর্ষের ছাত্র তখন যুহায়েব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় মারা যায়[১৫]। তাওফীকের পিতা মাতা মনে করলেন যেহেতু তাওফীকের চাচারা ও ফুফী কায়রোতে আছেন অতএব অনেকটা নিজ পরিবারে থেকেই তাদের আদরের সন্তান উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে। এতে মাও আপত্তি করেন নি।

---

১৪. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২৮৪।
১৫. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে গ্রামের তরুন বালক তওফীক আল-হাকীম প্রথম গ্রাম ছেড়ে শহুরে জীবনে পদার্পণ করেন এবং মায়ের আঁচল ও শাসন থেকে নিজকে মুক্ত ভাবতে শুরু করেন। রাজধানী শহরে এসে তাওফীকের নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। গ্রাম আর শহরের পার্থক্য তিনি প্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। শিক্ষার মান যাচাই করারও তিনি সুযোগ পান। কায়রোর শিক্ষার মান গ্রাম থেকে উন্নত তা তিনি উপলব্ধি করেন। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ তাঁকে বেশ উৎফুল্ল করে দিল।

কায়রো থেকে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল রেলগাড়ি, দেমানহুরে রেল ষ্টেশন ছিল। দেমানহুর থেকে কায়রোগামী রেলগাড়ির দীর্ঘ যাত্রাপথে দুপাশে গ্রামের জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর শিল্প মনকে আকৃষ্ট করত। এসব দৃশ্যের বর্ণনা তাঁর সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার জীবন সুখে আনন্দে কাটলেও মায়ের জীবনের মধ্যমনি তাওফীকের জন্য মায়ের বেদনার চিত্রও তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

ছুটি হলেই তিনি রেলগাড়িতে করে চলে আসতেন গ্রামে পিতা মাতার কাছে। দেমানহুরের ষ্টেশনে নির্ধারিত সময়ে তার জন্য ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকত[১৬]। কায়রোতে কলেজে শিক্ষা জীবন চলাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কলেজে সাংস্কৃতিক চর্চায় তিনি জড়িয়ে পড়েন বিশেষ করে সংগীত এবং নাটকে। এ ব্যাপারে তিনি প্রভাবিত হন তরুন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যুবক মুহাম্মদ তাইমুরের নাটক চর্চায়। মুহাম্মদ তাইমূর ছিলেন মিসরের বিখ্যাত সংস্কৃতিবান তাইমূর পরিবারের সদস্য। তাঁর ছোট ভাই ছিলেন বিখ্যাত গল্পকার, উপন্যাসিক মাহমূদ তাইমূর।

তওফীক আল-হাকীম এখন যুবক। এটি হচ্ছে ১৯১৯ খৃ. সালের কথা। যখন ১ম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধরে কোথাও স্বাধীকার আন্দোলন, কোথায়ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, কোথায়ও বা গণতন্ত্রের নামে বিপ্লব।

---

১৬. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

মহাযুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফোরণ কিছুটা স্তিমিত হলেও আদর্শিক দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বেই নয় বরং ইউরোপসহ অন্যান্য উন্নত বিশ্বে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯১৯ খৃ. সালে মিসরে অনুষ্ঠিত হয় গণবিপ্লব নামে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীকার আন্দোলন।

গণবিপ্লবের গণজোয়ার যুবকদের উল্লাস উদ্দিপনায় যুবক তওফীক আল-হাকীমও জড়িয়ে পড়েন। তবে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল অনেকটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে প্রসিদ্ধি লাভের মানসিকতার তিনি বিরোধী ছিলেন[১৭]।

গণবিপ্লবের মাধ্যমে মিসর দুর্বল তুর্কী খেলাফত থেকে মুক্ত স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং বৃটিশ প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্য দিকে বিজয়ী মিত্রশক্তির অংশিদার বৃটিশ অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসরেও তুর্কী কর্তৃত্ব খর্বের ঘোষণা দিয়ে মিসরকে নিজেদের আশ্রিত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। যুবকদের মধ্যে ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা ঝোঁকও লক্ষ্য করা যায়।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে যুবক তওফীক আল-হাকীমের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশের উঁকিঝুঁকিও লুকোচুরি চলতে থাকে। ১৯২২ খৃ. তিনি কয়েকটি খন্ড নাটক রচনায় উদ্যোগী হন। কয়েকটি নাটক রচনা করলেও এটা ছিল অদক্ষ কাঁচা হাতের কাজ[১৮]।

'আল-মার'য়াত আল-জাদীদাহ' (আধুনীকা মহিলা) আল-দায়ফ আল-ছাকীল (অলস মেহমান) ও আলী বাবা, নামে কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এসময় নাট্যকর্মীরা মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করত। বিপ্লব উত্তর মঞ্চ নাটকের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় তখন নাটকে বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হতে থাকে।

---

১৭. তওফীক আল-হাকীম, যাহারাত আল-উমর, দার আল-মা'আরিফ,(কায়রো, ১৯৪৩ খৃ.)পৃ. ১৮।
১৮. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

'সিজন আল-উমরের বর্ণনা থেকে জানা যায় ১৯১৯ খৃ. সালের শেষ দিকে তিনি 'আল-দায়ফ আল-ছাকীল' নাটক রচনা করেন এবং তা মঞ্চস্থও হয়। নাটকটি ছিল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করার জন্য। নাটকে বৃটিশকে অনাকাঙ্খিত মেহমান হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে[১৯]। আসলে ১৯১৯খৃ. সালের বিপ্লব ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

১৯২৪ খৃ. সালে তওফীক আল-হাকীম আইন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কায়রোতে চাচা ও ফুফী এবং পরবর্তী সময়ে চাচাত ভাই ও ছোট ভাই সহ থাকাকালীন তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা তার পরবর্তী নিরলস সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনের উপর রেখাপাত করেছিল।

ফুফী যনূবা কিছুটা বয়স হওয়ার পরেও চেহারা ও শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে বিবাহ বিলম্বিত হচ্ছিল। তাঁর সাথে তাওফীকের কথা বার্তায় ঘরের সময় কাটত। বিকেলে তিনি কখনো বাড়ীর ছাদে বসে ফুফী সহ গল্প করতেন অথবা গল্প, নাটক কখনো কবিতার বই নিয়ে বসতেন। পাশের বাড়ীর ছাদের সাথে এ বাড়ীর ছাদ যুক্ত ছিল। ছাদে বসে আড্ডা থেকে ধীরে ধীরে পাশের বাড়ীর যুবতী সানিয়্যার সাথে তাওফীকের ভাব জমে উঠে, এ ব্যাপারে ফুফী ছিলেন সেতু বন্ধন। ফুফীর সাথেই প্রথমে সানিয়্যার কথাবার্তা হয়। দু' বাড়ীর ছাদে যনূবা ও সানিয়্যা অনেক বিকেলেই তাওফীকের সাথে গল্পের আসর গরম করেছিলেন।

এ ভাবে একদিন তওফীক ও সানিয়্যার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। জীবনের প্রথম প্রেম. যুবক তওফীক শিল্প সংস্কৃতি হৃদয় নিয়ে যৌবনে পদার্পন করেছেন, বেশ রোমান্স সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতিগত ভাবেই তওফীক ছিলেন শান্ত ধীরস্থির ও ভারসাম্য পূর্ণ প্রকৃতির যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন[২০]। তাই প্রথম প্রেম হলেও তিনি একেবারে সব কিছু ভুলে প্রেম সাগরে সাতার দিবার প্রচেষ্টা নেননি। এটি ছিল যুবক বয়সের এবং অবস্থানগত সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রেম।

---

১৯. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ১৫০।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে সানিয়্যার সাথে তাওফীকের প্রেম বেশী এগুতে পারেনি। কেননা সানিয়্যা যখন বুঝতে পারল তওফীক খুব এগিয়ে এসে কিছু একটা করে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না। তখন সে সম্পর্ক শীতল করে দেয়। কিছু দিন পর স্যানিয়্যা অন্য এক যুবকের প্রেমে পড়ে। তাদের প্রেম যৌক্তিক পরিণতিতে এগিয়ে বিবাহ বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করে। এভাবেই তাওফীকের প্রথম প্রেম এর ইতি হয় এবং শিক্ষা নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় তিনি ঝুকে পড়েছেন বুঝতে পেরে মাতা ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে এ পথে এগুতে নিরুৎসাহিত করে। তারা তাকে একাডেমিক ক্যারিয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শাস্ত্রে সম্মানিত পেশা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন। পিতা তার সাহিত্য চর্চার বিরোধী ছিলেন না। সাহিত্যকে জীবিকার জন্য যথেষ্ট নয় মনে করে ছেলেকে সাহিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুকে পড়তে বারণ করতেন[২১]।

এজন্য তিনি প্রথম ছদ্ম নাম দিয়েও লিখেছিলেন। আত্মীয়-স্বজন তাকে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করে আইনের পেশা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি মনে মনে তাঁর সাহিত্য জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোপনে মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন কায়রোতে থেকে আত্মীয় স্বজনের নজর এড়িয়ে তিনি এপথে বেশী এগুতে পারবেন না, তাই তাঁকে প্যারিসে যেতে হবে। কায়রোতে আইন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করার পর বাড়ী থেকে মায়ের চিঠি আসে- ছেলের বিবাহের জন্য তিনি পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন। এদিকে পিতা তাকে পিতার একান্ত বন্ধু বিখ্যাত লুৎফী সাইয়্যেদের নিকট দিয়ে যান। লুৎফী সাইয়্যেদ তখন দার আল-কিতাবের পরিচালক। পরবর্তী জীবনে তওফীক একই কক্ষে একই পদে দীর্ঘ দিন ছিলেন। পিতা ছেলেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং সাহিত্যের প্রতি তার আসক্তির কথা উল্লেখ করেন। লুৎফী ছেলেকে আইনে ডক্টরেট করার জন্য প্যারিসে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন। দেশে এসে

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা উচ্চতর সরকারী পদে আসীন হয়ে চাকুরির সাথে সাথে সাহিত্য চর্চাও করা যাবে বলে মন্তব্য করেন[২২]।

উচ্চশিক্ষার জন্য ফরাসী গমনঃ যুবক তওফীক আল-হাকীমের হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন। তিনিও পিতাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন আইন শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার জন্য তাঁকে প্যারিসে যাওয়া প্রয়োজন। প্যারিসে তিনি আইনে ডক্টরেট অর্জন করতে পারলে তার পেশাগত জীবনে কি সুবিধে হতে পারে তা তিনি আকর্ষণীয় ভাবে পিতার নিকট ব্যক্ত করেন[২৩]। পিতার সম্মতিতে ২৬ বছর বয়সে ১৯২৪ খৃ. সালে তিনি প্যারিস গমন করেন।

প্যারিস তখন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। বিশেষ করে মিসরে ফরাসী প্রভাব বেশী হওয়ার কারণে এবং অবস্থানগত ভাবে প্যারিস থেকে মিসর নিকটবর্তী হওয়ার সুবাদে প্যারিসের প্রতি মিসরীয়দের আকর্ষণ ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। মিশরীয় যুবকদের স্বপ্নপুরী ছিল প্যারিস। প্যারিসে যেতে পারাটাই যেন অনেকটা জীবন সফলতার মাপকাঠি। তাওফীকের বন্ধু বান্ধবরাও প্যারিসে লেখাপড়া করেছেন। যেমনঃ ডঃ ত্বাহা হোসাইন।

প্যারিসে এসে তিনি নতুন আবহাওয়া নতুন সমাজের সাথে মিশে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্যোগী হন। প্যারিসে আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করার জন্য তিনি যতটুকু অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন তার থেকে অধিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। তিনি গ্রীক দর্শনের উপর গভীর মনোযোগ দেন। গ্রীক নাটক, ইংরেজী নাটক, উপন্যাস, রুশ সাহিত্য সহ তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে দস্তুরমত গবেষণা শুরু করেন। সেক্সপিয়ার, টলষ্টয়, প্লেটো ও কার্লমাকস সহ বিভিন্ন মনিষী চিন্তা ও কর্মের সাথে তিনি পরিচিত হন। এসব বিষয়ের অধ্যয়ন ও চর্চাই তাঁর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।
২৩. ডঃ শাওকী দায়ক, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প বিপ্লবোত্তর ফরাসী সমাজে নারী ও শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা তথা পরিবর্তিত অবস্থান তিনি গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের নামে পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার করুণ চিত্র তিনি ফরাসী সমাজে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। প্যারিসে এসে তওফীক তাঁর চিন্তার জগতের দুয়ার পৃথিবীর জন্য খুলে দিয়ে নিজেকে চরম স্বাধীন চিন্তার অধিকারী মনে করেন। তবে কখনো পিছে ফেলে আসা প্রাচ্য তথা মিসরীয় সমাজকে ভুলে যাননি। নতুন অভিজ্ঞতা, ইউরোপীয় সমাজ দর্শন ও সভ্যতাকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন, যেমন করেছেন তার বন্ধু ডঃ ত্বাহা হোসাইন। নতুন চিন্তার ভিত্তিতে তিনি মিসরীয় সমাজে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ করেন।

ফরাসী বন্ধু আন্দারীয়া ও তার স্ত্রী জারমিন প্যারিস জীবনে তাঁর সহযোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতী নির্ধারণেও আন্দারীয়া গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তাঁর রুশ বন্ধুর সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তার সাথে তওফীক সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকরাজ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তওফীক তাকে সমাজতন্ত্রের বস্তুকেন্দ্রিক সভ্যতাকে প্রাচ্যের মানবিক মূল্যবোধ কেন্দ্রিক সভ্যতার সাথে তুলনা করতে পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে 'উসফুর মিন আল-শারক' উপন্যাসে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্যারিসে তওফীক তাঁর জীবনের দ্বিতীয় প্রেমে পড়েন। ফরাসী যুবতী 'ঈমা' তার প্রিয়তমা ছিলেন। ফরাসী মুক্ত সমাজে তাওফীকের রক্ষণশীল সমাজের সদস্য হিসেবে জড়তা প্রেমের পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা ছিল। এ নিয়ে আন্দারীয়া ও তার স্ত্রী তাওফীককে অনেক সময় তিরস্কার করতেন। আন্দারীয়া একজন সাহিত্যিক ছিলেন। ডঃ ত্বাহা হোসাইনের সাথেও আন্দারিয়ার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একাধিকবার কায়রো সফর করেছেন।

বন্ধুপত্নী জারমিন তাকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। তওফীক ফরাসী যুবতীদেরকে প্রেমের জালে আটকানো কঠিন বলে একবার মন্তব্য করলে জারমিন তাকে বলেনঃ তুমি বাজার থেকে একটি ফুলের তোড়া এনে তোমার পিয়াকে উপহার দিয়ে বলঃ আমি তোমাকে ভালবাসি। তাহলেই দেখবে সে তোমার প্রতি দুর্বল ও আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। উত্তরে তওফীক বলেনঃ সে যদি ফুলের তোড়া

Dhaka University Institutional Repository

ছুড়ে ফেলে। জারমিন তখন বলেছিলঃ ফুলের তোড়া ছুড়ে ফেলে দেয়। প্যারিসে এমন যুবতী নেই[২৪]। তাওফীকের সাহিত্য জীবন ও সংস্কৃতিক জীবনের আলেখ্য 'যাহ্‌রাত আল-উমর', সিজন আল-উমর এবং উসফুর মিন আল-শারক উপন্যাসে তিনি তাঁর প্রেমের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন[২৫]।

فتفكر محسن قليلا، ثم قال : واذالم تقبل منى طاقة الزهر؟ فقالت جرمين من فورها : لايوجد إمرأة فى باريس ترفض طاقة من الزهر ---

প্যারিসে তিনি সংগীতে মোহিত হন। সংগীত চর্চায়ও তিনি অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। মঞ্চ নাটকের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর পূর্ব থেকেই, এখানে নাট্যশালা ও সিনেমায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বস্তুতঃ প্যারিসে যুবক তওফীক একজন সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর প্যারিস জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাবলীর আলোচনা তিনি পরবর্তী সময়ে রচনা করেন তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'উসফুর মিন আল-শারক' বা (প্রাচ্যের চড়ুই)। প্যারিসে বন্ধু আন্দারিয়া তাকে প্রাচ্যের চড়ুই নাম দিয়েছিল এবং এ নামে তাকে ডাকত, তাই তিনি নিজেকে এ নামেই সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন।

প্যারিসে তওফীক আল-হাকীম দীর্ঘ চার বছর অবস্থান করেন। ১৯২৮ খৃ. সালে তিনি প্যারিস থেকে কায়রোর পথে রওয়ানা হন[২৬]। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করতে পারননি। তিনি সাহিত্যের চাদর জড়িয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহিত্য শিল্পী হিসেবে প্যারিস থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন[২৭]। প্যারিসে বসেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আওদাত আল-রূহ' রচনা করেন ১৯২৭ খৃ. সালে।

---

২৪. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, দার আল-মা'আরিফ,(কায়রো) পৃ. ৫২।
২৫. তওফীক আল-হাকীম, যাহ্‌রাত আল-উমর, পৃ. ৩৯৯।
২৬. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৯০।
২৭. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন ঃ ১৯২৮ খৃ. সালে ৩০ বছর বয়সে তওফীক আল-হাকীম প্যারিস থেকে দেশে ফিরে জীবিকার জন্য কোন পেশায় যোগদান করার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯২৮ খৃ. সালেই তিনি বিচার বিভাগে পিতার মত সরকারী উকীল হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। বিভিন্ন মফস্বল এলাকার স্থানীয় কোর্টে তিনি চাকুরি করেন। ১৯৩৪ খৃ. সাল পর্যন্ত ছয়বছর তিনি কয়েকটি ষ্টেশনে বিচার বিভাগের চাকুরির সমাপ্তি করেন। এ সময়টি ছিল তাঁর জীবনের উল্লেখ্যযোগ্য শ্রেষ্ঠ সময়, কেননা দিনের বেলায় তিনি কোর্টে কাজ করতেন, রাতের বেলায় তিনি খাতা কলম নিয়ে কাটাতেন। এসময়ই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বিশ্ববিখ্যাত কথা সাহিত্য 'আওদাত আল-রূহ' ১৯৩৩ সালে এটা প্রকাশিত হয়। দু'খন্ডে সমাপ্ত দীর্ঘ এ উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে মিসরীয় সাহিত্য জগতে সাড়া পড়ে যায়। সাহিত্যিক সমালোচকদের নজর তাওফীকের প্রতি পড়ে। কথা সাহিত্যের ধারায় ব্যাপক জাগরণ শুরু হয়।

বিচার বিভাগে চাকুরি করতে গিয়ে তিনি বিচার প্রার্থী, আসামী, স্বাক্ষী সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে উঠা-বসা করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটাই তিনি তুলে ধরেছেন তার উপন্যাস- 'ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ' (বিভিন্ন পল্লী গ্রামে আইন উপদেষ্টার ডায়েরী) নামে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ. সালে।

সরকারী উকীল বা আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি চাকুরি করতে গিয়ে গ্রামীণ জীবনের সমস্যা ও আইনের শাসনের বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় পড়ে সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ কিভাবে লাঞ্ছিত হয়, তেমনি ভাবে আইনের ফাঁকে কিভাবে অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি তা উপলব্ধি করেন। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন নাটক রচনায় তার এ বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল। এ সময়ে তিনি আরবী সাহিত্য সম্পর্কেও গভীর অধ্যয়ন করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ আবদুল মুহসিন ত্বাহা বদর যিনি আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের উপর প্রথম গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি তার গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তওফীক আল-হাকীম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্যারিস থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করায় পূর্বে আরবী সাহিত্যের উপর ভালভাবে পড়াশুনা

Dhaka University Institutional Repository

করেননি[২৮]। দেশে এসে তিনি আরবী সাহিত্য সম্পর্ক প্রচুর পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি ইউরোপীয় কথা সাহিত্যের উপর অনেক লেখা পড়া করেছিলেন, বিশেষ করে গ্রীক সাহিত্য দর্শন, ফরাসী সাহিত্য এবং টলষ্টয়ের কথা সাহিত্য। গ্রীক নাটকের শিল্পকে তিনি তাঁর পরবর্তী সাহিত্য জীবনের জন্য অনুসরণীয় শিল্প বা রচনাশৈলী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় আরবী ভাষায় সাহিত্য রচনা করার উদ্যোগী হলেন। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন আরবী সাহিত্য তাঁকে ভালভাবে আয়ত্ব করতে হবে। আর তা করতে গিয়েই তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য, ত্রুটি, সম্ভাবনা এবং উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে বক্তব্য রেখে রচনা করলেন 'আহলুল ফান্ন' গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খৃ. সালে। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কিছু ছোট নাটক রচনা করেছেন। এসব নাটক মঞ্চস্থও হয়েছে। এ বয়সে তিনি সংসারী থাকার কথা থাকলেও তিনি সাংস্কৃতিক জীবন আর চাকুরি নিয়ে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যেন ব্যক্তিগত জীবনের অতি জরুরী দাম্পত্য জীবন তাঁর উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে। তিনি তাঁর জীবনের এসব অধ্যায়ের চিত্র অংকন করেছেন আল-'রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসের 'রাহেব আল-মুকাক্কের' চরিত্রে। বিলম্বে বিবাহ আর সাহিত্যে নারী চরিত্রের উপস্থাপনার কারণে কোন কোন সমালোচক তাঁকে নারী বিদ্বেষী বলেও মন্তব্য করেছেন।

১৯৩৪ খৃ. সালেই তিনি বিচার বিভাগ থেকে এসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টরের পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ খৃ. সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশাগত কারণেও তাঁর সংস্কৃতি চর্চা এবার কিছুটা গতিশীল হলো। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু নাটক চলচ্চিত্ররূপ লাভ করে মিশরের সিনেমা হলে দর্শকের করতালী অর্জন করতে সক্ষম হয়। এভাবে তিনি একজন জনপ্রিয় ও জাতীয়ভাবে পরিচিত কথা সাহিত্যিক, উপন্যাসিক এবং নাট্যকার সংস্কৃতিসেবী হিসেবে জনসাধারণের মনে আসন গড়তে সমর্থ হন। এবার তিনি ঘর বাধতে উঠেপড়ে লেগে যান। তিনি বিবাহ করলেন এবং দাম্পত্য জীবন সুখেরই হয়েছিল[২৯]। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।
২৯. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিস থেকে দেশে ফিরে তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এবং অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিচার বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করলেও তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল শিল্প। তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ পুস্তক 'যাহ্‌রাত আল-উমর' গ্রন্থে তিনি তার শিল্প সংস্কৃতি সাধনাকে মাবুদ বা একান্ত সাধনার জ্ঞান বলে আখ্যয়িত করেছেন। কথা শিল্পী, সংগীত শিল্পী ও নাট্য মঞ্চের সাথে তিনি এতটা জড়িয়ে পড়েছেন যে সংসারী হওয়ার যেন তার সময় নেই। অন্যের সংসারের সমস্যা, হাসিকান্না নিয়েই তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এসময়কার চরিত্র ফুটে উঠেছে আল-'রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসে সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতার চরিত্রে।

তিনি ১৯৩৬ খৃ. সালে আর একবার প্যারিসে যান। বন্ধু ত্বাহা হোসাইনও তখন ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। দু'বন্ধু সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ মত বিনিময় করেন। কিছু দিন তারা আলেপ্প পাবর্ত্য এলাকার গ্রামে অবকাশ যাপন করেন। দু'রসিক বন্ধু এ প্রেক্ষাপটে দুজনে মিলে রচনা করেন- 'আল-কাসর আল-মাসহুর' (যাদুর প্রাসাদ) নামক রম্য রচনা।

১৯৩৭ খৃ. সালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ১৯৪৩ খৃ. সাল পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে থেকে আজীবন সাহিত্য শিল্পের সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবিকা ও সাধনাকে আমৃত্যু চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করতঃ চাকুরি জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা লিখেছেন সমসাময়িক শিল্প সাহিত্যে একমাত্র তওফীক আল-হাকীমই সকল জীবিকার পেশা ত্যাগ করে একমাত্র পেশা ও নেশা হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বেছে নিয়েছেন[৩০]।

---

৩০. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন ঃ

ছোট বেলা থেকেই তওফীক আল-হাকীম সাহিত্যমন নিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁর দাদা একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আল-আযহারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল, দাদার অনেক বই ছিল ইসলামী সাহিত্য, কুরআন হাদীসের বই প্রচুর ছিল। এসব বই দেখার ও পড়ার সুযোগ তাওফীকের হয়েছিল। তেমনি ভাবে সাহিত্যানুরাগী পিতা যিনি আরবী সাহিত্যের কবিতা সহ বিদেশী সাহিত্যের বইও অধ্যয়ন করতেন। মা-ও ছিলেন শিক্ষিত। গল্প নাটক সহ অন্যান্য বই পড়ার হবি ছোট বয়সেই তাওফীকের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। ভারসাম্যপূর্ণ চালচলন কথা বার্তা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তওফীক বলেছেন, আমি পিতা থেকে এবং পারিবারিক পাঠাগার থেকে সাহিত্যের সবক পেয়েছি। এ জন্য প্রধানত তিনি পিতার কাছে ঋণী বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মধুর সুরই তার প্রথম শিল্প অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল[৩১]।

১৯৪৩ খৃ. সালে তওফীক আল-হাকীম ঘোষণা দিয়ে জীবনের একমাত্র মিশন ও পেশা বা নেশা হিসেবে নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। যদিও তাঁর সাহিত্য সাধনার সোনালী যুগ তিনি ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছেন। কেননা এসময়ই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম রচনা সমাপ্ত করেছেন। ইতিমধ্যে জাতীয়ভাবে তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনুবাদের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তাঁর রচনা ফরাসী, ইংরেজ ও রুশ সমাজে প্রবেশ করেছে। তাঁর নাটক প্রতিদিনই মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং নতুন করে টেলিভিশন চালু হওয়ার সাথে সাথে তাঁর নাটক টিভিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রচারিত হতে থাকে। এর পূর্বেই অবশ্য তার নাটকের চলচ্চিত্র সিনেমা হলে ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হতে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত মুহাম্মদ নাটকও তিনি এসময় রচনা করেন। যদিও জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত এ কথা-শিল্পী লিখে গেছেন কিন্তু সাহিত্য সমালোচকগণ তিরিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথম ভাগে রচিত তাঁর সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে ঘোষণা করেছেন।

ইতিমধ্যে মিসরের রাজনৈতিক আকাশে কালোমেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করে তিনি নাটকে রূপক চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদেরকে আনন্দ দেয়ার উদ্যোগ

---

৩১. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ৩৩, ৫৯, ৭২, ৭৮, ১৫১, ১৭০, ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নেন। অন্যদিকে সচেতন নাগরিক ও পাঠককে বিষয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, মানবিকতা ও আইনের শাসনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। রমযিয়া বা রম্য ও ছদ্ম রূপ দিয়ে তিনি সাহিত্যে বিশেষ করে নাটকে নতুন একটি ধারার সৃষ্টি করেন।

রম্য বা রূপক ধারাটিকে এতটা জনপ্রিয় করেছিলেন যে, যখন সামরিক শাসন বা স্বৈরতন্ত্রের যাতাকলে মিসরের জনগণ মুখ খুলতে পারছেনা, কবি সাহিত্যিকরা তাদের কলম তুলে নিয়েছেন তখনও তওফীক তাঁর সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি যখন কয়েক বছর ডঃ ত্বাহা হোসাইনের মত বিপ্লবী লেখক নীরব ছিলেন তখনও তওফীক আল-হাকীম সরব ছিলেন। তাঁর এ ধারণাটি অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁর ভাব-শিষ্য নাজীব মাহ্‌ফূজ। তিনি দীর্ঘ সরকারী চাকুরি জীবনে সাহিত্য সাধনা করে যেতে পেরেছিলেন তওফীক আল- 'হাকীমের এ রূপক ধারার মাধ্যমে'।

বাংলাদেশস্থ বাংলা একাডেমী তওফীক আল-হাকীমের রূপক ধারার একটি নাটক প্রকাশ করেছে। নাটকটি অনুবাদ করেছেন বাংলা সাহিত্যের একজন কথা সাহিত্যিক ও কবি আবদুস সাত্তার[৩২]। নাজীব মাহ্‌ফূজ উপন্যাসে তওফীক আল-হাকীমের অনুসারী হয়ে নিজস্ব স্বকীয়তা গুনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন ১৯৮৮ খৃ. সালে।

১৯৩০ খৃ. সালে থেকে ১৯৫৪ খৃ. সাল পর্যন্ত তওফীক আল-হাকীমের মৌলিক এবং সর্বাধিক রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে অতঃপর আরও দুই দশক পর্যন্ত তিনি নিয়মিত নিরলস ভাবে লিখে গেছেন। সত্তরের দশক থেকে ১৯৮৭ খৃ. সালে মৃত্যুপর্যন্ত তিনি অনিয়মিত ভাবে লেখনী জারি রেখেছেন। যে কোন সাহিত্যিকের যৌবনের রচিত সাহিত্য শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে তাওফীকের সাহিত্যেকর্মেও তাঁর তিরিশের দশকে রচিত সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ ছিল। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন বিষয়ক এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক রচনাবলী পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে স্বার্থক বলে প্রমাণিত।

---

৩২. মসীর সারসার, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, তেলাপোকার ভাগ্য, বাংলা একাডেমী,(ঢাকা) ১৯৯৪ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীকের রচনাবলী বিশেষ করে কথা সাহিত্যে সমসাময়িক আরবী সাহিত্যিক লেখকদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। আধিক্যতার মাপকাঠিই শুধু নয় সাহিত্যমান ও শিল্পগুনে তাঁর সাহিত্য শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রথম দিকে প্রায় সবকটি নাটক উপন্যাসই তিনি মিসরীয় আঞ্চলিক আরবী ভাষায় রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন আরব বিশ্বের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতি একটু লক্ষ্য করার প্রয়োজন, কেননা একজন সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্ম তার পরিবেশেই রচিত হয়। সমসাময়িক আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পেক্ষাপটে তওফীক আল-হাকীমের কথা সাহিত্য রচিত হয়েছে। আরব বিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্ব তখন উপনিবেশবাদের অধীনে শাসিত হচ্ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই ছিল তৎকালীন আরব বিশ্বের একমাত্র জাতীয় কাম্য বিষয়। মুসলমান জাতির পতনের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানে ইউরোপ যেমনিভাবে এগিয়ে গেছে একই সাথে আরব বিশ্ব তখন জাতীয় সমস্যা সমাধানের পর্যায় অতিক্রম করে উন্নয়নের বা প্রগতির ধারায় যুক্ত হতে পারেনি। শিল্প-বিপ্লবোত্তর প্রযুক্তি দিয়ে ইউরোপ অর্থনৈতিক ভাবে তৃতীয় বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। পুজিবাদের আগ্রাসনের মুক্তির জন্য আরবের কয়েকটি দেশ বিকাশমান শক্তি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে পুজিবাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পঞ্চাশের দশকে আরবের তেল প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত আরব বিশ্ব, পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আলোচনায় আসেনি। সত্তরের দশকে তেলের উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরব বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে আবির্ভূত হয়। এর প্রভাব পড়ে সাহিত্য সংস্কৃতিতে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন আরব বিশ্বে আঞ্চলিক আরবী তাদের সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে আঞ্চলিক আরবী ভাষা বই পুস্তক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আর কথ্যভাষা হিসেবেও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

যেমন আরব বিশ্বের কেন্দ্রীয় শক্তি বলে পরিচিত সৌদী আরবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও টিভি রেডিওতে আঞ্চলিক কথ্য আরবী নিষিদ্ধ, তেমনি ভাবে মিসরীয় রেডিও টিভি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আঞ্চলিক কথ্য আরবীকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করার ধারা অব্যাহত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীকের যুগে তিনিই শুধু আঞ্চলিক আরবীতে কথা সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেছিলেন তা নয় বরং মিসরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখক যেমন মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, তাইমূর পরিবার, (মুহাম্মদ তাইমূর, মাহমূদ তাইমূর, আয়শা তাইমূর) ইব্‌রাহীম আবদুল কাদির আল-মাযেনী এবং আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, এরা সকলেই তাঁদের কথা সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে ডঃ ত্বাহা হোসাইন আঞ্চলিক আরবী ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। মুহাম্মদ হোসাইন হাইকালের উপন্যাস 'যয়নাব' আল-মাযিনীর "ইব্‌রাহীম আল-কাতিব" এবং আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদের 'সারাহ্' উপন্যাসসমূহে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরব বিশ্ব তখন আঞ্চলিক ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে বিভোর। সাম্রাজ্যবাদ আরব দেশে জাতীয়তাবাদকে ইন্ধন যোগাচ্ছিল।

বর্তমানে মিসর, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবাননসহ কোথায়ও আঞ্চলিক আরবী শব্দে কথা সাহিত্য শুধু নয়, কোন পত্র পত্রিকা বা কোন প্রকাশনাই মুদ্রিত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইনের অবদান যেমন স্মরণীয়, সৌদী আরবের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। বিশুদ্ধ আরবীর প্রচলন আরব ঐক্য এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সংহতিকে জোরদার করতে সহায়ক হচ্ছে।

আঞ্চলিক শব্দ সত্ত্বেও তওফীকের কথা সাহিত্য বিদেশী ভাষায় বিশেষ করে ফরাসী ইংরেজী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হতে তেমন সমস্যা হয়নি, কেননা প্রচলিত অন্যান্য কথা সাহিত্য একই ভাষায় রচিত হয়ে আসছিল। বস্তুত তাওফীকের কথা সাহিত্য অল্প সময়ের মধ্যে এসব ভাষায় অনূদিত হয়। এখানে তিরিশের দশকে রচিত তাওফীকের কথা সাহিত্যের অনূদিত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিলেই এ বিষয়টি বুঝা যাবে।

১। *'শাহারযাদ' (নাটক)* ফরাসী ভাষায় প্যারিস থেকে ১৯৩৬ খৃ. সালে প্রকাশিত। ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। পুনরায় ১৯৪৫ খৃ. সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২। *আওদাত আল-রূহ (উপন্যাস)* রুশ ভাষায় ১৯৩৫ খৃ. সালে লেলিন গ্রাড থেকে প্রকাশিত হয়। ফরাসী ভাষায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ. সালে। লন্ডন থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খৃ. সালে।

৩। *'ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ' (উপন্যাস)* ফরাসী ভাষায় ১৯৩৭ খৃ. সালে এবং ইংরেজীতে লন্ডন থেকে ১৯৪৭ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। স্প্যানিশ ভাষায় মাদ্রিদ থেকে এবং হিব্রো ভাষায় ১৯৪৮ খৃ. ও ১৯৪৫ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়।

৪। *'আহল আল্-কাহাফ' (নাটক)* ফরাসী ভাষায় ১৯৪০ খৃ. সালে এবং ইতালী ভাষায় রোম থেকে ১৮৪৫ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়।

৫। *'উসফুর মিন্ আল-শারক' (উপন্যাস)* ১৯৪১ খৃ. সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এসব ছাড়াও বিভিন্ন নাটক ও ছোট গল্প এসময় বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়।

তিনি সরকারী চাকুরিকালীন নিয়মিত পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে গল্প ও নাটিকা লিখতেন। 'আহ্দ আল-শয়তান' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন, যে গল্পগুলো ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তেমনিভাবে 'মাসরাহ্ আল-মুজতামা' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের সংকলন প্রকাশ করেন[৩৩]। এসব গল্প ও নাটক অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়।

১৯৩৬ খৃ. সালে তওফীক আল-হাকীম রচনা করেন পৃথিবীতে সাড়া জাগানো নাটক 'মুহাম্মদ'। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জীবনী ভিত্তিক নাটক। নাটিকাটি এখনও পর্যন্ত কোথায়ও মঞ্চস্থ হয়নি। একবার আমেরিকায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু গোটা পৃথিবীর মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ উঠে। মিসরে নাটিকাটি চলচ্চিত্রে দেয়ার প্রচেষ্টাও প্রতিবাদের মুখে ব্যর্থ হয়। রাসুল (সঃ) এর জীবনী নিয়ে নাটক রচনা এই

---

৩৩. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম। এক্ষেত্রে তওফীক আল-হাকীম যেমন সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তেমনিভাবে সফলকামও হয়েছেন। এই নাটক রচনায় তিনি শুধুমাত্র নাটকের শিল্পরূপ দিয়েছেন। অন্য দিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা ধারা দিয়েই তিনি নাটক রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। এ বিষয়ে কেউ কোন আপত্তি তুলেনি। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল যখন মহানবী (সঃ) এর চরিত্রে অভিনয় করার প্রসঙ্গ আসল তখন। মিসর সরকারের সেন্সর বোর্ড আপত্তি জানায়, তাই এ নাটক লিখিত রূপ থেকে আর কোন দৃশ্যে আসেনি। মহানবী (সঃ) সৃষ্টির সেরা জীব। তাঁর সমকক্ষ কোন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না। কাজেই এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ভূমিকায় কাউকে অভিনয় করা মুসলিম সমাজের কাছে ঘোর আপত্তিকর শুধু নয়, রীতিমত ধৃষ্টতা ও পাপ বলে স্বীকৃত।

তবে এ নাটক প্রকাশিত হওয়ার পরে ধর্মীয় রক্ষণশীল মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল। আসলে তাদের আপত্তির মূল কারণ ছিল যেহেতু এটি নাটক, তা-ও আবার তওফীক আল-হাকীমের দক্ষ হাতের নাটক। অতএব, অচিরেই সিনেমা কোম্পানী অথবা নাট্য গোষ্ঠী এ নাটক নিয়ে ব্যবসার ফন্দী করবে এবং মঞ্চে বা সুটিংয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। বস্তুতঃ এ অনুমান সঠিকই হয়েছিল।

এ বিতর্কের সময় তওফীক আল-হাকীম তাঁর নাটক লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন যে, আধুনিক যুগে নাটক একটি আকর্ষণীয় সাহিত্যশিল্প হিসেবে পরিচিত। কোন কাহিনী বা বিষয়কে সংলাপের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও সহজ করে উপস্থাপনই নাটকের উদ্দেশ্য। এ পেক্ষাপটেই মুহাম্মদ (সঃ) নাটক রচিত হয়েছে। কোন নাটক লেখা হলে তা মঞ্চস্থ হতে হবে অথবা চলচ্চিত্ররূপ দিতে হবে নাটকের জন্য এটি জরুরী বিষয় নয়। খ্রীষ্টান জগতে যীশুখৃষ্ট এবং তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে রচিত নাটক তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত ও শাণিত করার কাজে ব্যবহার করা হয় অতএব, মহানবী (সঃ)-এর জীবনী ভিত্তিক নাটকও মহানবীর জীবনী প্রচারে এবং তাঁর মহান চরিত্র ও আদর্শ সমাজের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও অনুপমভাবে উপস্থাপনায় সহায়ক হবে। এভাবে তিনি এ বিষয়ের বিতর্কের সম্মানজনক সমাপ্তি টানতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন কথা সাহিত্যিক খাদীজা আখতার রেজায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীম আধুনিক আরবী সাহিত্যে ছোটগল্প উপন্যাস ও এক সময় একমাত্র নাট্যকার হিসেবে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সংগীত সহ তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করলেও মৌলিকভাবে তাঁকে উপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসেবে আধুনিক আরবী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত করা হয়।

তাঁর রচনাশৈলী বিষয়বস্তু ও শিল্প আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিজের স্থান দখলের কৃতিত্ব দান করেছে। মৌলিকভাবে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা বা সাহিত্য থেকে এ প্রেরণা লাভ করেন। "যাহ্‌রাত আল-উমর" গ্রন্থে তিনি এভাবে বলেছেনঃ

فنحن نعيش اليوم فى عصر حضارة غطيمة هى حضارة الأوربية فاى جهل منا بفزع من فزوع هذه الحضارة التخلف والقعود --- ----------

অর্থাৎ আমরা বর্তমানে এক মহান সভ্যতার যুগে আছি, আর তা হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতা। মূর্খতা হেতু এ সভ্যতা থেকে দূরে থাকা মানে হচ্ছে পশ্চাৎগামী ও স্থবিরতা। পৃ. ১৭০।

প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি তার সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইউরোপের উন্নত কথা সাহিত্যের ধারায় তিনি আরবী ভাষা সাহিত্য উন্নত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়ে আরবী কথা সাহিত্য তেমন উন্নত ছিল না। তওফীক সহ সমসাময়িক অন্যান্য আরবী কথা সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়ই নাজীব মাহ্‌ফূজ নোবেল পুরস্কার পেয়ে আরবী কথা সাহিত্যকে উন্নত বিশ্ব সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় সম্মানের আসনে আসীন করতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্ভবত তওফীক আল-হাকীমের অবদানই সবচেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপ থেকে তিনি দেশে ফিরে আরবী সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন[৩৪]। শুধু তাই নয় তিনি প্যারিসে থাকাকালে শুধু মাত্র সাহিত্য বিষয়ক অধ্যয়নই করেননি তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয়ই অধ্যয়ন করেছেন। এব্যপারে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "যাহরাত আল-উমর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সকল জাতীয় সাহিত্যই অধ্যয়ন করেছেন শুধু তাই নয় তাদের জীবন দর্শনও তিনি রপ্ত করেছেন। তাঁর মতে একজন সাহিত্যিককে বিশাল সাগরের ন্যায় জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করতে হবে-তার মধ্যে তিনি কিছু না কিছু উপাদান খুঁজে পাবন। তিনি প্রযুক্তি রসায়ণ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেছেন বলে জানা যায়। তিনি জ্যোর্তিবিদ্যা ও জীব বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বলেন 'আমি নিউটনের সূত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ওয়াসিংটনের চিন্তাধারা ও হেনরী সহ অনেকের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করেছি[৩৫]।

এ জন্যই তার উপন্যাস সহ বিভিন্ন রচনা পাঠ করলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর চরিত্র নির্মাণ করে সমৃদ্ধ সাহিত্য উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসে তিনি ভারতীয় হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে প্রেমের চরিত্রের প্রসঙ্গ টেনে সুন্দর আলোচনা করেছেন। ভারতীয় জীবন দর্শন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ণ না থাকলে তার পক্ষে এটা সম্ভব হতনা। এজন্য সমালোচক ও গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, তওফীক আল-হাকীমের রচনায় বিভিন্ন জীবন দর্শন ও মতবাদ স্থান পেয়েছে অথচ তার প্রসংগ হয়ত ছিল একটি প্রেমের উপন্যাস। 'উসফুর মিন আল-শারক' উপন্যাসেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

একটি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে পাঠককে ভারাক্রান্ত না করে তার কথা সাহিত্য রচনা এটা তওফীক আল-হাকীমে অন্যতম শিল্প কৌশল ও রচনাশৈলী। আরবী কথা সাহিত্যকে উন্নত করার প্রয়াস প্রসংগে ফিরে আসা যাক। তওফীক আল-হাকীম আরবী সাহিত্য নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করার পর ইউরোপীয় কথা সাহিত্য ও ভাষার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনায় তিনি বলেছেনঃ আরবী ভাষা বিভিন্ন বিষয় ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশের ভাষা হিসেবে অসম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে

---

৩৪. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২১৪।
৩৫. তওফীক আল-হাকীম, যাহ্‌রাত আল-উমর, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের যুক্তি হলো তরুন ছাত্রদের নিকট হারিরীর মাকামাত এবং 'আবদ আল-হামিদ আল-কাতিব' এক রচিত পত্র সাহিত্য পেশ করা হয়। এ থেকে বুঝা যায় এ যুগের আরবী ভাষা শিল্প সৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ। (অথচ তরুন ছাত্রদের নিকট মাকামাতে হারীরী ও আবদুল হামীদ আল-কাতিব এর পত্র সাহিত্য পেশ করার কোন যুক্তি নেই)। কেননা ছাত্রদের উপযোগী কোন বিকল্প কথা সাহিত্য বর্তমানে আরবী সাহিত্যে নেই। বর্তমানকালে পত্র সাহিত্য ও মাকামাত এ দুটি অচল বস্তুকে কথা সাহিত্যের পোষাক পরিয়ে সব ক্ষেত্রে পেশ করা হচ্ছে। বস্তুতঃ রাসায়েল বা পত্র সাহিত্য এবং মাকামাত প্রকৃতপক্ষে আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ। ইহাতে অর্থ ও বিষয় বস্তু থেকে শব্দের প্রাধান্য বেশী। শুধু তাই নয়, আরবী ভাষায় অলংকার সাহিত্য গণমানুষের বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম নয়[৩৬]।

তওফীক আল-হাকীম এ সমালোচনা করে বসে থাকেননি বরং তিনি ভাষা সাহিত্যের এ নাজুক অবস্থা থেকে আরবী সাহিত্যকে উত্তরণের জন্য তাঁর সাহিত্য সাধনাকে উৎসর্গ করেন এবং বর্তমানে আরবী সাহিত্য এ নাজুক অবস্থানে নেই । এ জন্য সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তওফীক আল-হাকীম শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ কথা সাহিত্যিক[৩৭]।

বর্তমানে আধুনিক আরবী কথা সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি সহ আধুনিক জীবনের মানুষের সকল অনুভূতির সুন্দর ও সার্থক প্রকাশ করতে সক্ষম। সৌদি আরব, ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আরবী সাহিত্যিকরা অসামান্য অবদান রেখেছেন।

এ ক্ষেত্রে সিরিয়া ও লেবাননের কথা সাহিত্যিকদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তওফীক আল-হাকীম রচনাশৈলীর অন্যতম কৌশল হলো- তিনি ছোট বাক্য ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা করেছেন। শব্দ থেকে অর্থ ও বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একই অর্থের জন্য একাধিক শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর কথা সাহিত্যের শব্দ ব্যবহার ও উপস্থাপনা পদ্ধতি এত সহজ যে, খুব কম শিক্ষিত পাঠকও এই সাহিত্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

---

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।
৩৭. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা ও আবেগের প্রাধান্য থেকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি থেকে তিনি কথা সাহিত্যে চরিত্র নির্মান করেছেন। প্লট ও পরিবেশ হিসেবে তিনি মিসরের গ্রামীণ জীবনকে কথা সাহিত্যের প্রধান চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তওফীক তাঁর দর্শন বিষয়ক রচনা 'আল-তাআদালিয়া' গ্রন্থে তাঁর জীবন ও শিল্পে তার দৃষ্টি ভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি তাঁর মতবাদকে নামকরণ করেছেন 'ভারসাম্য নামে'। এই ভারসাম্য নীতির ব্যাখ্যা করেছেন উক্ত গ্রন্থে। জীব-জন্তু গাছ-পালা, তৃণলতা; পথের শিলা পৃথিবী নামক মাটির বলের সাথে যুক্ত হয়ে ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করে নিজ নিজ অস্তিত্ব নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে অনন্তকালের দিকে[৩৮]। সাহিত্য ও শিল্পকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি বলেছেন 'আল-আদাবু ওয়াল ফান্ন তাফসীরুল ইনসান'[৩৯]।

الادب والفن تفسير الانسان -

তিনি আরও বলেছেন 'আমাকে প্রশ্নকরা হয়- জীবন ও শিল্পে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি?.....

تسألنى ماهو مذهبى فى الحياة والفن؟ وتقول انك
قرأت كل كتى وحرجت منها بعقيدة : هى انها مجموتها
نحاول تفسير الانسان ---

যারা আমার বই পাঠ করবেন, তারা একটা বিষয় উপলব্ধি করবেন সেটি হচ্ছেঃ আমার প্রধান আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয় হচ্ছেঃ মানুষ। স্থান কাল ও পরিবেশ এবং সমাজে মানুষের অস্তিত্ব ও অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আমি মানুষের ব্যাখ্যা করেছি[৪০]।

একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক নিজের স্থান ও কালে দাড়িয়ে মানুষের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সেকস্‌পিয়ার বা আবুল 'আলা তাদের সমকালীন দৃষ্টি ভঙ্গিতেই মানুষকে চিত্রিত করেছেন[৪১]। 'আল-

---

৩৮. তওফীক আল-হাকীম, আল-তাআ'দালিয়া, দার আল-মা'আরিফ,(কায়রো) পৃ. ১২।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তা'আদালিয়া' গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তওফীক আল-হাকীমকে একজন সেরা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বলতে হবে। এখানে তিনি নিউটন এর থিওরীর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনিষীর সূত্র ও থিওরী নিয়ে আলোচনা করেছেন; জীবন দর্শনের ভাল ও মন্দ দিক তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন, লেখকদের শুধুমাত্র কিছু ভাষাজ্ঞান আর প্রকাশ ভঙ্গী আয়ত্বে থাকলেই লেখক হওয়া সাজেনা, বরং তাদেরকে সমসাময়িক সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ কথা তিনি 'যাহরাত আল-উমর' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে তিনি তাঁর ভারসাম্য নীতিমালার ব্যাখ্যাই করেছেন। মানুষের সৃষ্টি কাঠামো মানুষের চিন্তা বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং সমাজ ও পৃথিবীর মধ্যে যে ভারসাম্যের যোগসূত্র রয়েছে তা রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের। মানুষ এ ভারসাম্য ও যোগসূত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। এ ভারসাম্য নষ্ট হলে সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে।

তিনি আরও বলেনঃ আমার চিন্তাধারা আমার বিশ্বাস থেকেও অনেক দূরে চলে যায়, কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসকে ভুলে যাইনি। যেমন-আমার বিশ্বাস হলোঃ এই পৃথিবীতে আমি একা নই। বস্তুতঃ আমি ভারসাম্যপূর্ণ পুরুষ[৪২]।

فالايمان لابرهان عليه من خارجه- إنى أومن بانى لست وحدى --- لانى أشعربذلك --- ولم افقد ايمانى لانى رجل متعادل-

এই ভারসাম্য নীতি মালা তার রচনাবলীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, সমালোচনা, মতাদর্শ বর্ণনা কোন কিছুর চরিত্রেই তিনি বিপ্লবীরূপে অগ্রসর হননি বরং ভারসাম্য রক্ষা করেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন।

উক্ত গ্রন্থের শেষে তিনি ভারসাম্য শব্দকে কি অর্থে বুঝায়েছেন তাও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভারসাম্যকে তুলনামূলক আলোচনা, পারস্পরিক মোকাবেলা অর্থেও বুঝায়েছেন। তাঁর জীবন ও

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের এই নীতি তাকে সাহিত্য জগতে জনপ্রিয় করতে সহায়তা করেছে। রক্ষণশীল সমাজে তিনি তাঁর বন্ধু ডঃ ত্বাহা হোসাইন থেকে কম বিরূপ সমালোচনার শিকার হওয়ার জন্য এটি ছিল একটি হাতিয়ার, বরং তিনি কখনো বিপ্লবী সেজে কথা বলতে চাননি। "উসফুর মিন আল-শারক" বা প্রাচ্যের চড়ুই উপন্যাসে তিনি যখন সমাজতন্ত্রের পক্ষের চিত্র আলোচনা করেন তখন সমাজতন্ত্রের পক্ষের পাঠক মনে করবে তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষের লেখক, আবার অন্য চরিত্রে দেখা যায় তিনি যেন ঘোর সমাজতন্ত্র বিরোধী।

এভাবে কখনো তাকে মনে হবে প্রাচ্যের গোঁড়া সমর্থক আবার কখনো মনে হবে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী। কখনো তাকে মনে হবে ইসলামের বিশিষ্ট মুজাহিদ। আবার কখনো মনে হবে তিনি যেন বস্তুবাদী। এভাবে তিনি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেন, নিজে সিদ্ধান্ত দেন না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি তার রচনায় শিল্পকে হালকা করতে উদ্যোগী হননি বরং শিল্পকে অনুসরণ করেই তিনি তার সাহিত্য কর্ম তা নাটক বা গল্প উপন্যাস হোক রচনা চালিয়ে গেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে তওফীক আল-হাকীম বলেনঃ

'আমরা বর্তমানে এক মহান সভ্যতার যুগে জীবন যাপন করছি আর সেটি হচ্ছে ইউরোপীয় সভাতা। এই সভ্যতার যে কোন শাখার সাথে যে কোন ধরণের মূর্খতা মানেই হচ্ছে পশ্চাদগামীতা ও বন্ধ্যাত্বতা। তিনি আরও বলেছেন ঃ

ان روح الحضارة الاسلامية الحقيقى كان الطموح إلى
الالمام على قدرالامكان بكل الافكاروالمعارف والعلوم
والفنون الشائعة فى الحضارة المعا صرة لها---

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সভ্যতার মূল হচ্ছে যে কোন চিন্তাধারা বিজ্ঞান শিল্প যা আধুনিক সভ্যতায় মিশে আছে সম্ভব সব কিছুকে শামিল করা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের আধুনিক জাগরণের সব কিছু জোরালোভাবে আয়ত্ব করার চেষ্টা করা প্রয়োজন[৪৩]।

ইতিপূর্বেও উল্লেখ্য করা হয়েছে, প্যারিস জীবনে তওফীক আল-হাকীমের বন্ধু আন্দারিয়ার কথা। এ বন্ধু তার সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি আন্দারিয়ার সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। এসব পত্রের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। একসময় এসব পত্রও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাওফীকের সাহিত্য জীবন সম্পর্কে গবেষকদের আলোচনায় এসব পত্র একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক আরবী সাহিত্যের গবেষকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ডঃ শাওকী দায়েফ এবং ডঃ আবদুল মুহসিন ত্বাহা বদর তাদের সমালোচনা সাহিত্যে এসব পত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এক পত্রে তওফীক আল-হাকীম বন্ধু আন্দারিয়াকে লিখেছেনঃ 'মিসরের লোকেরা প্রকৃত সংস্কৃতি কি তা অনেকেই বুঝেনা, মৌলিকভাবে সংস্কৃতি চর্চার লোক মিসরে দু'হাতের আংগুলে গনা যায়[৪৪]। ফরাসী বন্ধু আন্দারিয়া তওফীক আল-হাকীমের সাহিত্য জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি ছিলেন। আন্দারিয়া একজন সাহিত্যিক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। ফরাসী সভ্যতার প্রভাব অনেকটা আন্দারিয়ার মাধ্যমেই তাওফীকের নিকট এসেছে। একইভাবে আন্দারিয়া তাওফীকের অপর বন্ধু ডঃ ত্বাহা হোসাইনেরও বন্ধু ছিলেন। 'ফসুল ফী আল-আদাব ওয়া আল-নকদ' পুস্তকে ত্বাহা হোসাইন বন্ধু আন্দারিয়ার পত্র সংকলন করেছেন। আন্দারিয়া মিসর সফর করেছেন। এই ফরাসী সাহিত্যিক তওফীক আল-হাকীম এবং ত্বাহা হোসাইনের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতেন, তাদের পারম্পরিক বন্ধুত্বের সাথে সাথে তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাকে বেগবান করেছেন। তওফীক আল-হাকীমের পত্র ভিত্তিক সাহিত্য সংস্কৃতির পুস্তক 'যাহ্‌রাত আল-উমর' অর্থাৎ জীবনের ফুলে বেশীর

৪৩. তওফীক আল-হাকীম, যাহ্‌রাত, পৃ. ১৭০।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ পত্র তাদের বন্ধুর কাছে পরস্পর লেখা পত্র দিয়ে সংকলিত হয়েছে। সাহিত্য বিচারে এসব পত্র অতিমূল্যবান সম্পদ।

চাকুরি পেশা থেকে অবসর নিয়ে তওফীক ব্যাপকভাবে তাঁর লিখনী চালিয়ে যান। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি লাগাতার দৈনিক ১০ ঘন্টা করে লিখেছেন[৪৫]। তিনি নাট্য মঞ্চে নাটক পরিচালনাও করেছেন। এমনকি টিভি নাটকেও পরিচালক তথা সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকে প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন।

গ্রীক নাটকের রচনা শৈলী ও শিল্পকে অনুসরণ করে তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক নাটক রচনা করেছেন। প্রাচীন আরব ঐতিহ্য ইসলামী ঐতিহ্যসহ আল-কুরআনের কাহিনী ভিত্তিক নাটকও তিনি রচনা করেছেন। পাঠকের কাছে এসব নাটক সমাদৃত হয়েছে।

সাহিত্য জীবনে তার ব্যক্তিগত বন্ধু ডঃ ত্বাহা হোসাইনের সাথে তিনি যৌথভাবেও অনেক সাহিত্য বা নাটক রচনা করেছেন। ১৯৫০ খৃ. সালে ত্বাহা হোসাইন যখন শিক্ষা মন্ত্রী হন তখন ১৯৫১ খৃ. সালে তিনি তওফীক আল-হাকীমকে মিসরের 'দার আল-কিতাব' এর পরিচালক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৭ খৃ. সালে তিনি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনেস্কোতে যোগদান করে প্যারিস গমন করেন। তিনি সুনামের সাথে আন্তর্জাতিক এই সংস্থায় শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৬৪ খৃ. সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৯৫৬ খৃ. সালে জাতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশে ফিরে আবার তিনি মনোনীত এই সংস্থায় তাঁর মূল্যবান অবদান অব্যাহত রাখেন।

সাথে সাথে তার লিখনীর কাজও বিরতিহীন ভাবে চলে। তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ভাবে লিখেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিরতিহীনভাবে লেখার ফলে আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিনি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশ বিদেশে তিনি

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নভাবে স্বীকৃত ও খেতাবে ভূষিত হন। তিনি জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ পুরস্কারও প্রাপ্ত হন। তওফীক আল-হাকীমের নামে মিসরে একটি নাট্য সংস্থাও গড়ে উঠেছে[৪৬]।

রুচিশীল সুপুরুষ তওফীক আল-হাকীম হাসি খুশি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মাথায় তিনি আভিজ্যত্যের চিহ্নস্বরূপ তুর্কী টুপি পরিধান করতেন। সুঠাম দেহের অধিকারী তওফীক আল-হাকীমকে দেখলে সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে ভুল হতো, এমনকি তার বৃদ্ধ বয়সের ছবিতেও তার ব্যক্তিত্বের জৌলুস ফুটে উঠে। কথা সাহিত্যের সকল শাখায় সফল পদচারণার মাধ্যমে সমসাময়িক আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের তিনি সফল নায়ক।

কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিক সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। আধিক্যের বিচারে নয় সাহিত্য- মানেও তাঁর রচনাবলী শীর্ষস্থানীয়। তাঁর কোন কোন নাটক ও উপন্যাস কয়েক বছরে বিশ সংস্করণেরও বেশী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য শিল্প কতটুকু জ্ঞানগর্ব এবং আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল 'ফান্ন আল- আদব' বা 'সাহিত্য শিল্প' নামক তাঁর গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে কিছুটা অনুমান করা যায়।

শিক্ষা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাঁর কথা সাহিত্য। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় তাঁর কথা সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। এমন কি বাংলা সাহিত্যেও তওফীক আল-হাকীমের সাহিত্যের তরঙ্গ এসে আঘাত করেছে। ইতিমধ্যে তার দুটি নাটক বাংলা একাডেমী ও মুক্তধারা প্রকাশ করেছে[৪৭]। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী সীরাত নাটক 'মুহাম্মদ' বাংলায় ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছে, আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, ১৯৯৭ খৃ.। তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি নাটক অনূদিত হয়ে বাংলাদেশে মঞ্চস্থও হয়েছে। সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর আজীবনের সাধনা। তিনি রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তার সমসাময়িক সাহিত্যিক ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ইব্রাহীম আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী, মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, এরা সাহিত্যের সাথে সাথে রাজনীতি চর্চাও করেছেন, রাজনীতি

---

৪৬. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, বাংলা একাডেমী,(ঢাকা), ১৯৯৪ খৃ. পৃ. ৯৮।
৪৭. তওফীক আল-হাকীম, সুলতান আল-হাইর, অনুঃ আবদুস সাত্তার, সম্রাটের দ্বন্দ্ব, মুক্তধারা,(ঢাকা), ১৯৮৭ খৃ.। মসীর সারসার অনুবাদ- আবদুস সাত্তার, তেলাপোকার ভাগ্য,(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক লেখনীও চালিয়েছেন কিন্তু তওফীক বরাবরই রাজনীতি বিষয় থেকে দূরে রয়েছেন[৪৮]। এ কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

দীর্ঘ সত্তর বছরব্যাপী সাহিত্য সংস্কৃতির নিরলস সাধনা করে এই কথা সাহিত্যিক নব্বই বছর বয়সে ১৯৮৭ খৃ. সালে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। আরবী সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

নাট্যকার হিসেবেঃ

382343

আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক তওফীক আল-হাকীম প্রথম জীবনে উপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তিনি নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সকল পরিচয়কে ম্লান করে দিয়ে একসময় তওফীক আল-হাকীম শুধু মিসরে নয় বরং আরববিশ্ব তথা সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হন। আরবী নাটকে তওফীক আল-হাকীম কিংবদন্তীর নায়ক, যুগ শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

নাটক দিয়েই তার সাহিত্য জীবন শুরু হয়। ১৯২২ খৃ. সালের কথা, যখন যুবক তওফীক আল-হাকীম কায়রোতে কলেজের ছাত্র, তখন মুহাম্মদ তাইমূর একদল যুবক নিয়ে নাটক চর্চা করছেন। এদের সংস্পর্শে এসে তওফীক আল-হাকীম নাট্য চর্চায় জাড়িয়ে পড়েন[৪৯]। শাওকী দায়ফ 'আল-আদব আল-মুআসির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সে সময় তওফীক আল-হাকীম তারুণ্যের আবেগে কয়েকটি ছোট নাটক রচনাও করে ফেলেন যদিও এসব নাটকের শিল্পগুণ ও অন্যান্য মান ছিল অসম্পূর্ণ। নাটক গুলো হচ্ছে 'আল-মারয়াত আল-জাদীদা' (আধুনিক নারী), আল-দায়ফ আল-ছাকীল (অনাহুত মেহমান) এবং আলীবাবা[৫০]।

---

৪৮. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ২৪৩।
৪৯. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৯।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিস জীবনে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক লেখাপড়া করেছেন। এমনকি সবসময় বই নিয়ে পাঠরত থাকা অবস্থা নিয়ে ফরাসী সাহিত্যিক বন্ধু ও তাঁর পত্নী তাঁকে বিভিন্ন ভাবে তিরস্কারও করেছে। প্যারিসে তিনি গ্রীক ইতালী ফরাসী ইংরেজী ও রুশ সাহিত্যের উপর ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নাটক রচনায় গ্রীক ও ইতালী নাটকের শিল্প কাঠামোকে আরবী নাটকের জন্য অনুসরণীয় ধরে নাটক রচনা শুরু করেন[৫১]। অন্যান্য দেশের নাটকের প্রভাবও তার উপর ছিল। একসময় তিনি নিজস্ব রচনাশৈলীর সৃষ্টি করেন। আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তওফীক আল-হাকীম। ইতিপূর্বে আরবী নাটকে কেউ এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। আধুনিক আরবী নাটকের সূচনাকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিরিয়াতে ইংরেজ খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতার ফসল হিসেবে কয়েকজন অমুসলিম সিরিয় নাগরিক ইংরেজী ও ফরাসী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আরবী নাটকের যাত্রা শুরু করনে। বৃহত্তর আরব জনগণের নিকট অথবা আরবী সাহিত্যের কাঠামোতে তখনো এই নাটক তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তওফীক আল-হাকীম তার জীবনী গ্রন্থ 'সিজন আল-উমর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নাটক রচনা দিয়েই তার সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। ১৯১৯ খৃ. সালে তিনি প্রথম নাটক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। বৃটিশদেরকে মিসরে অনাহুত মেহমান বা জবর দখলকারী রূপে 'দায়ফ আল-ছাকীলে' চিত্রিত করেন এই নাটক কায়রোতে অভিনীতও হয়েছিল। পারিবারিক পাঠাগারে তিনি প্রাচীন আরবী গল্পের বইয়ে নাটকের সংলাপ খুঁজে পেয়েছিলেন[৫২]। আরবী সাহিত্যে নাটকে ইউরোপীয়দের একমাত্র অবদান বলে তিনি স্বীকার করতেন না বরং তিনি প্রাচীন আরবী সাহিত্য থেকে নাটকের ধারা চলে আসছিল এবং ইউরোপীয় শিল্প বা টেকনিক যোগ হয়ে আরবী নাটকে জাগরণ বা নতুনত্ব পেয়েছে এক্ষেত্রে তিনি কিতাব আল-আগানীসহ অন্যান্য সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন, যা আরবী সাহিত্যের নাটক বলে গণ্য করা যায়[৫৩]।

---

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৫২. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ১৫০।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রথম নাটক রচনার স্মৃতিচারণ করে তিনি তাঁর আত্ম জীবনী যা তাঁর ৬৬ বৎসর বয়সে 'সিজন আল-উমর' নামে রচিত গ্রন্থে বলেছেনঃ 'খুব সম্ভব আমি ১৯১৯ সালের শেষের দিকে আমার বৃটিশ বিরোধী নাটক 'দায়ফ আল- ছাকীল' রচনা করি'[৫৪]। এটি অভিনীত হয়েছিল কিন্তু মুদ্রিত হয়নি।

নাটক দিয়েই তিনি শুরু করেছেন নাটক দিয়েই তিনি শেষ করেছেন। একসময় দেখা গেছে তাঁর বহুসংখ্যক গল্প, নাট্যরূপ পেয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সফল পদচারণা থাকলেও একসময় তিনি অন্যান্য শাখার পরিচিতিকে ম্লান করে দিয়ে আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তওফীক আল-হাকীম বিভিন্ন বিষয়ে সত্তরের অধিক নাটক রচনা করেছেন। এগুলোর মধো কোনটি ক্ষুদ্র বা একাংকিকা জাতীয়। আবার অনেকগুলো পূর্ণ দৈর্ঘ নাটক। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কম্পিউটারে ইন্টারনেটের তথ্য অনুযায়ী তার নাটকের সংখ্যা ৭২টি।

সমাজ, দর্শন, ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস, বিনোদন, রাজনীতি সহ সকল বিষয়ের উপরই তিনি নাটক রচনা করেছেন। তিনি নাটক পরিচালনা করেছেন, অভিনয় করেছেন। তার প্রায় সব নাটকই একাধিকবার হয় মঞ্চস্থ হয়েছে অথবা চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে। টেলিভিশন চালু হওয়ার পর টেলিভিশনের ষ্টুডিও গুলোতেও অভিনীত হয়েছে। এইভাবে তিনি মিসরে একটি নাট্য আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের মধ্যে মুহাম্মদ, শাহারযাদ, আহ্‌ল আল-কাহাফ সুলায়মান আল-হাকীম ও মালেক আল-উদীব উল্লেখযোগ্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াসাল্লাম এর জীবনী ভিত্তিক নাটক মুহাম্মদ লিখে মুসলিম বিশ্বে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। কুরআন ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি সংলাপের মাধ্যমে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে মহানবীর চরিত্রকে তুলে ধরার জন্য এই প্রয়াস

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

পান। নাটকটি কোথায়ও মঞ্চস্থ হয়নি। নাটকটির মঞ্চায়ন ও চলচ্চিত্ররূপ দানের উদ্যোগে মুসলিম রক্ষনশীল চরিত্র নিয়ে অভিনয় করা নিয়েই আপত্তি উঠে।

তওফীক নিজেও বিষয়টি নাকচ করে দেন যে, নাটক লেখলেই তা অভিনীত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বরং সংলাপের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীলভাবে চরিত্র উপস্থাপনাই নাটকের উদ্দেশ্য। যীশুর জীবন ভিত্তিক নাটক যেমন খ্রীষ্টান জগতে জনপ্রিয় হয়ছে মুহাম্মদ নাটকও মহানবী (সঃ) এর জীবনী প্রচারে সহায়ক হবে। তওফীক আল-হাকীমের প্রায় সকল গল্প নাট্যরূপ লাভ করেছে এসব নাটকের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে তার নাটকের সংখ্যা প্রকৃত লিখিত নাটকের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী হয়ে গেছে। বাংলায় মুহাম্মদ নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ খৃ. সালে। নাটকটি সম্পর্কে প্রকাশক বা আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন এর পরিচালক ভূমিকায় বলেছেন, "প্রচলিত পরিভাষায় কোন জীবনী গ্রন্থ নয়- আবার গতানুগতিক পদ্ধতিতে এটি কোনো নাট্যমঞ্চের নাটকও নয়। এটা হচ্ছে মূলত বর্তমানের আংগিকে তৈরী করা এক অনুপম শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মের মুখ্য চরিত্র হচ্ছেন মুহাম্মদ (সঃ) যিনি একজন মানুষ, একজন নবী- সর্বোপরী মানব জাতির এক সর্বোত্তম আদর্শ।

আজ থেকে সত্তর বছর আগে আরব জগতের এক শীর্ষস্থানীয় উপন্যাসিক তওফীকুল হাকীম রসূলের জীবনীকে অভূতপূর্ব শিল্পের তুলিতে এঁকে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অনবদ্য সৃষ্টির উপর ভিত্তি করেই হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক মোস্তফা আক্কাদ তৈরী করলেন ইতিহাস ভিত্তিক সেরা ছবি- 'ম্যাসেজ'। যারা ম্যাসেজ ছবিটি দেখেছেন, তারা অবশ্যই এর কাহিনীকারদের তালিকায় তওফীকুল হাকীম মিসরীর নাম দেখেছেন। ১৯৪২ খৃ. সালে কলিকাতার দৈনিক হিন্দ পত্রিকার লেখক মালিহ আবাদী এই আরবী বইটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। নতুন আংগিকে নতুন ষ্টাইলে প্রিয় নবীর প্রিয় কাহিনীকে এখানে সাজানো হলেও কোথাও কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনে ইতিহাসকে আহত করা হয়নি-প্রতিটি কথাই নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশ্বস্ত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এটি একদিকে যেমন শিল্পকর্ম, তেমনি এটি একটি বিশ্বস্ত সিরাত গ্রন্থ বটে.....।

Dhaka University Institutional Repository

এই বইটিকে যদি কেউ কখনো মঞ্চস্থ করতে চান, তাহলে এ পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি তাকে পূর্নাংগ সম্মান দেখাতে হবে- যেমন আল্লাহর নবীর ভূমিকায় কোন মানুষের অভিনয় না করা, যথাসম্ভব খোলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকাকে পরিহার করা। ম্যাসেজ ছবির পরিচালক একটি দিক-নির্দেশনা নিয়ে তার উপর ভিত্তি করেই তার যুগান্তকারী ছবিটি বানিয়েছেন।"

..... মুনির উদ্দীন আহমদ
আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন।
ওয়্যারলেস রেল গেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

নাটকটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ৩৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০টি দৃশ্য, তৃতীয় অধ্যায়ে ২৩টি দৃশ্য, এবং শেষ অধ্যায়ে ৮টি দৃশ্য দিয়ে নাটকটি সাজানো হয়েছে। বাংলায় নাটকটি অনুবাদ করেছেন কথা সাহিত্যিক খাদিজা আখতার রেজায়ী (১৯৯৭ খৃ.)।

তওফীক আল-হাকীম নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক চরিত্রকে মনোনীত করেছেন তেমনিভাবে আধুনিক ইউরোপের বিষয় নিয়েও নাটক রচনা করেছেন রচনাশৈলীও শিল্প সাহিত্য হিসেবে ইউরোপীয় কৌশলকে গ্রহণ করলেও তিনি কখনো আরবী ঐতিহ্য থেকে দূরে অবস্থান করাকে সমীচীন মনে করেননি। আত্মজীবনী 'সিজন আল-উমরে' তিনি বলেছেন- মহাযুদ্ধের পর সাহিত্য চিন্তার জগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় আমার সৌভাগ্য হোক আর দুর্ভাগ্য হোক আমি এই সংঘাতের মাঝামাঝি অবস্থান করছি[৫৫]। মিসরীয় সমাজে তার নাটক এতটা জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে তার উপস্থাপনা ও রচনাশৈলীর সাথে সাথে বিষয়বস্তু ও বাস্তবতার কাছাকাছি অবস্থানই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তুলনামূলক ও ভারসাম্য নীতিমালার অনুসরণে তিনি সব সময়ই মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। সীমা অতিক্রম অথবা অতি উৎসাহী হয়ে, বিপ্লবী হয়ে প্লট নির্বাচন করেননি। তাই সব

---

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহলে তার নাটকের তথা কথা সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মিসরে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র, সামরিক শাসনের যুগেও তিনি তার নাট্য চর্চা তথা সাহিত্য সাধনা অব্যাহত রেখেছেন।

রাজা বা স্বৈরাচারের কোপানল থেকে সাহিত্যকে তিনি বরাবরই নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এই রূপক নীতিমালা বা রূপক চরিত্রে নাটক রচনার মাধ্যমে। যখন ত্বাহা হোসাইনের মত বিরল ব্যক্তিত্বের মত লেখক কলম তুলে নিয়েছিলেন তখনো তিনি নাটক লিখে চলেছেন। শাসকের সমালোচনা করেছেন জনগনের পক্ষে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। যেমন 'মসীর সারসার' নাটকে তিনি শাসক বা রাজাকে বলেছেন 'তেলাপোকা' আর মন্ত্রী আমলাকে চিত্রিত করেছেন স্বজাতীয় তেলাপোকা, সমাজের সদস্য জনগণের চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে পিঁপড়া হিসেবে সাধারণ মানুষকে বুঝায়েছেন।

রাজা জনসাধারণের মতামত ও নির্বাচন ছাড়াই নিজে ঘোষণা নিয়ে রাজা হয়েছেন একজন রানীও আছেন বিভিন্ন মন্ত্রীও আছেন। কিন্তু পিঁপড়ার ঐক্যবদ্ধ সমাজের শক্তিকে তেলাপোকারা সবসময় আশংকার বিষয় হিসেবে দেখে। গোঁফ ও দেহ যত বড়ই হউক না কেন একবার চিৎ হয়ে পড়লে বিরাট তেলাপোকা আর দাড়াতে পারেনা, ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দল আক্রমন করে যমের দেশে পৌছে দিয়ে শান্ত হয়না বরং ফুর্তি করে নিজেদের খাদ্য হিসেবে ভক্ষন করে গান গেয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠে।

এভাবে তিনি জনসাধারণকে স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের পথে সাহস দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। শাসক যিনি জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে শাসন কার্য পরিচালনা করেন তাকে যতটা শক্তিশালী মনে হয় বস্তুত তা নয়, বরং জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে এই রাজশক্তি ধুলিস্যাৎ হয়ে যেতে বাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকটি 'তেলাপোকার ভাগ্য' নামে কবি আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত হয়ে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'মসীর সারসার' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে (অনুবাদ)।

রাজা-আবার পিঁপীলিকার অত্যাচার

রানী- এবার দেখেছো? পিঁপীলিকা পিঁপীলিকা

মন্ত্রী- জ্বি, ধর্মাবতার; একমাত্র পিঁপীলিকাই.....

রাজা- আহ্, পিঁপীলিকার কি উৎপাত? বলুন কি হয়েছে?

মন্ত্রী- অহরহ যা ঘটছে।

রাজাঃ খুলে বলুন।

মন্ত্রীঃ আমার ছেলে দেয়ালে আনন্দে ঘোরাফেরা করছিল ওর বয়সের ছেলেপেলেরা সচরাচর যা করে থাকে -আর আপনি তো আমার ছেলে সম্পর্কে জানেনই- কেমন ভদ্র, নম্র এবং.....

রাজা- বলুন না কি হয়েছে?

মন্ত্রী- দেয়াল থেকে তার পা পিছলে যায় এবং মাটিতে পড়ে। অবশ্যি চিৎ হয়ে পড়েছিল এবং হাজার চেষ্টা করেও সোজা হতে পারেনি। যেইনা এই অবস্থা অমনি হাজার হাজার পিঁপীলিকার সৈন্য সামন্ত তাকে আক্রমন করে এবং তাকে হাইজ্যাক করে তাদের সেনা নিবাসে নিয়ে যায়।

রাজা- এ তো বিপদের কথা। সত্যি মহাবিপদ[৫৬]।.....

'সুলায়মান আল-হাকীম' নাটকে তিনি নবী সুলায়মান (আঃ) এর কাহিনীকে নাটকে রূপদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্নিত কাহিনীর ভিত্তিতে তিনি আধুনিক ষ্টাইলে উপস্থাপিত কাহিনীকে নতুন স্বাদে পেশ করেছেন। তবে মূল কাহিনীকে বিকৃত করেননি, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

---

৫৬. তওফীক আল-হাকীম, মাসীর সারসার, অনুবাদ- আবদুস সাত্তার, তেলাপোকার ভাগ্য, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আহল আল-কাহাফ' নাটকে তিনি কুরআনে বর্নিত গুহা বাসীর কাহিনী অবলম্বনে মানুষ ও কালের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিরল কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। তেমনিভাবে 'শাহারযাদ' নাটকে মানুষ ও স্থানের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছেন। যে কথা তওফীক আল-হাকীম তা'আদালিয়া গ্রন্থে নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন।

'সুলতান আল- হাইর' নাটকে তিনি রূপক চরিত্র নিয়ে রাজা বা শাসকদের বৈধতা ও যোগ্যতার প্রশ্ন নিয়ে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। বাংলা ভাষায় সম্রাটের দ্বন্দ্ব নামে মুক্তধারা নাটকটি প্রকাশ করেছে। নাট্যকার হিসেবে তওফীক আল-হাকীমের সমকক্ষ আরবী সাহিত্যে দ্বিতীয়জন নেই। মৌলিকভাবে রচিত নাটক এবং গল্প থেকে নাট্যরূপ, রম্য নাটক ও একাংকিকা সব মিলে তার নাটকের সংখ্যা শতাধিক।

সংক্ষিপ্ত বাক্যে, সহজ সরল বর্ণনায় তিনি নাটক লিখে আরবী কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার প্রায় 'সব কয়টি নাটকই একাধিক বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর বেশীর ভাগ নাটক চলচ্চিত্ররূপ পেয়ে দেশ বিদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরবর্তী জীবনে তিনি নাট্যকার তওফীক আল-হাকীম এই নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। যদিও সাহিত্য সংস্কৃতির সব শাখায়ই তার বিচরণ সব শাখায়ই তাঁর প্রচুর লেখা রয়েছে। সমসাময়িক সকল নাট্যকারের সাথেই তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল[৫৭]।

'মালিক উদীব' নাটকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত। নাট্যকার হিসেবে তওফীক আল-হাকীম এর অবদান বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণা বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন হিসেবে আবশ্যকীয় বলে মনে করা হয়।

---

৫৭. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীমের রচনাবলী ঃ

আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ তওফীক আল-হাকীম প্রায় সত্তর বছর ব্যাপী সাহিত্য রচনা করেছেন, তাই আরবী ভাষায় তিনি বিরাট সাহিত্য ভান্ডার সৃষ্টি করেছেন। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কম্পিউটারের ইন্টারনেটের তথ্য অনুযায়ী তার উপন্যাসের সংখ্যা ৫টি এবং নাটকের সংখ্যা ৭২টি। এছাড়াও তার বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়ে শতাধিক সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। সংক্ষিপ্তভাবে তার রচনাবলীর একটি পরিচিতি বা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ছোট গল্প।

২. উপন্যাস।

৩. নাটক সাহিত্য।

৪. চিন্তাধারামূলক রচনাবলী।

৫. যৌথ সম্পাদনায় রচিত।

৬. অনুবাদ ও বিদেশী ভাষায় রচিত।

৭. জীবনী মূলক।

৮. অন্যান্য।

কায়রোর 'দার-আল-মা'আরিফ' তওফীক আল-হাকীমের সকল রচনা প্রকাশ করেছে। অন্যান্য সংস্থাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

গল্প

১. *আহদ আল-শায়তান (শয়তানের যুগ)* ১৯৪৩ খৃ. সালে তওফীক সরকারী চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিরলসভাবে সাহিত্যে প্রবেশের সময় নিয়মিত পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। পূর্বে অনিয়মিত লিখলেও তিনি এই সময় নিয়মিত লিখেন। শুধু তাই নয় তিনি পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকায় তিনি সাধারণতঃ ছোট গল্প লিখতেন,

Dhaka University Institutional Repository

কখনো ছোট নাটকও লিখেছেন। পত্রিকায় এইসব গল্প সংকলন করে আহ্‌দ আল-শায়তান নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮ খৃ. সালে। এইসব গল্প ও নাটক চলচ্চিত্ররূপেও মঞ্চস্থ হয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

২. *আহল আল-ফান্ন (শিল্পের অনুসারি)* এইটিও একটি গল্প সংকলন।

উল্লেখ্য যে তার অনেক ছোট গল্পই পরবর্তী সময়ে নাটক রূপে অভিনীত হয়েছে যা চলচ্চিত্ররূপে প্রদর্শিত হয়েছে।

উপন্যাস ঃ

১. *আওদাত আল-রূহ (আত্মার প্রত্যাবর্তণ)* পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৬ প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ খৃ.। রচনাকাল ১৯২৭ খৃ., স্থান প্যারিসের গামবাতা। সর্বপ্রথম উপন্যাস এবং সর্ববৃহৎ উপন্যাস। রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃ. সালে লেনিন গ্রাড থেকে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ. সালে প্যারিস থেকে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় ১৯৪২ খৃ. সালে। শৈল্পিক উপন্যাস হিসেবে তাওফীকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ইতিমধ্যে অনেক সংস্করন প্রকাশিত হয়েছে।

২. *ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ (পল্লী গাঁয়ে আইনজীবির ডায়েরী)* ১৯৩৭ খৃ. সালে প্রকাশিত। ফরাসী ভাষায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খৃ.। হিব্রো ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খৃ. সালে। লন্ডন থেকে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খৃ. সালে। মাদ্রিদ থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয় ১৯৪৮ খৃ. সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬।

৩. *উসফূর মিন্ আল-শারক (প্রাচ্যের চড়ুই)* ১৯৩৭ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮। ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খৃ. সালে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. *হিমার আল্-হাকীম (জ্ঞানী গাধা)* ১৯৪০ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৪।

৫. *আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস (পবিত্র সম্পর্ক)* ১৯৪৪ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮২.

নাটকঃ

১. *মুহাম্মদ (সাঃ)* বিশ্বনবী এর জীবনী ভিত্তিক নাটক। ১৯৩৬ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃ. সালে। বাংলায় ১৯৯৭ খৃ. প্রকাশিত।

২. *শাহারযাদ-* ১৯৩৪ খৃ. সালে প্রকাশিত। ১৯৩৬ খৃ. সালে প্যারিস থেকে ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. সালে লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই নাটকের নায়ক শাহরিয়ার। মানুষের পরিবেশ বা অবস্থানের সাথে মানুষের সত্ত্বার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় সেই দর্শন চিত্রিত হয়েছে শাহারযাদ নাটকের নায়কের চরিত্রে।

৩. *আহ্ল আল-কাহাফ (গুহাবাসী)*-১৯৩৩ খৃ. সালে প্রকাশিত। একই সাথে ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ফরাসী অনুবাদ ১৯৪০ খৃ. সালে এবং ইতালী অনুবাদ ১৯৪৫ খৃ. সালে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত গুহাবাসীদের কাহিনী ভিত্তিক চরিত্র নিয়ে রচিত। এই নাটকে মানুষ ও কালের সংঘাতের পরিণতির দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. *সুলায়মান আল-হাকীম*। নবী সুলায়মান (আঃ) এর জীবনী ভিত্তিক নাটক। বিলকীস রানীই এখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ১৯৪৩ খৃ. সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। আল-কুরআনে বর্ণিত নবী সুলায়মান (আঃ) এবং রাজত্ব ও বিলকিসের আগমন সহ আকর্ষনীয় বর্ণনায় সমৃদ্ধ নাটক। ১৯৫০ খৃ. সালে প্যারিস থেকে ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. *তাহ্‌তা শামস্ আল-ফিকর (চিন্তা ও গবেষণা সূর্যের নীচে)* ১৯৩৮ খৃ. সালে প্রকাশিত।

৬. *আশ আব-* ১৯৩৮ খৃ. সালে প্রকাশিত।

৭. *বারাকাসা-আও মুশকিলাত আল-হিকাম (জ্ঞানীর সমস্যা)* ১৯৩৯ খৃ. সালে প্রকাশিত

৮. *রাকিছাত্ আল-মা'বাদ (উপাসনালয়ের নর্তকী)* ১৯৩৯ খৃ. সালে প্রকাশিত।

৯. *সুলতান আল-জাল্লাম (অত্যাচারী রাজা)* ১৯৪১ খৃ. সালে প্রকাশিত।

১০. *মিনাল্ বুরাজ আল-আজি (দুর্গ থেকে),* ১৯৪১ খৃ.।

১১. *তাহ্‌তা আল-মিছবাহ্ আল-আখদার (সবুজ বাতির নীচে)* ১৯৪২ খৃ.।

১২. *বিজামালিউন (গ্রীক নাটক)* ১৯৪২ খৃ.।

১৩. *হিমারি কা-লা লী (আমার গাধা আমাকে বলল)* ১৯৩৮ খৃ.।

১৪. *আল-আইদি আল-না-ইমাহ্ (সম্পদশালী হাত)* ১৯৫৪ খৃ.।

১৫. লুবাত আল-মাউত (মৃত্যুর খেলা) ১৯৫৭ খৃ.।

১৬. *আশ্‌ওয়াক আল-সালাম (শান্তির কাঁটা)* ১৯৫৭ খৃ.।

১৭. *শাজারাত্ আল-হিকাম (জ্ঞানের বৃক্ষ)* ১৯৪৫ খৃ.।

১৮. *আল-মালিক উদীব* ১৯৪৭ খৃ.।

১৯. *আরেনি আল্লাহ (আমাকে আল্লাহ্ দেখাও)* ১৯৫৩ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

২০. *আসা আল-হাকীম (জ্ঞানীর লাঠি)* ১৯৫৪ খৃ.।

২১. *ঈজিস* ১৯৫৫ খৃ.।

২২. *আল-সাফকাহ্* ১৯৫৬ খৃ.।

২৩. *আল-সুলতান আল-হাইর (দ্বিধান্বিত সম্রাট)* ১৯৬০ খৃ.।

মিসরে স্বৈরাচারী সামরিক জান্তার শাসন কালে রচিত রম্য বা ছদ্ম নাটক। সম্রাটের দ্বন্দ্ব নামে বাংলা ভাষায় নাটকটি প্রকাশ করেন মুক্তধারা। অনুবাদ করেছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক আবদুস সাত্তার। রাজা যিনি বংশে দাস, আনুষ্ঠানিক ভাবে তার দাসত্ব মোচনের পূর্বেই তিনি সিংহাসনে আসীন হন। এই নিয়ে গুঞ্জনের প্রেক্ষাপটে দাসত্ব মোচনের প্রক্রিয়াই নাটকের মূল বিষয়। এক সময় রাজার দাসত্ব গুঁচে যায়।

২৪. *ইয়া ত্বালেআ আল-শাজারাহ্ (উদিয়মান বৃক্ষ)* ১৯৬২ খৃ.।

২৫. *আল-ত্বাআম লিকুল্লে ফাম (সকল মুখের জন্য আহার)* ১৯৬৩ খৃ.।

২৬. *শামস আল-নাহার (দিবা সূর্য)* ১৯৬৫ খৃ.।

২৭. *মাসীর সারসার (তেলাপোকার ভাগ্য)* ১৯৬৬ খৃ.।

প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের শাসন আমলে মিসরের লেখকগন স্বাধীনভাবে সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছিল। রূপক ছদ্ম নামের কৌশলে এই সময় তওফীক আল-হাকীম তার সাহিত্য রচনা অব্যাহত রাখেন। স্বৈরাচারের চরিত্র নির্মান করেছেন এই নাটকে তেলাপোকা রাজা চরিত্রে। জনগণ হলো পিঁপড়া, আমলা ও সেনাবাহিনী হলো রাজার স্বজাতি তেলাপোকার দল। রাজা জনগনের দ্বারা নির্বাচিত নন্, বরং স্বঘোষিত। তেলাপোকা একবার চিৎ

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই চার দিক থেকে পিপড়া এসে আক্রমন করে নিয়ে যায় তাদের খাদ্য হিসেবে। এখানে জনগণকে এই বলে উৎসাহিত করা হয়েছে যত বড় স্বৈরাচারী হোক না কেন একবার চিৎ করে ফেলতে পারলে জনমের মত শেষ, গণরোষে বিলীন হয়ে যাবে রাজা। পিঁপড়া নামের জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে দীর্ঘ গোঁফ বিশিষ্ট তেলাপোকার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে এই শিক্ষা নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। তেমনি স্বাধীনতা ও কঠোর অধ্যাবসায় এর প্রতি পাঠকদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে নাটকটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ খৃ. সালে। অনুবাদ করেছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক আবদুস সাত্তার।

২৮. *আল- অরত্বাহ* ১৯৬৬ খৃ.।

২৯. *লাইলাত আল-যুফাফ (বাসর রাত)* ১৯৬৬ খৃ.।

৩০. *মজলিস আল-আদল (ন্যায় বিচারের বৈঠক)* ১৯৭২ খৃ.।

৩১. *আল মাসরাহ আল-মুজতামায় (নাটক সংকলন)* ১৯৫০ খৃ. এই সংকলনে ২১টি নাটক আছে। এইসব নাটক পৃথক ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে।

৩২. *আল-মাসরাহ আল-মুনাওয়া (বিভিন্ন নাটক)* ১৯৫৬ খৃ. এখানেও ২১টি নাটক সংকলিত হয়েছে।

সর্বমোট ৭২টি নাটকের বিবরণ দেয়া হলো। প্রকাশিত হয়নি এমন অনেক নাটকও অভিনীত হয়েছে। খন্ডিত ও ছোট ছোট আরও নাটকের হিসাব যুক্ত করলে এর সংখ্যা শতাধিক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও চিন্তাধারা মূলক তাঁর রচনাবলীঃ

১. *ফান্ন আল-আদাব (সাহিত্য শিল্প)* ১৯৫২ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। ৩২৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে তার সাহিত্য বিষয়ক পান্ডিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২টি অধ্যায়ে তিনি এই বই সাজিয়েছেন। অধ্যায় গুলো হচ্ছেঃ এক. সাহিত্য ও সাহিত্যের শাখা; দুই. আরবী সাহিত্য ও এর আধুনিকতা; তিন. সাহিত্য ও শিল্প; চার. আরবী সাহিত্য ও ধর্ম; পাঁচ. সাহিত্য ও বিজ্ঞান; ছয়. সাহিত্য ও সভ্যতা; সাত. সাহিত্য ও নাটক; আট. সাহিত্য ও সংবাদপত্র; নয়. সাহিত্য, সিনেমা ও রেডিও; দশ. সাহিত্য ও এর সমস্যাবলী; এগার. সাহিত্য ও তার প্রজন্ম; বার. সাহিত্য ও তার চাহিদা। এইভাবে তিনি সাহিত্যের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২. *আল-তা'আদালিয়া (ভারসাম্যঃ জীবন ও শিল্পে আমার দৃষ্টিভঙ্গি)* ১৯৫৫ খৃ. সালে প্রকাশিত। এই পুস্তকে তওফীক জীবন ও জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, আকাশ, যমীন এর মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক এসব তিনি আলোচনা করেছেন। জীবন, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য এর মধ্যে যোগসূত্র কি তাও আলোচনা করেছেন। তিনি তার জীবন ও শিল্প সাহিত্যকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন 'মানুষের ব্যাখ্যা হলো শিল্প সাহিত্য[৫৮]। তা'আদালিয়া বা ভারসাম্য নীতিমালা তার সব রচনায়, সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে আর এই নীতিমালা তিনি পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন[৫৯]।

৩. *রিহ্লাত আল-রবীয়' আল-খারীফ (বসন্তের ভ্রমন)* ১৯৫৭ খৃ.।

৪. *তায়াম্মুলাত আল-সিয়াসিয়াহ্ (রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা)* ১৯৫৪ খৃ.।

৫. *আদালাত ওয়া ফান্ন (ন্যায় বিচার ও শিল্প)* ১৯৫৩ খৃ.।

৬. *কালানা-আল-মাসরাহি (নাট্যকার আমাদেরকে যা বললেন)* ১৯৬৮ খৃ.।

---

৫৮. তওফীক আল-হাকীম, আল-তাআদালিয়া, পৃ. ১৩।
৫৯. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

যৌথ সম্পাদনাঃ

১. *আল-ফিকর ওয়া আল-ফান্ন ফী আদাব ইউসুফ আল-সিবায়ী (শিল্প ও চিন্তাধারা)* ডঃ ত্বাহা হোসাইন সহ।

২. *কাসর আল-মাসহূর, (যাদুর প্রাসাদ)* ১৯৩৬ খৃ., ডঃ ত্বাহা হোসাইন সহ।

অনুবাদ ও বিদেশী ভাষায় রচিতঃ

১. *আমামা শুব্বাক আল-তাযকিরা (স্মৃতির বাতায়নে)* ১৯২৬ খৃ. সালে প্যারিসে ফরাসী ভাষায় নাটকটি রচনা করেন। আরবীতে অনুবাদ হয় ১৯৩৫ খৃ. সালে

২. *আওদাত, আল-রূহ* -বিখ্যাত উপন্যাস, তিনি প্রথমে ১৯২৭ খৃ. সালে প্যারিসে ফরাসী ভাষায় লিখেন।

৩. *আল মালিক উদীব* - গ্রীক গল্প থেকে অনুবাদ করে আরবী নাটক রচনা।

৪. *বিজামালিউন*-গ্রীক থেকে অনুবাদ করে আরবী নাটক রচনা।

তওফীক আল-হাকীমের প্রায় সকল গল্প নাটক ও উপন্যাস একাধিক বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আত্ম জীবনী মূলকঃ

১. *যাহরাত আল-উমর (জীবনের ফুল)* প্যারিসের প্রবাস জীবন সহ যৌবনের স্মৃতিকথা, সাহিত্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ আলোচনা নিয়ে রচিত আত্মজীবনী ১৯৪৩ খৃ. সালে প্রকাশিত। তওফীক আল

Dhaka University Institutional Repository

হাকীমের বয়স ছিল তখন ৪৫ বছর। সাহিত্য গবেষক ও সমালোচকগণ তাওফীকের যৌবনের উপন্যাস ও নাটক নিয়ে আলোচনার সময় যাহ্‌রাত আল উমর এর উপর ভিত্তি করে করে থাকেন। এই জীবনী গ্রন্থে তিনি তার চিন্তাধারা স্বপ্ন কামনা বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ...যাকে তিনি জীবনের ফুল বা যাহরাত আল-উমর বলে আখ্যায়িত করেছেন[৬০]। আত্মীজীবনী হলেও এই বইতে কিছু পত্রাবলীসহ সাহিত্যের অনেক কিছু সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. *সিজন আল-উমর (জীবনের বন্দীশালায়)* ১৯৬৪ খৃ. সালে প্রকাশিত। তাওফীকের বয়স তখন ৬৬ বছর। জন্ম বংশ থেকে শুরু করে বাল্য কাল, যৌবনকাল, আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, বিবাহ, সাহিত্য সাধনা, সমাজ তথা জীবনের সকল বিষয়ই তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ২৭২ পৃষ্ঠায় রচিত তার জীবনীমূলক এই বৃহৎ বই তার সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

তিনি বলেছেন "মানুষ চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন, প্রকৃতিতে মানুষ স্বাধীন নয়। সেই স্বাধীনতার কথা আমি তুলে ধরেছি আমার যাহরাত আল উমর বা জীবনের ফুল বইতে, আর জীবনের প্রকৃতি ও পরিবেশের কঠিন বাস্তবতা আমি তুলে ধরেছি আমার সিজন আল উমর বা জীবনের বন্দী শালায়[৬১]।

৩. *হায়াতী (আমার জীবন)* বইটি সম্ভবত তার বৃদ্ধ বয়সে রচিত।

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন

ত্বাহা হোসাইনের ব্যক্তি জীবন ছিল একটি উত্তম উপন্যাস। একজন শিশু তার সাথীদের সাথে খেলা করছিল। এক সময় সে বুঝতে পারল যে, সে আর কিছুই দেখছে না। খেলার সাথীরা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই কি তুমি কিছু দেখতে পারছ না? বালক উত্তর দিল, তোমরা যা দেখছো আমি তার কিছুই দেখতে পারছি না। খেলার সাথীরা তাঁর জন্য দুঃখ করল। বালক বেড়ে উঠতে লাগল। তার অনুভূতি বিকশিত হতে লাগল। গ্রামের মক্তবে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী এই বালক পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে ফেলল। সেখানে আরো কিছু অধ্যয়ন করলো। উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েক বছর লেখা পড়া করল । কিন্তু এখানকার ধরাবাঁধা নিয়ম আর সেকেলে পদ্ধতির লেখা পড়ায় সে তৃপ্তি পেলনা। সে মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মতামতের পরিবেশ কামনা করল। সমালোচনা করল প্রাচীন এ পদ্ধতির। পুরস্কার স্বরূপ তাকে বহিস্কার করা হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যৌবনে পদার্পন করেছে বালক। এক সময় উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশ ফ্রান্সে পাড়ি জমায়েছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস তখন মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্নপুরী হিসেবে খ্যাত। সেখানে মুক্ত মনে সে জ্ঞান চর্চায় পরিপক্ক হতে লাগল। আর জড়িয়ে পড়ল প্রেম চর্চায়। সে প্রেম ফুলে ফলে সুশোভিত হলো কানায় কানায়; ভরে উঠল প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন। দেশে ফিরে জ্ঞান চর্চার আত্মনিয়োগ করলেন আর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সেকেলে ঘুনে ধরা সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে।

সে এক বিরাট অধ্যায়। এক সময় কারাগারে এই প্রেমিক বিদ্রোহীকে দিন কাটাতে হয়েছে। মুক্ত দুনিয়ায় ফিরে এসে এবার তিনি শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষাকে করলেন সার্বজনীন আর অবৈতনিক। সময় বয়ে যাচ্ছে-বয়স বেড়ে চলেছে এই জ্ঞান তাপস সৈনিকের। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে চুরাশি বছর কখন যে পেরিয়ে আসলেন বাস্তবতার মাঝে, সে হিসাব কখন নেবেন। ততক্ষণে পরপারের ডাক এসেছে, তিনি চলে গেলেন আরেক জগতে। এ ছিল ত্বাহা হোসাইনের জীবন, যা

Dhaka University Institutional Repository

এক চিরন্তন উপন্যাস। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে সার্থকভাবে সামাজিক উপন্যাস রচনা করা। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আল্-আয়্যাম তাই এত জনপ্রিয়। আল্-আয়্যাম-এ তুলে ধরেছেন তৎকালীন মিসরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাইত অনেকে আল-আয়্যামকে । আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস বলে থাকেন। বস্তুতঃ উপন্যাসের অনেক উপাদানই আল- আয়্যামে বর্তমান।

মিসরের সামাজিক চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ত্বাহা হোসাইন তার উপন্যাসে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক, তথা মিসরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস সমূহ পাঠ করে পাঠক এটা ভুলে যায় যে, সে একটি কাহিনী পড়ছে বরং তার মনে হয় সে 'সাহিত্য রসে ভরা ইতিহাস পুস্তক' অধ্যয়ন করছে। আর সেই ইতিহাস বাস্তব সত্যকে নিয়ে রচিত। কোথাও অসামঞ্জস্য সে লক্ষ্য করে না। যেমনঃ আদীব উপন্যাস তিনি তার নিজস্ব বন্ধু বলে আখ্যায়িত আদীবকে কাহিনীর মূল নায়ক করে কাহিনী রচনা করেছেন।[১]

فقد عرفته فى القاهرة قبل ان يذهب الى باريس، ثم ادركته فى باريس بعد ان سبقنى اليها ---

ত্বাহা হোসাইনের সহপাঠী আদীব, অতঃপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। কিভাবে বন্ধুটির সাথে, তার কাহিনীর নায়িকার সাথে পরিচয় হয় তা তিনি তুলে ধরেছেন। আদীব সম্পর্কে লেখকের সবকিছুই জানা ছিল। আদীবের স্ত্রী ও পিতা-মাতার ব্যাপারে ত্বাহা হোসাইন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রায় সকল চরিত্রের সাথেই পরিচয় ছিল। শেষ পরিণতি ও ট্রাজেডির সময়ও লেখক নায়ক-নায়িকার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সবকিছু মিলায়ে পাঠকের মনে হবে একটি সত্য ঘটনাকে উপন্যাসিক শুধুমাত্র তার অলংকারপূর্ণ প্রজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী বাচনভংগির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এখানে বয়স ও ঘটনা পরম্পরায় এমন কোন অসংগতি নেই, যার কারণে পাঠক কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ করতে পারে, কেননা ত্বাহা হোসাইনের বয়স ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কাল, সবকিছু মিলিয়ে এটা যেন একটি

---

১. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, খৃ.), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক উপন্যাস। বস্তুতঃ এটা একজন যোগ্য উপন্যাসিকের রংগিন শিল্পতুলিতে অংকিত সামাজিক চিত্র, একটি সামাজিক উপন্যাস। আদীব ত্বাহা হোসাইনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, উত্তম শিল্প কর্ম।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কি ধরণের সুদূর প্রসারী ফলাফল আনয়ন করে, ত্বাহা হোসাইন তার উপন্যাসে তা তুলে ধরেছেন। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সমাজে নারীরা তাদের সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তাদের নির্যাতনের করুণ কাহিনী প্রকাশ করার মাধ্যমও অনেক সময় থাকেনা। এক্ষেত্রে মিসর তথা আরব সমাজের নারীদের অবস্থা, সমাজে তাদের অবস্থান এবং নারী নির্যাতনের কাহিনী নিয়েই বলতে গেলে মিসরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইন নারী নির্যাতনের বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছেন তার উপন্যাসে, যেমনঃ দোয়া আল-কারাওয়ানের হানাদি চরিত্রের আলোকে তৎকালীন মিসরীয় সমাজ গুণগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের সমাজের থেকে তেমন ভিন্নতর নয়। কেননা এদেশেও দীর্ঘ দিন উপনিবেশ ছিল আর এখনো আর্থিক অস্বচ্ছলতা আছে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে কিন্তু হানাদি চরিত্রের ন্যায় এখানে শত শত হানাদি শহরের বাসা ও গ্রামের বাড়ীতে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হলেও এদেশে ত্বাহা হোসাইনের সমসাময়িক উপন্যাসিকগণ তাদের গল্পের প্লট হিসেবে এই নির্যাতনের কাহিনী অংকন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু ত্বাহা হোসাইন এ ক্ষেত্রে সমাজের নির্যাতিত বহু মহিলা হাহাকারকে তার কলমের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকাও রেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি অনেকটা সফল হয়েছেন তাই ত্বাহা হোসাইন সত্যিকার অর্থে উপন্যাসিক হিসেবে সার্থক ছিলেন। হানাদি এক বেদুইন তরুণী। সমাজ থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে মা যোহরা ও ছোট বোন আমিনাসহ তারা পালিয়ে এসেছে শহরে। বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে দ্বারে দ্বারে, অবশেষে শহরের বাসায় কাজ নিয়েছে। এখানে ধর্ষিতা হয়েছে হানাদি গৃহস্বামী কর্তৃক।

ত্বাহা হোসাইন কাহিনী প্রণয়নে বিশাল কল্পনা থেকে বাস্তবধর্মী ঘটনার প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তার গল্প বা উপন্যাস এতটা জনপ্রিয়। তিনি শুধু নিছক কাহিনীই বলে যেতেন না বরং বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের ফাঁকে ফাঁকে সমাজ দর্শন, ইতিহাস দর্শন ও নৈতিকতাও তুলে ধরেছেন। আল্-ওয়াদ আল-হক্ব গ্রন্থের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ 'ইয়াসির সুমাইয়াকে নিয়ে তার নতুন ঘরে আসল, ওদিকে দীর্ঘ কালের জন্য ইতিহাস তার থেকে আলগা হয়ে পড়ল। ইতিহাসও তার অভ্যাস মত চিরদিনই দীনহীন লোকদের ছেড়ে রাজা-বাদশাহ্, যুগের বড়োসড়ো ব্যক্তির আর সমাজের বাছাই করা নেতাদের সাথে দহরম মহরম করে আসছে। সে যুগের ইতিহাস কৃপণও ছিল যথেষ্ট। আবার অহংকারীও ছিল। তাই সমাজ নেতাদের কেবল গুরুত্বপূর্ণ দু'চার কথা উল্লেখ করেই তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করত। এমনকি কোরাইশদের অল্প কথাই সে স্মরণ রেখেছে। যার দরুন সে যুগের কার্যাবলীর পুরোপুরি জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারিনি। সেতো রোম ও ইরানের রাজদরবারের কীর্তি কলাপ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কোরাইশদের নিকটে আসার সুযোগ তার অল্পই হয়েছে। সে সমাজে দরিদ্রদের কোন মর্যাদা ছিলনা। দেবদেবী পর্যন্ত তাদের উপর নাখোশ ছিল বলে তখনকার দিনের লোকদের বিশ্বাস ছিল। ইতিহাস তার আভিজাত্য ছেড়ে দিয়ে এই দরিদ্রদের দিকে কোনদিন মুখ তুলে তাকাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনি।'[২]

وكان التاريخ فى ذلك الوقت، كماكان فى اكثرالاوقات،
استقراطيا لايحفل الابالسادة ولايلتفت الاالى القادة ---

ইয়াসির (নায়ক) এই দরিদ্র শ্রেণীরই অর্ন্তভূক্ত ছিল। এই জন্যই ইতিহাস তার খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। সেজন্যই তার দীর্ঘ জিন্দেগীর এক বিরাট অংশ ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। যুগের বিবর্তনে এমন এক সময় আসল, ইতিহাস তার আভিজাত্য পরিহার করে এ গরীবদের জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এমনকি ইয়াসিরের মত সাধারণ লোকের সাথেও মিতালী করতে রাজী হলো[৩]।

---

২. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আল-ওয়াদ আল-হক্ব, পৃ. ১৬।

৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

وكان ياسرمن هذه الدهماء، فلم يحفل به التاريخ ولم يلتفت اليه، ولم يصحبه فى حياته الطويلة، ولم يسجل غده على التماس الرزق ---

উপন্যাসে প্রেম, বিরহ, মিলন এসবের উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ত্বাহা হোসাইনের প্রেম কাহিনী অশ্লীলতার দোষে দোষী ছিল না। তিনি প্রেমিক-প্রেমিকাকে মুখোমুখি সংলাপে খুব কমই দাঁড় করিয়েছেন। তাই মিসরীয় মুসলিম সমাজে লেখকের উপন্যাস সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আল-হুব্ব আল-দায়ি গ্রন্থে ত্বাহা হোসাইন প্রেমের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেমের মিলনও দেখিয়েছেন এবং প্রেমের করুণ পরিণতিও দেখিয়েছেন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি অশ্লীলতাকে পরিহার করে চলেছেন। (বাংলা সাহিত্যের অনেক উপন্যাসিক সামাজিক চিত্র অংকনে প্রেমের গল্পে অশ্লীলতা পরিহার করতে সক্ষম হননি।) তাঁর বর্ণনা ছিল শালীন অথচ বিষয় অনুধাবনে স্বচ্ছ। নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র অংকন করতে গিয়ে নারী নির্যাতনের প্রবণতা সৃষ্টি করেননি।

ত্বাহা হোসাইন চরিত্র নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। তবে ভাব আবেগে তিনি কখনো গল্পের করুণ পরিণতি ও ট্রাজেডির সাথে নিজে জড়িয়ে পড়েন নি অথবা জুলুম নিপীড়নের প্রতিবাদে নিজের আকুতি প্রদর্শন করেননি। বরং পাঠকের আবেগ অনুভূতিকে জাগরুক করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিরপেক্ষ থেকে অথবা নেপথ্যে থেকে শুধুমাত্র বর্ণনা করে যাচ্ছেন। পাঠকের নিকট লেখকের উপন্যাস এতটা আপন যে, তারা গল্পের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রচনা করতে কাহিনী রচয়িতার খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। একজন উপন্যাসিক হিসেবে এখানে ত্বাহা হোসাইনের সফলতা ও স্বার্থকতা। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে হতাশার চরিত্র তেমন লক্ষ্য করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন, সব কিছুর উপর সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধের চরিত্র তার উপন্যাস ফুটে উঠেছে। দো'আ আল কারাওয়ান গ্রন্থে হানাদি ধর্ষিতা হওয়ার পর আত্মমর্যাদার কারণে হানাদির মামা তাকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত করে। যোহরা ও আমিনার চরিত্রেও আত্মমর্যাদার প্রাধান্য লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

وكان ياسرمن هذه الدهماء، فلم يحفل به التاريخ ولم يلتفت اليه، ولم يصحبه فى حياته الطويلة، ولم يسجل غده على التماس الرزق ---

উপন্যাসে প্রেম, বিরহ, মিলন এসবের উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ত্বাহা হোসাইনের প্রেম কাহিনী অশ্লীলতার দোষে দোষী ছিল না। তিনি প্রেমিক-প্রেমিকাকে মুখোমুখি সংলাপে খুব কমই দাঁড় করিয়েছেন। তাই মিসরীয় মুসলিম সমাজে লেখকের উপন্যাস সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আল-হুব্ব আল-দারি গ্রন্থে ত্বাহা হোসাইন প্রেমের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেমের মিলনও দেখিয়েছেন এবং প্রেমের করুণ পরিণতিও দেখিয়েছেন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি অশ্লীলতাকে পরিহার করে চলেছেন। (বাংলা সাহিত্যের অনেক উপন্যাসিক সামাজিক চিত্র অংকনে প্রেমের গল্পে অশ্লীলতা পরিহার করতে সক্ষম হননি।) তাঁর বর্ণনা ছিল শালীন অথচ বিষয় অনুধাবনে স্বচ্ছ। নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র অংকন করতে গিয়ে নারী নির্যাতনের প্রবণতা সৃষ্টি করেননি।

ত্বাহা হোসাইন চরিত্র নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। তবে ভাব আবেগে তিনি কখনো গল্পের করুণ পরিণতি ও ট্রাজেডির সাথে নিজে জড়িয়ে পড়েন নি অথবা জুলুম নিপীড়নের প্রতিবাদে নিজের আকুতি প্রদর্শন করেননি। বরং পাঠকের আবেগ অনুভূতিকে জাগরুক করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিরপেক্ষ থেকে অথবা নেপথ্যে থেকে শুধুমাত্র বর্ণনা করে যাচ্ছেন। পাঠকের নিকট লেখকের উপন্যাস এতটা আপন যে, তারা গল্পের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রচনা করতে কাহিনী রচয়িতার খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। একজন উপন্যাসিক হিসেবে এখানে ত্বাহা হোসাইনের সফলতা ও স্বার্থকতা। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে হতাশার চরিত্র তেমন লক্ষ্য করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন, সব কিছুর উপর সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধের চরিত্র তার উপন্যাস ফুটে উঠেছে। দো'আ আল কারাওয়ান গ্রন্থে হানাদি ধর্ষিতা হওয়ার পর আত্মমর্যাদার কারণে হানাদির মামা তাকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত করে। যোহরা ও আমিনার চরিত্রেও আত্মমর্যাদার প্রাধান্য লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের বোঝা বহন করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি সরাসরি পীরের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে পাঠকই সিদ্ধান্ত নেবে এ কুপ্রভাব সম্পর্কে। এই কৌশলের জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তি তাকে আঘাত হানতে পারেনি। তবে কয়েমী স্বার্থবাদী শক্তি তার সমালোচনায় মুখর হয়েছিল অন্য প্রসংগে, তার উপন্যাসের জন্য নয়। অন্য রচনায় তিনি মহলবিশেষের উপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন। বস্তুতঃ সব মহলে এবং সব ধরণের পাঠকের জন্য প্রিয় উপন্যাস রচনায় ত্বাহা হোসাইনের পদ্ধতি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক।

ত্বাহা হোসাইনের সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসিক আবুল মনসুর আহমদ এবং সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, আবু ইছহাক তাদের গল্প ও উপন্যাসে পীর প্রথা ও কবর পূজা সম্পর্কে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' ও 'আসমানী পর্দা' এবং সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'লাল সালু' আবু ইছহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। হুজুর কেবলা গল্পে আবুল মনসুর আহমদের পীর চরিত্রের মুরীদের সদ্য বিবাহীতা সুন্দরী স্ত্রীকে পীরের চতুর্থ স্ত্রীরূপে বিবাহের করুণ পরিণতির চিত্রকে ত্বাহা হোসাইনের পীরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসম বিবাহের করুণ পরিণতির সাথে তুলনা করা যায়। সূর্য দীঘল বাড়ির সামাজিক নির্যাতন ও কুসংস্কারের কাহিনী ত্বাহা হোসাইনের কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্রের সাথেই আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যক্তি চরিত্রের উত্থান-পতন, অনুভূতির পরিবর্তন, মনোবিজ্ঞানের যুক্তি বাস্তবতার নিরিখে ত্বাহা হোসাইন তার উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন। আদীব উপন্যাসে নায়কের পরিবর্তিত চরিত্র এবং তার ফলাফল দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন যুবক কিভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তা বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে দোয়া-আল-কারাওয়ান উপন্যাসের নায়িকার অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন লক্ষণীয়। এটা কোন বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা। আর এটা মিসরীয় সমাজের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না। বস্তুতঃ সাধারণভাবে সকল সমাজের মানুষের অনুভূতি ও নৈতিক মান, উত্থান-পতন, বাস্তবতা সার্থক ভাবে ধরা পড়েছে নীল নদের দেশের সুসাহিত্যিক উপন্যাসিক ত্বাহা হোসাইনের দক্ষ হাতের নিখুঁত শিল্পে। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে যে জীবনবোধ ফুটে উঠেছে, তা বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ত্বাহা হোসাইনের রচনাবলী প্রাঞ্জল, সহজ ও সাবলীল। তার উপন্যাসে আরব জীবনের সামাজিক চিত্র এবং হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা, ট্রাজেডি এবং কমেডি অনুপম ও সার্থক ভাবে চিত্রিত হয়েছে। পাঠকের প্রিয় বই ত্বাহা হোসাইনের কথা সাহিত্য তথা গল্প ও উপন্যাস । তার গ্রন্থের নতুন নতুন সংস্করণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবী গদ্য সহিত্যকে তিনি নিকট অতীতের অবহেলিত অবস্থান থেকে উদ্ধার করে বিশ্ব সাহিত্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করেছেন। তার গল্প ও উপন্যাস সমুহ সমগ্র আরব বিশ্বে সমান ভাবে সমাদৃত। 'আল-মুয়ায্ যাবুনা ফী আল-আরদ' 'পৃথিবীর নির্যাতিতগন' তার ছোট গল্পের গ্রন্থটি মিসরের কৃষকের দুঃখ বঞ্চনার ঘটনা দিয়ে রচিত। সমাজের নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি তার কত দরদ ছিল তা ফুটে উঠেছে এসব রচনায়। বস্তুতঃ ডঃ ত্বাহা হোসাইন ছিলেন মানব দরদী লেখক। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে মানবতার হাহাকারের চিত্রের পাশাপাশি তার সহানুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। জাতি ধর্ম সবকিছুর উপরে তিনি মানবতাকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে তিনি কল্পনা ও আবেগ থেকে বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের আবেদন সাধারণ পাঠকের নিকট এত বেশী।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য অনুসরণ সম্পর্কে ডঃ ত্বাহা হোসাইনের মতবাদ নিয়ে তিনি আরব বিশ্বের মুসলিম মৌলবাদী ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। যদিও তার বৃদ্ধ বয়সের রচনাবলী ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় নিয়ে রচিত। তবুও সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের বুদ্ধিজীবিদের নিকট ত্বাহা হোসাইন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাই এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ত্বাহা হোসাইনের গ্রন্থ অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য আরবদেশসহ মিসরের সাহিত্য জগতে ত্বাহা হোসাইন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তবে তাঁর উপন্যাস সবদেশেই প্রিয় পাঠ্য। মিসরের 'দার আল-মাআরিফ গ্রন্থ সংস্থা' ডঃ ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস সহ সকল রচনাবলী প্রকাশ করে চলেছে। পাকিস্তান ও ভারতে তার উপন্যাস সমূহের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বাংলায় তার একটি মাত্র উপন্যাস আল-ওয়াদ আল-হক্ব অনূদিত হয়েছে। তাঁর সকল উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হলে বাংলা ভাষায় আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধি আসবে। ডঃ ত্বাহা হোসাইনের সাহিত্যকর্মের উপর বাংলা ভাষায় গবেষণার প্রয়োজন অনেক বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস সমুহঃ

ত্বাহা হোসাইন আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের সকল শাখায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপন্যাস সেগুলোর অন্যতম । তিনি প্রায় অর্ধ ডজন উপন্যাস রচনা করেন[২]। তাঁর জীবনী মূলক গ্রন্থ 'আল-আয়্যাম' এবং প্রাচীন কাহিনী নির্ভর পুস্তক 'শাহারযাদ'কে অনেকে উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয় ও শিল্প গুণে রচিত তার উপন্যাস ৫টি। মিসরের দার আল-মাআরিফ হতে প্রকাশিত ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস সমূহ হচ্ছে ঃ

১. আদীব (اديب)
২. শাজারাত আল-বু'স (شجرة البؤس)
৩. আল-হুব্ব আল- দাই (الحب الضائع)
৪. দো'আ আল-কারাওয়ান (دعاء الكروان)
৫. আল-ওয়'াদ আল্-হক্ব (الوعد الحق)

আদীবঃ

কাহিনীর প্রধান নায়ক আদীব ছিল একজন যুবক। সে নিজের প্রচার ও নিজস্ব চিন্তাকে অপরের নিকট ব্যক্ত ও প্রকাশ করার মধ্যে নিজের কৃতিত্ব মনে করত। সে তার সকল অনুভূতি প্রকাশ করে দিত। আর নিজের সকল আবেগ অনুভূতি কাগজে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করত এবং এর মধ্যেই সে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে পেত। নিজের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে সে অকাতরে লোকদের নিকট প্রকাশ করে দিত। বস্তুতঃ আদীব ছিলেন একজন সাহিত্যিক। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আদীবের সাথে ত্বাহা হোসাইনের পরিচয় হয়। সে ছিল লেখকের সহপাঠী। তাদের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয় এবং এক সময় গল্পের নায়ক আদীব লেখকের একান্ত বন্ধুতে পরিণত হয়। আর এ ব্যাপারে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে আদীব। লেখক প্রথমে তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন কেননা ক্লাসে আদীবের কার্যকলাপে ত্বাহা হোসাইন সন্তুষ্ট ছিলেননা। আদীব ছিল একজন কর্কশ ও উচ্চস্বর বিশিষ্ট

---

২. উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া, ১২শ খন্ড, পৃ. ৬০৩।

Dhaka University Institutional Repository

যুবক। সে ছোট আওয়াজে কথা বলতে পারত না। তবে সে ছিল মেধাবী আর সাহিত্যামোদী। লেখকের প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েই লেখকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে। এ ভাবে দিন বয়ে চলছিল। অধ্যয়নের ব্যাপারে তারা পরস্পরের সহযোগী ছিল । আদীব তার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের সবকিছু লেখকের নিকট ব্যক্ত করত। পল্লীতে পিতা মাতার অবস্থান থেকে দূরে শহরে তার প্রবাস জীবন-যাপন তার হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। আর পিতা মাতার হৃদয়কে আরো বেশী মর্মাহত করে তুলেছিল। কেননা সে ছিল পিতামাতর প্রিয় একমাত্র শিক্ষিত ছেলে। নায়কও তার পিতামাতাকে অত্যাধিক ভালবাসত। একান্ত সংলাপে নায়ক লেখকের নিকট সবকিছু নিঃসংকোচে ব্যক্ত করত। পল্লী গাঁয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছেলে হিসাবে তার মধ্যে নিজ পরিবারের প্রতি যেমন ছিল আকর্ষণ তেমনি শহুরে জীবনের আধুনিক প্রগতি তার চিন্তাচেতনা ও জীবন ধারাকে আন্দোলিত করেছিল। তার অনুভূতিতে নতুন হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল।

অনুভূতির এমনি এক পরিবর্তনের সূচনায় একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদেশে (প্যারিসে) বৃত্তি দিয়ে ছাত্র প্রেরনের কথা ঘোষণা করলেন। ছাত্রদের নিকট এ ব্যাপারে আবেদন পত্র আহবান করা হলো। আদীব দরখাস্ত করল এবং প্রাথমিক ভাবে সে নির্বাচিত হলো। সে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছিল আর নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোপিত অন্যতম শর্তছিল, প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আদীবের বিবাহ ইতিপূর্বেই হয়েছিল এক গ্রাম্য যুবতীর সাথে। সে ভাবতে লাগল এখন সে কি করবে? অবশেষে সে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষের নিকট তার বিবাহের কথা গোপন রাখবে এবং অন্যদিকে তার স্ত্রীকে গ্রামে পাঠিয়ে দিবে। সে ভাবল যেহেতু আমি বিদেশে যাচ্ছি আর প্যারিসের স্বাধীন সমাজে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে হয়তবা আর আমাকে মিসরের রক্ষনশীল সমাজের দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। অতএব, আমার এই গ্রাম্য ও মুর্খ স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিৎ। তাই সে স্ত্রীকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল এবং তাকে অনেকদিন বিদেশ থাকতে হবে বলে স্ত্রীকে জানিয়ে দিল। স্ত্রী স্বামীর বিচ্ছেদে অশ্রুপাত করে গ্রামের বাড়ীতে চলে গেল। মুর্খ পাড়া গাঁয়ের এই মহিলা তার স্বামীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলনা। সে বাড়ীতে থেকে স্বামীর দেশে ফেরার অপেক্ষা করে করে অশ্রু বর্ষন করছিল। অতঃপর আদীব তার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যায়ের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। প্যারিসের লোভনীয় বস্তুর আকর্ষন আর স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা ও সহানুভূতি তার মানসিকতাকে দ্বিমুখী করে দিয়েছিল। লেখক তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা তার স্ত্রী ছিল নিরপরাধ, স্বামী প্রেমিক একজন সুন্দরী যুবতী । কিন্তু নায়ক ইউরোপ ভ্রমন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে এ সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। এভাবে সে প্যারিসের পথে মারসেলেসে কিছুদিন অবস্থান করল। এখানে সে এক আধুনিক বিলাসবহুল হোটেলে থাকত এ হোটেলের পরিচারিকার সাথে কয়েক দিনেই ভাব জমে উঠে। সে কামভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। কেননা পাশ্চাত্যোর মহিলাদের রূপ চর্চায় ও সাজ সজ্জায় সে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই পাশ্চাত্যে ভ্রমনের প্রথম পর্বেই সে হারিয়ে যায় এক পরিচারিকার উষ্ণ আলিঙ্গনে।

কিন্তু তার এ উপভোগের পরিনাম ভাল হয়নি। এ আনন্দ খুবই ক্ষণিকের। অতঃপর অনেকটা মোহমুক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে সে প্যারিসে গিয়ে পৌছে। প্যারিসে পৌছে তার জীবন ও চিন্তা চেতনার দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সে নিজের জন্য গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর সে বাড়ীতে তার পিতার উদ্দেশ্যে পত্র লিখে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। কারণ হিসাবে বিদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। স্বামীর পথপানে চেয়ে থাকা একজন সরলা স্বামী প্রেমিক যুবতীর জীবনে নেমে আসে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়, সব রংগীন স্বপ্ন হারিয়ে যায় ধুসর মরুভুমিতে।

সময় বয়ে যাচ্ছে, ক্রমে দেশের সাথে আদীবের যোগাযোগ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এমনকি এক পর্যায়ে তার পরিবারের সাথেও তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, সে কঠোর পরিশ্রম করছে এবং অধ্যয়নে ভাল ফলাফল লাভ করছে। এভাবে কয়েক বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্যারিস বিপদাপন্ন শহরে পরিণত হয়। মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না। তখন সকল বিদেশী প্যারিস ত্যাগ করে বিশেষ করে সকল মিসরীয় নাগরিক প্যারিস ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু আদীব যেহেতু নিজেকে প্যারিসের জীবন ধারার সাথে একাকার করে দিয়েছিল, তাই এই দুর্যোগপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাতেও সে প্যারিসে থাকাকেই ভাল মনে করল। প্যারিসের সৌন্দর্য তাকে সবকিছু থেকে ভুলিয়ে রাখল। বস্তুতঃ কয়েক বছরে আদীব তার মাতৃভুমি অনুন্নত মিসরের সাথে ও তার রক্ষনশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের সাথে তার সম্পর্ক হালকা করে পাশ্চাত্যের সমাজের সাথে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে শত ঝুঁকি সামনে দেখেও সে তার প্রেমিকা এলিনকে ছেড়ে প্যারিস ছাড়তে রাজি নয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার অধ্যাপককে সে সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম ছিল। অধ্যাপকের বাসায় সে প্রায়ই যাতায়াত করত। অধ্যাপকের সাথে সম্পর্কের কারনে তার ছেলে মেয়েদের সাথেও আদীবের ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সে তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। ক্রমে সে এলিনের প্রেমে নিজকে ভারসাম্যহীন করে ফেলে। দীর্ঘ দিনের প্রেম একটি চরম অবস্থায় উপনীত হয়। সে লেখা পড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অধ্যাপক এখন আর তাকে ভালভাবে দেখছেন না। অন্য দিকে মহাযুদ্ধের দাবানলে গোটা ফ্রান্সের জীবন যাত্রা দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়। সব ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় ছিল আত্মপক্ষ ও শত্রুপক্ষ। পত্র পত্রিকার শ্রেষ্ঠ ও আকর্ষনীয় খবর ছিল যুদ্ধের খবর। সারা দেশ গুজবে আর গোয়েন্দায় ভরে যায়। আর এ নিয়ে পত্র- পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়। একবার পত্রিকায় আদীবের এরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয় যে, আদীবের সাথে জার্মানীদের পরিচয় ও যোগাযোগ আছে। এদিকে এলিনও তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। এতে করে আদীব মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এলিনের এই সন্দেহের কথা আদীব লেখককে পত্র মারফত অবহিত করেছিল। এলিন তাকে সন্দেহ করছে এবং মনে করছে আদীব বর্তমানে তার থেকে অধিক ভালবাসছে অধ্যাপক এর মেয়েকে, এলিন বিশ্বাস করছে আদীব তাকে ত্যাগ করে অধ্যাপকের মেয়েকেই প্রেমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় দুর প্রবাসে প্যারিসে আদীবের জীবন হয়ে পড়ল দুর্বিসহ আর ঝুঁকিপূর্ণ, সে ভাবতে লাগল এখন সে কোন পথ বেছে নিবে। সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ল, শুরু হলো হতাশার জীবন।

আজ তার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে মাতৃভুমি মিসরের ছবি। সে দেখতে পায় হামীদার অশ্রুসিক্ত চেহারা আর বৃদ্ধ পিতামাতার করুণ চেহারা। বাল্যস্মৃতি আর পরিবারের অনেক সদস্যে বিচিত্র স্মৃতি তাকে আজ মানসিক যাতনা দিচ্ছে। আজ সে নতুন করে তুলনা করতে শিখেছে মিসরের সাথে প্যারিসের। প্রিয় জন্মভুমি আর হামীদা তাকে হাতছানী দিয়ে ডাকছে, সে আহবান কত করুণ, বেদনা

Dhaka University Institutional Repository

ভারাক্রান্ত। আাদীব আর বেশী ভাবতে পারে না। নিজের ভুল হয়ে গেছে অনেক। কিন্তু এখন কি করবে, ভেবে উঠতে পারছেনা। কেননা এতদিনে পানি অনেক দুর গড়িয়ে গেছে আজ তাকে ভুলের মাসুল দিতে হবে। এখন সম্মুখে ধুসর মরুভুমি, সে বালুর উপর দূর মিসরের ছবি দেখা যায়, কিন্তু সে কি আর সুদুর মিসরের শ্যামল ভুমিতে পৌছতে পারবে? নিয়তি কি তাকে সেই সুযোগ দিবে? কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আদীব। কিন্তু এ জীবনতো আর ছেলে খেলা নয় । জীবনের বাস্তবতা বড়ই নির্মম। অবশেষে আদীব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার তার সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশা ব্যক্ত করল। এমনি ভাবে একজন মেধাবী যুবক আর সাহিত্যিক ছাত্র ও প্রেমিকের করুণ পরিণতি হলো। এক বছর পর্যন্ত লেখক আদীবের কোন খবর পায়নি। অবশেষে একদিন এলিনের পত্র পেল, এলিন লিখেছে ঃ[৩]

سيدى

انت تعرفنى من غير شك فكثيرا ماحدثك عنى صديقك -

- وكثرا ماحدثنى عليك وقد صورك لى دائما على انك

احب اصدقائه اليه واوفاهم له ---

জনাব,

আপনি আমাকে নিশ্চই চিনতে পেরেছেন। আমার সম্পর্কে আপনার বন্ধু আপনার নিকট অনেক কিছু বলেছে। তেমনি ভাবে আপনার সম্পর্কেও সে আমার নিকট অনেক কিছু বলেছে। সে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে আমার নিকট আপনাকে চিত্রায়িত করত। আপনি তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত তার এই লেখা সামগ্রীগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। আমি প্রত্যাশায় দিন গুনছিলাম হয়ত সে আমার নিকট আসবে, কিন্ত যখন ডাক্তার তার সুস্থতার ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করল তখন আমি এগুলো আপনার নিকট প্রেরণ করলাম .....।

দুঃখ ভারাক্রান্ত শুভেচ্ছান্তে ।

---

৩. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

এলিনের পাঠানো প্যাকেটে আদীবের অনেক লেখা ছিল যা সাহিত্য মানে অত্যন্ত উন্নত ছিল। এলিন লেখককে এগুলো সংরক্ষন করার অনুরোধ করেছে।

আদীব ত্বাহা হোসাইনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঃ আদীব উপন্যাসে ত্বাহা হোসাইন একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদ্য শিক্ষিত যুবককে প্রধান ও এক মাত্র নায়ক ধরে তার উপন্যাস রচনা করেছেন। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকের বিকাশ ও পরিবর্তনকে সার্থক ও বাস্তবতার নিরিখে চিত্রায়িত করেছেন আদীব চরিত্রে। নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বজাতির সংস্কৃতির প্রতি দুর্বল অনুরাগী লোকেরা কিভাবে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত হয়ে পরিশেষে "না ঘরকা না ঘাটকা" হয়ে করুণ পরিণতি ভোগ করে লেখক তা তুলে ধরেছেন। নায়কের চরিত্রে। পরিবর্তিত পরিবেশে আবেগ দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তির অবস্থা নায়কের চরিত্রে বর্তমান। এই আবেগ কিভাবে লোকদেরকে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর করে তুলে তা ফুটে উঠেছে নায়কের তার নিরাপরাধ স্ত্রীকে ত্যাগ করা ও পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। নারী প্রেম ও আধুনিক বিলাসী জীবনের জৌলুস কিভাবে নিজ পরিবার ও মাতৃভূমির ভালবাসার উপর প্রাধান্য পায় তাও ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। এমনি ভাবে নারী প্রেমের স্বরূপ ও দর্শন ফুটে উঠেছে এলিন চরিত্রের মধ্যে। জাতীয়তাবাদী চেতনা কিভাবে লোকদের মাঝে প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে তাও লেখক বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরেছেন। প্রেম, বিরহ, ট্রাজেডী, শ্রেণী চরিত্র, জাতীয়তা, সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়েই লেখক তার উপন্যাস আদীব রচনা করেছেন।

নামকরণঃ আদীব উপন্যাসের নায়ক আদীব। যিনি ত্বাহা হোসাইনের বন্ধু। নায়কের চরিত্রকে তিনি আদীব নামে উল্লেখ করলেও বন্ধুর প্রকৃত নাম তিনি উল্লেখ করেননি। বন্ধুর উদ্দেশ্যে তিনি বইটি উৎসর্গ করলেও বন্ধুর নাম তিনি বলেন নিঃ[৪]

اخى العزيز

وددت لوأسميك، ولكنك تعلم لماذا لاأسميك، وحسب اللذين ينظرون فى هذا الكتاب ان يعلموا انك كنت اول المعزين لى حين أخرجنى الجور من الجامعة --- فتقبل منى هذا العمل الضئيل تحية خالصة صادقة لاخائك الصادق الخالص-طه حسين-

৪. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আদীব। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদীব চরিত্র কেন্দ্রীক উপন্যাস হিসেবে এর নাম করণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। ১৯৩৫ খৃ. সালে আদীব উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মিসরীয় সমাজে তখন সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে পশ্চাদপদ সমাজের তরুন প্রজন্ম ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে লোভনীয় বিষয় হিসেবে মনে করতে শুরু করে। আদীব চরিত্রে লেখক দেখায়েছেন কিভাবে নিজ জাতি ও নিজস্ব সংস্কৃতিতে বির্সজন দিয়ে মানুষ প্রত্যারিত হয়, তেমনি ভাবে জাতীয়তাবাদ কিভাবে প্রতিহিংসার অগ্নি মশাল প্রজ্জ্বলিত করে শান্তির সমাজ ভেঙ্গে দেয়। নিম্নে আদীব উপন্যাস থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে- যেখানে আদীবের হতাশার কথা বর্ণিত হয়েছেঃ[৫]

اترى ايها الصديق! انى مغرور مسرف فى العزور اتعزى عن الألم والندم بتزكية نفس، دأكاولا اكره ماقترب من الاثام لانه يشعرنى بانى كريم النفس نبيل الطبع نقى الضمير ---

''বন্ধু! আমি প্রতারিত। সীমা লঙ্ঘন করেছি। আমার দুঃখ ও কষ্ট থেকে তুমি কি আমাকে পবিত্র করবে.....?''

আদীব উপন্যাসে বর্ণনা ধারার প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। সে বর্ণনার বেশীরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পত্র যোগাযোগ। নায়কের চরিত্রে যে বস্তুর বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হলোঃ সাহিত্যিক ও কবিগণ আবেগপ্রবণ হয়ে থাকেন, তাই বাস্তব জীবনে অনেক সময় তাঁরা সফল হতে পারেন না।[৬]

---

৫. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, পৃ. ১২১।

৬. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

حقيقةالامرانه يكتب لانه اديب لايستطيع ان يعيش الااذاكتب، يكتب لانه محتاج الى الكتابة كما يأكل ويشرب ويدخن لانه محتاج الى الطعام والشراب والتدخين ---

১৮৩ পৃষ্ঠার উপন্যাসে ত্বাহা হোসাইন দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করে সংক্ষিপ্তভাবে কাহিনী তুলে ধরেছেন, যা ত্বাহা হোসাইনের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। বিদেশে ভ্রমনকারী যুবকদের জন্য এই উপন্যাসটি একটি গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে বলে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে আদীবের সাথে তওফীক আল-হাকীমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আওদাত আল-রূহ এর তুলনা করা যেতে পারে।

শাজারাত আল-বু'স (দুঃখ বৃক্ষ)ঃ

শাজারাত আল-বুস মিসরের একটি সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক কুসংস্কার কিভাবে একটি পরিবারকে দুঃখ বিষাদে তিলে তিলে শেষ করে দেয় তা ফুটে উঠেছে ত্বাহা হোসাইনের দক্ষ হাতের নিপুণ শিল্প তুলিতে।

আবদুর রহমান এবং আলী দুজন ব্যবসায়ী। তারা পরস্পরের বন্ধু, আর তারা ছিল একই পীরের মুরীদ (ভক্ত)। তাদের উপর ছিল পীরের দারুণ প্রভাব। পীরের নির্দেশকে তারা ভগবানের আশীষ বলেই মনে করত। পীর ভক্তদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের উপর তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর ভক্তরা চরম শ্রদ্ধাভরে তা মেনে চলতে চেষ্টা করত। আর এ ব্যাপারে ভক্তেরা ছিল অন্ধ। এক সময় সুফী নির্দেশ দিল, আলীর ছেলে খালেদের সাথে আবদুর রহমানের কন্যা নাফীছার বিবাহ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে ছেলে মেয়ের অভিভাবক ও পাত্র পাত্রীর মতামতের তেমন তোয়াক্কা করা হয়নি। দুর্ভাগ্য বশতঃ মেয়েটি ছিল জীবন কুৎসিত, কিন্তু পীর সাহেবের নির্দেশ বলে সকলে তা মেনে নিল। তবে খালেদের মা, যিনি একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা, মন্তব্য করলেন "এই বিবাহ পরিবারে একটি দুঃখের বৃক্ষ বপন করবে''।

বাস্তবে পরবর্তী সময়ে খালেদের মায়ের ভবিষ্যৎ বাণীটিই অক্ষরে আক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। পীরের নির্দেশ অনুসারে খালেদের সাথে নাফীছার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিছু দিন পর খালেদের মা মারা যায়। কয়েক মাস পর নাফীছা খালেদের একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে জন্ম দেয়। এই সুন্দর মেয়ের চেহারার প্রতি তাকিয়ে খালেদ উপলব্ধি করল তার স্ত্রী কতইনা কুৎসিত। সে মা ও মেয়ের মধ্যে একটি অসম তুলনা করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে নাফীছার সাথে খালেদের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরের বছর নাফীছা তার নিজের মত একটি কুৎসিত কন্যা প্রসব করল। এবার খালেদের হতাশা এবং নাফীছার প্রতি তার অনীহা আরো বেড়ে গেল এবং তা দাম্পত্য কলহে রূপ নিল। ফলে ক্রমেই নাফীছার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। মানসিকভাবে সে ভেংগে পড়ল। এদিকে পীর সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন যতদিন নাফীছার পিতা আবদুর রহমান বেঁচে থাকবে তার মেয়ে নাফীছা ও নাতনীর ভরন পোষণের দায়িত্ব সে পালন করবে। আর তার সম্পত্তির একটা অংশ খালেদকে দিয়ে দিবে, যা দিয়ে খালেদ নাফীছা ও তার কন্যাদের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করতে পারে। সময় বয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পরিবর্তন হতে লাগল। এক সময় খালেদ ও তার বন্ধু সেলিম এবং এক চাচাত ভাই, তিনজনে সরকারী অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরি পেল। তাদের মাসিক বেতন ছিল চার পাউন্ড। সেলিম যোবায়াদা নাম্নী এক সুন্দরী বুদ্ধিমতী মহিলাকে বিবাহ করেছিল। যোবায়দা খালেদের দুঃখীনি স্ত্রীর প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে । এক বার সে নাফীছাকে ওয়াদা দিল যে, সে পারিনত বয়সে তার ছেলে সালেমের সাথে নাফীছার মেয়ে জুলনারের বিবাহ দিবে।

এভাবে একদিন বৃদ্ধ বয়সে আবদুর রহমান সামান্য অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আর্থসামজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

তার ব্যবসায়ে মন্দাভাব দেখা দেয়। মিসরের ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। দেশী ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগীতায় মার খেয়ে যায়, কেননা বিদেশীরা ব্যবসায়ে আধুনিক টেকনিক ও সাজানো মার্কেট চালু করে, তাতে পুরানো ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারেনি। পক্ষান্তরে আলীর ব্যবসায়ও মন্দা ভাব দেখা দেয়। আর সে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেছিল কয়েকটি, তার মধ্যে কয়েক স্ত্রীকে তালাকও দিয়েছিল। পরিশেষে অধিক ছেলে মেয়ের ভরন পোষনের দায়িত্বে তাকে হিম সিম খেতে হয়। এ দিকে পীর সাহেব খালেদকে নির্দেশ দিল নাফীছার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। কিন্তু খালেদ এখন আর পীর সাহেবের কথা মানতে রাজী নয়। সে পীর সাহেবের কথা অমান্য করে নাফীছার পরিবর্তে এক ধনী ব্যবসায়ীর সুন্দরী কন্যা মুনাকে বিবাহ করল। অতঃপর সে বছর পীর সাহেব মারা যায়। পীরের ছেলে ইবরাহীম তার স্থালাভিসিক্ত হয়, এবং নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিছুদিন নাফীছা ও তার কন্যারা খালেদের বন্ধু সেলিমের বাড়ীতে তার স্ত্রী যোবায়দার তত্ত্বধানে ছিল, কিন্তু ক্রমেই নাফীছার মানসিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং সে ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করতে শুরু করে। তখন সেলিম মনে করল তাকে আর নিয়ন্ত্রন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব সে খালেদের বাড়ীতে তাদেরকে রেখে গেল। স্বামীর বাড়ীতে নাফীছা ও তার কন্যারা প্রবাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করতে লাগল।

যেহেতু দেশে বিদেশী শাসন পাশ্চাত্যের প্রভাব মিসরের ব্যক্তি ও সামাজিক কাঠামোতে ভীষন ভাবে আঘাত হানে এরই ফলশ্রুতিতে খালেদ ইদানিং ইউরোপীয় ধাঁচের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। মিসরীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি তার ক্ষোভ ও অনীহা ক্রমেই বেড়ে চলল। মুনা পক্ষের তার ছেলেকে খালেদ আধুনিক ইউরোপীয় কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে ভর্তি করল। ছোট বয়সেই ছেলের মেধার বিকাশ লক্ষ্য করে খালেদ আনন্দিত হলো, স্কুলে ছেলে ভাল ফলাফল অর্জন করেছিল। কিন্তু খালেদ তার মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিল উদাসীন। সে তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে যোগ্য ছেলের নিকট তাদেরকে পাত্রস্থ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই তার মেয়েরা অশিক্ষিতই থেকে যায়। নাফীছার প্রথম কন্যা সামীহা এক সময় যৌবনে পদার্পন করে। যেহেতু সে সুন্দরী ছিল তাই যৌবনের প্রথমেই ১৫ বছরে তার বিবাহ হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

খালেদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। বিবাহের পর থেকে সে মোটামুটি সুখেই জীবন যাপন করছিল। তবে সন্তানের দিক দিয়ে সে অসুখী ছিল, কেননা তার বেশীর ভাগ সন্তানই ছোট বয়সে মারা যায়। আর জীবিত ছেলেরাও পরিণত বয়সে তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি। এদিকে নাফীছা অত্যন্ত দীন হীন ভাবে বাড়ীতে বসবাস করত। একসময় নাফীছা মারা যায়, সাথে সাথে একটি দুর্বিসহ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জুলনার ছিল নাফীছার দ্বিতীয় কন্যা। আর সে ছিল কুৎসিত। সেলিমের ছেলে সালেমের সাথে তার বিবাহ হওয়ার কথা হয়েছিল নাফীছা ও যোবায়দার মধ্যে। জুলনার বাপের সংসারে কঠোর পরিশ্রম করত তবুও সে সৎমার সন্তুষ্টি পেত না। সৎমার ছেলে মেয়ের সংখ্যা এখন দশ । তার মধ্যে ছয়জন ছেলে চারজন মেয়ে সৎমা তার নিজের সন্তান নিয়েই অধিক চিন্তা করত, জুলনারের ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ ছিলনা। জুলনারের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। জীবনের সুখশান্তির তেমন কোন উপকরণ তার করায়ত্ব ছিলনা। তবুও সে একটি মাত্র প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে ছিল। আর সে দিনে অনাড়ম্বর হলেও একটি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলবে। কঠোর পরিশ্রম করে একটি ছোট সংসার গড়ে তুলবে। কিন্তু তার সে স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবতার মুখ দেখেনি। সময় বয়ে যাচ্ছে আর অতীত হয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। সেলিমের বাড়ীর অবস্থার পরিবর্তন হলো। যুবায়দা মারা গেল। সেলিম ছেলেকে কৃষিকাজ থেকে এনে চামড়ার কাজ শিখাল। কিন্তু সালেম তার পিতার নির্দেশিত জীবনপদ্ধতির সাথে বিদ্রোহ করল এবং খালেদের ছেলেদের শিক্ষায় ইর্ষান্বিত ও প্রভাবিত হলো। সে জুলনারকে বিবাহ না করে মুনার মেয়ে লতীফাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করল। জুলনারের জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে জুলনারের দুঃখে হয়তোবা সৎমা মুনার কিছুটা সহানুভূতি ছিল, কিন্তু এখন সে নিজ কন্যার সুখের কথা ভেবে সব কিছু ম্লান করে আপন স্বার্থের ব্যাপারে তৎপর হলো। সময় অতিবাহিত হচ্ছেঃ এক সময় মুনার জীবনেও পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। এতগুলো ছেলে মেয়ে তাদের নিয়ে তাকে ভীষণ ভাবনায় পড়তে হয়। বৃদ্ধ বয়সে খালেদ মারা যায়। আর আর্থিক দৈন্য আর কয়েকটি মেয়ে নিয়ে মুনা ভীষণ হতাশায় পড়ে যায়। গোটা পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। খালেদের মায়ের

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী পরিবারটি একটি দুঃখের বৃক্ষে পরিনত হয়। খালেদ মারা যাওয়ার পর জুলনার নিঃসংগ দুর্বিসহ জীবন যাপন করে একদিন পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানে এ ধরণের কোন হিংসা ও স্বার্থপরতা নেই। আর মুনার চোখে মুখে দেখাদেয় অন্ধকারের হাতছানী। আজ মুনা ভাবতে শুরু করেছে হয়ত তার দুঃখের জন্য জুলনারের সাথে তার দুর্ব্যবহারই দায়ী। কিন্তু আজ আর করার কিছু নেই। সবকিছু নাগালের বাইরে চলে গেছে। সবকিছু একই সূত্রে গেঁথে এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সেই বৃক্ষের কোন ডাল হয়ত বা কখনো ভেংগেপড়ে কিন্ত গাছ হতাশা বক্ষে নিয়ে মরুপ্রান্তে দাড়িয়ে আছে। দুঃখের বৃক্ষ, পীরের লাগানো এই বৃক্ষ। এ করুণ নির্মম পরিণতির বৃক্ষ 'শাজারাত আল-বুস'।

সামাজিক কুসংস্কার কিভাবে একটি পরিবারে অশান্তির বীজ বপন করে এর উত্তম নিদর্শন ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস শাজারাত আল-বুস। পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকদ্বয়ের মতামত ও পছন্দ অপছন্দে বিবাহ না হয়ে পীরের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে বিবাহের সিদ্ধান্ত কিভাবে একটি করুণ পরিণতি ডেকে আনে, তাই চিত্রায়িত করেছেন লেখক তার প্রখর সমাজ দর্শনের দৃষ্টিতে কুসংস্কারের নির্মম শিকার নাফীছা ও তার কন্যা জুলনার চরিত্রে। কুসংস্কার আর বিলাসিতা কিভাবে একটা পরিবারকে বিনষ্ট করে দেয়, তার উত্তম উদাহরণ আবদুর রহমানের পরিবার। এখানে লেখক মিসরীয় সমাজে পাশ্চাত্যের প্রভাব অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করেছে তা সুন্দর ভাবে বর্ননা করেছেন। এ ধরনের গাছ মিসরে তথা বিশ্বে কত যে আছে তার পরিসংখ্যান কে চালাবে? সে গাছের ফল খেয়ে কতলোক যে পঙ্গু হয়েছে, হারিয়েছে সভ্যতা সংস্কৃতি, পরিণতিতে পিছিয়ে গেছে মুসলিম সমাজ তথা তৃতীয় বিশ্বের সমাজ উন্নয়ন, সে হিসাব কে মিলাবে?

শাজারাত আল-বুস একটি সামাজিক উপন্যাস। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের করুণ চিত্রের সাথে দাম্পত্য জীবনের নির্মম কালো ছবি চিত্রিত হয়েছে অন্ধ উপন্যাসিকের হৃদয়ের আলোর উজ্জ্বল দক্ষ শিল্প নিদের্শনায়। ত্বাহা হোসাইনের অন্যতম শিল্প কৌশল হিসেবে তিনি করুণ চিত্র প্রদর্শন করে পাঠককে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক চাপ প্রয়োগ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ- সমস্যা ও দুঃখের জন্য দায়ী অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থা। ইউরোপীয় সংস্কৃতি এসে কিভাবে একটি মুসলিম দেশের সংস্কৃতিতে আঘাত হানে তা তিনি তুলে ধরেছেন বলিষ্ঠভাবে।

বহু বিবাহ কখন কিভাবে বৈধ তা না জেনে বহু বিবাহ যেমন অকল্যাণকর, আবার বহু বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করাও ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ। উক্ত দু'টি বিষয়ের কোনটির মধ্যে কল্যাণ নিহিত নেই। অধিক সন্তান, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু স্বাস্থ্য এসব বিষয়েও মূর্খতাই প্রধান সমস্যা। বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা কি ছিল তা না জেনে কুসংস্কারের ভিত্তিতে পীরের নির্দেশে এসব বিবাহ ছিল চরম মূর্খতা ও কুসংস্কারে ভরা। এই সমস্যাকে কটিয়ে উঠার জন্য শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণই সমাধান আনবে না তা উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। ত্বাহা হোসাইন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার প্রসার বিস্তীর্ণ করার জন্য এইসব চরিত্রের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে শিল্পে যেমন সফল হয়েছেন বাস্তব জীবনেও তিনি অনেক বিজয়ী হয়েছেন। তৎকালীন মিসরীয় সমাজ ছিল অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত। নারীদের বঞ্চনার কোন সীমা ছিলনা। দুঃখের বৃক্ষ নামকরণের চরিত্র প্রতিটি প্রতিটি অধ্যায়ে দীপ্তমান।

দো'আ আল- কারাওয়ান (কোকিলের ডাক)ঃ

কারাওয়ান ময়না পাখী বা কোকিলের ন্যায় আরবের এক প্রিয় পাখী। আরবী সাহিত্যে কারাওয়ানকে নিয়ে অনেক কবিতা ও গল্প লেখা হয়েছে। সাহিত্যে বহুল আলোচিত পাখী কারাওয়ান। কারাওয়ানের সাথে আলাপ করতে করতে লেখক গল্প শুরু করেছেন। কারাওয়ানের সাথে তার হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক ছিল। এ ভাবেই লেখক মূল কাহিনীতে অগ্রসর হন।

সুয়াদ এখন সুখী জীবন যাপন করছে। সুখী দম্পতি হিসাবে সে স্বামীর ঘরসংসার করছে। অথচ তার অতীত এমন ছিল না। আজকের আনন্দঘন অবস্থায় সে একদিন স্মৃতিচারণ করল তার দ

Dhaka University Institutional Repository

দূর অতীত জীবনের। সে ছিল তখন মরুভুমির বেদুইন বালিকা। তার পিতা ছিল মরুভুমির দুর্ধষ ব্যক্তি। অতঃপর এক সময় তার পিতা মারা যায়। আমিনা নাম্নী এক বোন ও মা পরিবারের এই তিন সদস্য অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। পিতার অপরাধের শাস্তি তাদেরকেও ভোগ করতে হলো। তারা সমাজ থেকে হলো বিতাড়িত ও নিগৃহীত, অতঃপর তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিল। বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ খুঁজে। অতঃপর তারা তিনজন তিন বাসায় ঝি'র কাজ নিল। সৌভাগ্যক্রমে আমিনার চাকুরিটা তুলনামূলক ভাবে ভাল ছিল। সে মা'মুর নামক এক ধনীলোকের বাসায় কাজ পেয়েছিল। মা'মুরের মেয়ে খাদীজার দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল আমিনার, আর খাদীজার লেখাপড়ার বিষয়টাও আমিনা দেখাশুনা করত এবং নিজেও লেখা পড়া শিখতে লাগল। ভাল ভাবেই কিছু দিন কেটে গেল। একদা আমিনার মা এসে তাকে জানালেনঃ তাদেরকে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। শহরের মানূষ ভাল নয়। এখানে তাদের জীবন ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু আমিনা মায়ের কথাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি, কেননা একটা স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ করে একটা অনিশ্চিত অবস্থার দিকে যেতে তার অন্তর মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। অতঃপর যখন প্রকৃত ঘটনা আমিনার নিকট পরিস্কার হলো, তখন সে মায়ের যুক্তি বুঝতে পারল।

মা আরো বলেছেন যে,এখানে তাদের চলে যাওয়ার ঘটনা গোপন রেখেই তাদেরকে শহর ছেড়ে কোন গ্রামে চলে যেতে হবে। আমিনার বোন হানাদী এক ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় কাজ করত। ইঞ্জিনিয়ার ছিল একজন উঠতি বয়সের যুবক। একদিন ইঞ্জিনিয়ার তার বাসায় কর্মরত এই সদ্য যৌবন প্রাপ্তা তরুনী হানাদীকে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। হানাদী তার সতীত্ব হারিয়ে দারুন ভাবে মর্মাহত হয়। সে মায়ের নিকট গিয়ে কেঁদে কেঁদে তার নির্যাতনের কথা ব্যক্ত করে। মা মেয়ের ঘটনা শুনে নিজেও কাঁদলেন এবং মেয়েদেরকে নিয়ে শহর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সবার অজান্তে মা ও দুই মেয়ে রাতের আধারে শহর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে গেল। সেখানে গিয়ে মা তার ভাই নাসীরকে সংবাদ দিয়ে এনে তাকে সব ঘটনা অবহিত করে এবং তাদেরকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। নাসীর তার ভাগ্যহতা বোন ও ভাগিনীদের দুঃখ বেদনার কথা শুনে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়। সে ছিল এক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন যুবক। এই অপমানকে সে স্বাভবিক ভাবে মেনে নিতে পারেন

Dhaka University Institutional Repository

নি। শোকে ও ক্ষোভে নাসীর তাদেরকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে মরুভূমির পথ অতিক্রম করতে শুরু করে।

মরুভূমির মধ্যে এক রাতে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে ধর্ষিতা হানাদীকে হত্যা করবে। তাহলে হানাদী যেমন সারা জীবনের অপমানের গ্লানি থেকে নিস্কৃতি পাবে তেমনি তারাও লোক মুখে প্রচারিত ধর্ষনের কাহিনীর অপমান থেকে খানিকটা রক্ষা পাবে। রাতে সে অত্যন্ত দৃঢ় চিত্তে ছুরিকাহত করে হানাদীকে হত্যা করে। আমিনা ও তার মা হানাদীর জন্য বিলাপ করে রোদন করে, কিন্তু নাসীরের এই ভুমিকাকে তারা তেমন জোরালো প্রতিবাদ বা নিন্দা করেনি। বরং তাদের ক্ষোভে পুঞ্জিভুত হলো সে ধর্ষনকারী ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। কেননা এই অপমান ও হত্যা কান্ডের জন্য পরোক্ষ ভাবে ইঞ্জিনিয়ারই দায়ী। আমিনা তার বোনের এই করুণ মৃত্যুতে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ঘুমের ঘোরে সে বোনের স্মৃতিতে প্রলাপ করত। সারা দিন বোনের অশ্রুসিক্ত চেহারা ও রক্তাক্ত দেহ তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। অতঃপর সিদ্ধান্ত করল, যে করেই হোক ইঞ্জিনিয়ারকে সে হত্যা করবে। তার বোনের ইজ্জত লুন্ঠন ও হত্যার প্রতিশোধ নিবে। তাই একদিন সে গ্রামের বাড়ী থেকে না বলে শহরের পূর্বের বাসায় ফিরে আসল। মা'মুরের বাসার লোকেরা তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে তেমন আপত্তি জানায়নি বরং পুর্বের মতই সে এখানে থাকতে লাগল গোপনে ইঞ্জিনিয়ারের পিছনে গোয়েন্দাগীরি চালাতে লাগল।

সময় বয়ে যাচ্ছে, খাদীজা যৌবনে পদার্পন করেছে। সে ইঞ্জিনিয়ারের সাথে খাদীজার বিবাহের কথাবার্তা চলছিল, আমিনা এ কথা জানতে পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি তার প্রথম প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেল। আমিনা খাদীজার মায়ের নিকট ইঞ্জিনিয়ারের চরিত্র সম্পর্কে ও হানাদীর বিষয়টিকে প্রকাশ করে দিল। এতে করে খাদীজার সাথে ইঞ্জিনিয়ারের বিবাহের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল। এই সফলতায় আমিনা আনন্দিত হলো। কিন্তু আমিনার এই ভুমিকা মা'মুরের সংসারে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করল এবং আমিনাকে কিছুটা বেকায়দায় পড়তে হলো। অতঃপর সে ইঞ্জিনিয়ারের পার্শ্ববর্তী এক বাসায় কাজ নিল এবং ইঞ্জিনিয়ারের পিছনে গোয়েন্দাগীরি অব্যাহত রাখল। আর সে ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। তার পর তার প্রচেষ্টা আরেক ধাপ সফল

Dhaka University Institutional Repository

হলোঃ সে বুদ্ধিমত্তার সাথে এক সময় ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় কাজ নিতে সক্ষম হলো। মনে মনে সে তার উদ্দেশ্য সফল করার কাছাকাছি চলে এসেছে বলে মনে মনে বিশ্বাস করতে লাগল। কিন্তু আমিনা এখন যুবতী। তার জীবনে বিলাসীতা বলতে কিছুই নেই, নেই কোন স্থায়িত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তার জীবনের কোন সম্ভাবনা তার সামনে নেই। তবুও তাকে বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করতে হচ্ছে। আর বোনের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত তাকে মানসিকভাবে ঝুঁকি নিতেও পরিচালিত করছে। কখনো কখনো যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্নে সে হারিয়ে যায়, সেখানে সকল সিদ্ধান্ত ও প্রতিশোধ স্পৃহা ম্লান হয়ে তার যৌবনই বিজয়ী হয়ে উঠে। এমনি এক অবস্থায় সে তার বোনের ইজ্জত হননকারী যুবক ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় কাজ নেয়।

ইঞ্জিনিয়ার আমিনাকে পেয়ে খুশীই হয়, কেননা আমিনাকে দিয়ে তার বাসার কাজ ও জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ উভয়টিই হবে বলে তার বিশ্বাস হলো। আমিনার প্রতি কাজের মেয়ের চেয়ে একটু বেশী সহানুভূতি দেখাল। প্রথম রাতেই ইঞ্জিনিয়ার তাকে কাম উত্তেজনায় প্রলুব্ধ করতে চাইল, কিন্তু সে বুদ্ধিমত্তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু সে ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি খুব বেশী বিরক্তি দেখাল না। কেননা সে এখানেই থাকতে চেয়েছিল তার প্রতিশোধের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্যে, কিন্তু প্রথম রাতেই এ ধরণের অবস্থার জন্য সে মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। সময় বয়ে যেতে লাগল, আমিনার অনুভূতিতে যৌবনের ঢেউ ক্রমেই উথলে উঠতে লাগল। ক্রমে আমিনা পরিবর্তিত হতে লাগল। এখন আর আমিনা প্রতিশোধের প্রতিহিংসায় প্রজ্জলিত বিদ্রোহী বেদুইন মেয়ে নয়। আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারকে মানসিকভাবে গ্রহণ করে নিতে লাগল। ইঞ্জিনিয়ার আর জোর করে নয় বরং লোভ আর সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে লাগল।

একদিন আমিনা যখন শুনতে পেল ইঞ্জিনিয়ার কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তখন সে অশ্রু ফেলে কেঁদে ফেলল। এই প্রথম বার তার নিকট প্রমাণিত হলো যে, সে যৌবনের এই লগ্নে ইঞ্জিনিয়ারকে ভালবেসে ফেলেছে। ইঞ্জিনিয়ার আমিনার অবস্থা বুঝতে পেরে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তাকে কায়রোতে নিয়ে যেতে রাজী হলো। কায়রোতে চলে যাওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ার তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। আমিনা আনন্দ ও শোকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার সকল গোপন

Dhaka University Institutional Repository

রহস্য তাকে খুলে বলল এবং মৌখিকভাবে প্রথমে প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার তাকে রাজী করাতে সক্ষম হলো। বস্তুতঃ আমিনা এ অবস্থার জন্যই দিন গুনছিল। কেননা ইতিমধ্যে যৌবনের জৈবিক চাহিদায় সে ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার তার খাওয়া পরা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে তাই এই দুর্বলতা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। একদিন ধুমধামে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতীতের পরিচয়কে গোপন করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আমিনার নাম নতুন করে রাখে সুয়াদ। সুয়াদ আজ একজন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারের গৃহবধু। তারা সুখের নীড়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করেছে।

আজ সুয়াদ একজন সুখী গৃহিনী বিলাসী মহিলা, অভিজ্ঞ গৃহকর্তী। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মানসপটে উঁকি মারে অতীত জীবনের অনেক স্মৃতি। স্মৃতি চারনে সে চলে যায় বাল্য জীবনের সুদুর মরুভুমিতে। অতঃপর মা ও বোনের সাথে তার সেই দুঃখের কাহিনী। আজ সে ভুলে থাকতে চায় তার অতীত জীবনকে। কেননা সে এখন সুখী সংসারী, সুখী গৃহিনী। দো'আ আল-কারাওয়ানে ত্বাহা হোসাইন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বাস্তবধর্মী একটি সামাজিক চিত্র অংকন করেছেন "কিভাবে তিনজন মহিলা সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়, অথচ এদের তেমন অপরাধ ছিলনা। পিতার লাশের সাথে তারা প্রতিশোধ নিল । দুর্বলের উপর প্রতিশোধ নেওয়া খুব সহজ, কিন্তু সবলের সাথে আপোষ করে চলা এক সামাজিক প্রবনতা। অতঃপর কিভাবে অসহায় মহিলারা সমাজে নির্যাতিত হয়, তা তুলে ধরেছেন লেখক হানাদী চরিত্রে। এমনি ভাবে সমাজে হাজারো হানাদী আর ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে যারা একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার। আর ত্বাহা হোসাইনের আজীবনের সাধনা ছিল এই নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে। মুল নায়িকা আমিনা বা সুয়াদ চরিত্রে তিনি একজন যুবতীর বাস্তব জীবনানুভুতি তুলে ধরেছেন। সমমর্মিতা, ক্ষোভ, শোক আর গোপন প্রতিহিংসা কিভাবে একজন যুবতীকে পরিচালিত করে, অতঃপর যৌবনের চাহিদা কিভাবে একজন যুবতীর অনুভুতি ও নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে তা তিনি সুয়াদ চরিত্রে তুলে ধরেছেন। যুবতীর যৌবনে সবকিছুর ওপর বিজয়ী হয় যৌবন আর প্রেম। সবসময়ই সহানুভুতির পথ ধরে প্রেম অগ্রসর হয়। যৌবনের জৈবিক চাহিদা সহানুভুতির পথ ধরে গভীর প্রেমে মজে সবকিছু বিলীন করে। প্রেম চিরন্তন, প্রেম যৌবনের বিজয় সংগীত গাইবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর এই বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরেছেন লেখক নিজ কল্পনায়

Dhaka University Institutional Repository

আমিনা ওরফে সুয়াদ চরিত্রে। প্রেম ও নারী জীবনের আবেগ ও অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে দোয়া আল-কারাওয়ান উপন্যাসে।

দো'আ আল-কারাওয়ান শুরু করেছেন ত্বাহা হোসাইন কোকিলের কথা দিয়ে, শেষও করেছেন কোকিলের গান দিয়ে। তবে ভূমিকায় খলীল মুতরানের কোকিল প্রংসঙ্গে রচিত একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন ১৬০ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি তিনি তাঁর বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্যিক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন:[৭]

دُعاء هذا الكروان الذى
خلده فى مسمع الدهر
له صدى القلب والفكر من
أشهى متاع القلب والفكر
لكنه مشج بترجيعه
لما جرى فى ذلك الفقير
اذاتسكن البيداء وهنافما
ينبض الامهج السفر

---

৭. ডঃ ত্বাহা হোসাইন,

Dhaka University Institutional Repository

শেষ করেছেন এভাবে :[৮]

ولكن صوتك ايها الطائرالعزيز يبلغنى فينزعنى انتزاعًا
من هذا الصمت العميق ---
دَعاء الكروان! اترينه كان رجع صوته هذا الترجيع حين
صرعت هنادى فى ذلك الفضاالعريض- القاهره

আল-হুব্ব আল- দা'ই' (ব্যর্থ প্রেম)ঃ

এটা ফরাসী সমাজের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি সামাজিক উপন্যাস। একটি ফরাসী পরিবারের সদস্যা 'লাইন', তার কয়েকজন ভাই-বোন রয়েছে। তারা লেখাপড়া ও চাকুরি নিয়ে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে। লাইন তার পিতামাতার সাথেই থাকত। সে ছিল তার পিতা-মাতার একান্ত অনুগত মেয়ে। লাইন যখন যৌবনে পদার্পন করল এবং লেখা পড়াও একটা পর্যায়ে পৌছল। তখন তার অভিভাবক পিতামাতা তার বিবাহের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। একদিন পিতা-মাতা তাকে জানালেন যে, তারা একটি যুবকের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে। লাইন প্রস্তাবটি শুনে হৃদয় দিয়ে পিতা মাতার সাথে একাত্বতা ঘোষনা করে। সে অপরিচিত অনাগত যুবকটির প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা উপলব্ধি করতে লাগল। অথচ সে যুবকটির নামও জানত না-আর এ ব্যাপারে সে পিতামাতাকে অধিক প্রশ্ন করাও সমীচীন মনে করেনি। একবার লাইন তার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। সেখানে মেকজিম নামক এক যুককের সাথে তার পরিচয় হয়। প্রথম দর্শন ও প্রথম পরিচয়েই তার প্রতি লাইনের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে প্রেমিক মেকজিমই ছিল পিতামাতার পছন্দ করা ছেলে, যাকে তারা লাইনের স্বামী করার চিন্তা ভাবনা করছে। তাদের প্রেম সুশোভিত হয়ে একদিন পিতা-মাতার মনোনীত যুবক মেকজিমের সাথেই লাইনের বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল। লাইন ও মেকজিমের এক বান্ধবীর নাম লরেন্স। তার সাথে দুজনের সম্পর্কই ছিল মধুর, আর এই মধুর সম্পর্কই এক সময় প্রেম

৮. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আদীব, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসায় পরিণত হয়। মেকজিমের সাথে লরেন্সের প্রেম চলতে থাকে। প্রথমে লাইন এটা মনে করতে পারেনি। এ দিকে লাইনের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করে, তারা ছেলের নাম রেখেছিল পিয়ারি। আস্তে আস্তে পিয়ারি বাড়তে লাগল। তার হাসিতে ঘর ভরে উঠল। সে এখন হাটতে শিখেছে এবং আধো আধো কথা বলতে শিখেছে।

একদিন পিয়ারি ঘরের মেঝে পাওয়া একটি কাগজ মায়ের হাতে দিল। লাইন সেটা পড়ে দেখতে পেল, মেকজিমের নিকট লেখা লরেন্সের একটি প্রেম পত্র। কিছুদিন পূর্ব থেকেই লাইন এ ধরনের কিছু একটা ধারনা করে আসছিল। আজকে হাতে নাতে তার প্রমান পেল। এই প্রেমকে লাইন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সে তার অনেক দিনের বান্ধবী লরেন্সকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে শুরু করল। মানসিকভাবে সে ভেঙ্গে পড়ল কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না। মেকজিমকে কিছুই বলেনি।

কিছুদিন পর লরেন্স বিদেশে চলে যায়, আর লাইন কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে। লাইন লরেন্সের চিঠিটি মেকজিমের ড্রয়ারে রেখে দেয়। কিছু দিন পর লাইনের সাথে আলাপ হলো যখন সে বুঝলো-মেকজিম বহু বিবাহের পক্ষে তার যুক্তি ও মতামত ব্যক্ত করছে এবং সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পত্র মারফত লাইন জানতে পারল মেকজিমের সাথে লরেন্সের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। বর্তমানে তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে সম্মত হয়েছে। লাইন আরো অবগত হলো যে, শীঘ্রই লরেন্স দেশে ফিরবে এবং তাদের বাসার পাশেই একটি বাসা নিবে, সেখানে তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করবে। লাইন সারা রাত জেগে লরেন্সের লেখা একটি চিঠি পড়ল, যা সে মেকজিমের উদ্দেশ্যে লিখছে। এভাবে সে বিনিদ্র একটি রাত কেটে দিল। সে ছিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা, স্বামীর এই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় বিবাহের বিষয়টি তার আত্ম মর্যাদার পরিপন্থী বলেই সে মনে করতে লাগল। অতঃপর সে লরেন্সকে লিখল যে, সে তার ভালবাসা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। তার এই ব্যাপারে তেমন কোন আপত্তি নেই। বরং লাইন পত্রে তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি কামনা করল। এটি ছিল তার প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া। ভদ্রতার খাতিরেই সে

Dhaka University Institutional Repository

এই রূপ মতামত ব্যক্ত করেছিল। পক্ষান্তরে আত্মমর্যাদা ও প্রতিহিংসায় সে অভ্যন্তরীণভাবে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছিল।

লাইন এবার তার বিবাহপুর্ব তার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসতে চাইল। আগে সে নিয়মিত লেখা পড়া করত ও ব্যক্তিগত ডায়েরী সংরক্ষন করত। আজ তিন বছর হলো সে তার ডায়েরী লিখা ভুলে গিয়েছিল। লাইন তার প্রিয় ছেলে পিয়ারি ও তার প্রেমিক স্বামী মেকজিমকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করতে লাগল, সে পড়া শুনায় মন বসাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে স্মৃতি রাজ্যে কখনো লরেন্সের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে মিলিত হওয়ার স্মরন করত, কখনো মেকজিমের সাথে সুখে কাটানো দিনগুলো স্মৃতিপটে ভেসে উঠত। একদিন সে লরেন্সকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখল। তাতে সে অতীতের আনেক স্মৃতি কথা তুলে ধরল। কিছুদিন পর সংবাদপত্রে একটি সংবাদ ফলাও করে ছাপা হলো যে, দুজন মহিলা একই সময়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। আর সেই মহিলা ছিল লরেন্স এবং লাইন। পাঠক তাদের করুণ পরিণতির জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করল। এটি একটি প্রেমের উপন্যাস। প্রেমের ধর্ম, বিরহের বেদনা, আত্মমর্যাদার যাতনাসহ প্রেমের ও দাম্পত্য জীবনের ট্রাজেডি এ উপন্যাসে সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে।

আল- ওয়া'দ আল-হক্ক (সত্য প্রতিশ্রুতি)ঃ

এটা একটা উপন্যাস[৯]। ঐতিহাসিক চরিত্র নির্ভর এই গ্রন্থটিকে কেউ জীবনী গ্রন্থ বলেও উল্লেখ করেছেন[১০]। ডঃ ত্বাহা হোসাইন কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে গ্রন্থটি শুরু করেছেন।

আয়াতটি হচ্ছে ঃ[১১]

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ
بِيْ شَيْـــًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ৪৭৬।
১০. ডঃ সাইয়েদ হেতেশাম, আধুনিক আরবী সাহিত্য, পৃ. ১১৪।
১১. সূরা নূর, আয়াত ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

(আল্লাহ বলেন) "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সৎকাজ সম্পন্ন করে তাদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা রইলো যে, তিনি তাদেরকে এ বিশ্বে শাসনাধিকারী করবেন, যেমন পূর্ববর্তীদের করেছেন। যে ধর্ম তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, তাকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, ভয়ের পর তাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন। তবে শর্ত হলো এই যে তারা আমার ইবাদত করবে এবং তারা কাউকে আমার সাথে শরিক করবেনা। এবং এবপর যে ব্যক্তি এ নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে হবে ফাসেক ও অবাধ্য''।

ত্বাহা হোসাইন ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস রচনা করেন। সে যুগের মুসলমানদের মর্মান্তিক নির্যাতন ও দুর্যোগ বহুল ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিপীড়িত নির্যাতিত লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, দাসদাসীরা ইসলামের সাম্যের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে আর প্রতিষ্ঠিত বাতিল শক্তি তাদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে। তারা ত্যাগ ও কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, পরিশেষে তাঁরা বিজয়ী হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব তাদের করায়ত্ব হয়েছে। এই বাস্তব সত্য কাহিনীকে সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত করেছেন ত্বাহা হোসাইন আল-ওয়াদ আল-হক্ক বা সত্য প্রতিশ্রুতি গ্রন্থে। ছোট বয়স থেকে শুরু করে একজন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত প্রেম বিরহ, সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ও তৎপরতা, পরিশেষে তার পরিণতি, এ সব কিছু সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী কথায় তিনি তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তৎকালীন সমাজ কাঠামো ও শ্রেণী বিশ্লেষণ করেছেন যোগ্যতার সাথে।

যাদের নিয়ে লেখক তার উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ ইয়াসির, সুমাইয়্যা, আম্মার, সোহায়েব, বিলাল, ইবন রাবাহ, খাব্বাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম প্রমুখ। এরা সবাই ছিল আরব সমাজে নিগৃহীত দাসদাসী। কিন্তু ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রকৃত পক্ষে এরা সম্ভ্রান্ত বংশের নারী-পুরুষ। কলুষিত সমাজের নির্যাতনের শিকারে এরা এক সময়

Dhaka University Institutional Repository

দাস দাসীতে পরিণত হয়। অতঃপর সমাজ তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করল তা এখানে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে মুক্তি দূত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মুক্তির বাণী নিয়ে আসলেন তখন এই দাস দাসীরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। তাদের উপর সমাজপতিরা চরম নির্যাতন চালায়। কিন্তু ইতিহাস আপন গতিতে অগ্রসর হয়। এক সময় এ দাস-দাসী বিজয়ী হয়, পরাজিত ও অধঃপতিত হয় জালিম সমাজপতিরা। এ কাহিনী চিত্রায়নে লেখক সার্থক ও সফলকাম। প্রেম, বিরহ, সংঘাত, নির্যাতন, জয়, পরাজয়, সকল চিত্রই লেখক সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। অথচ তিনি ইতিহাস বিকৃত করার প্রয়োজন মনে করেননি। এখানেই লেখকের সার্থকতা ও সফলতা।

আল-ও'আদ আল-হক্কের প্রথম অধ্যায় শুরু করা হয়েছে প্রেম কাহিনী দিয়ে। আর এই প্রেম কাহিনীর চরম ও নির্মম পরিণতি অঙ্কন করেছেন অনেক পরে গিয়ে। এখানে ত্বাহা হোসাইন তৎকালীন আরবের সমাজ চিত্রও অঙ্কন করেছেন। নায়ক ইয়াসির ভাইদের সাথে নিজ মাতৃভুমি ইয়েমেন থেকে হারানো এক ভাইকে খুঁজতে এসেছিল মক্কা শহরে। এখানে তারা মেহমান হলো আবূ হুযায়ফার বাড়ীতে। আবূ হুযায়ফার বাড়ীতে নায়িকার সাথে ইয়াসিরের পরিচয়। তারা প্রেমে পড়ল। নায়ক ভাইদের সাথে আর দেশে ফিরলনা, সে প্রেমিকার জন্য মক্কার সবকিছুই তার ভাল লাগল। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এক সময় তাদের প্রেম সফল হলো এ প্রেমিকাকে বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতে সুখেই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল। সময় বয়ে অনেক অনেক দিন পর মক্কায় ঘটল নতুন ঘটনা। ইয়াসির যখন বার্ধক্যে পৌছায় তার ছেলে আম্মারের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সঃ) নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন। প্রথমে আম্মার ও পরে ইয়াসির ও সুমাইয়্যা মুসলমান হয়। কুরাইশ অধিপতি আবূ জাহিল তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে সুমাইয়্যা শহীদ হন। তিনি হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ। এমনি ভাবে ত্বাহা হোসাইন অন্যান্য চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সমাজ ও ইতিহাস দর্শনও তুলে ধরেছেন। যেমনঃ 'ইতিহাস তার অভ্যাস অনুযায়ী চিরদিনই দীনহীন লোকদের ছেড়ে রাজা-বাদশাহদের ও সমাজ পতিদের সাথে দহরম মহরম করে আসছে --------। ইতিহাস তার শাহী নওয়াবী কায়দা ছেড়ে এ গরীব বেচারাদের দিকে কোন দিন মুখ তুলে তাঁকাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনি। ------- কালের বিবর্তনে

Dhaka University Institutional Repository

এমনি এক সময় এল যখন ইতিহাস এ গরীবদের জীর্ণ কুটিরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এমনকি বেচারা ইয়াসিরের মত সাধারণ দরিদ্র লোকদের সাথেও সম্পর্ক রাখতে রাজি হলো[১২]।

وكان التاريخ فى ذلك الوقت، كما قال فى اكثرالاوقات، ضنينا بخيلا ومستكبراً متعاليا، يحفل بالسادة فى تحفظ ويلتفت الى القادة فى كثير من الاحتياط، لا يسجل من امرهم الاماكان له شان اوخطر وكان ياسرمن هذه الدهماء، فلم يحفل به التاريخ ولم يلتفت اليه، ولم يصحبه فى حياته الطويلة ---

আল-ও'আদ আল-হক্ব থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ

খালফের আনুমানিক ২০ বছর বয়স্ক এক গোলাম ছিল। তার নাম ছিল রাবাহ্। সে ছিল চতুর, বুদ্ধিমান আর কর্মঠ, তার কর্ম দেখে প্রভু তাকে আজাদ করে দিল। এবং আপন ছোরাত উপত্যকায় ফসলাদি, জীবজন্তু লালন পালন ও দেখাশুনার ভার তার উপর অর্পন করে দিল। এক দিন সে রেবাহকে ডেকে বললঃ রাবাহ্ এ হচ্ছে তোমদের জন্মভুমি আবিসিনিয়ার রাজকুমারী। তোমাদের স্বদেশী লোকেরা আমাদের পবিত্র ঘরের সাথে যে বেয়াদবী করেছে তা তোমার আজ আর অজানা নেই। তাই আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, শাহজাদীকে দিয়ে উট বকরী চরাবো। রাখালের পোষাক পরিয়ে তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করবো। তোমরা ওকে মনের মত সাজা দিবে। রাবাহ্ ঃ তাহলে আর বিলম্ব কেন? আপনার রাবাহ্তো আর কচি ছেলেটি নয়, সব রকম সাজা সে জানে। আপনি তো জানেন আমার শাস্তির ভয়ে আপনার সকল গোলাম কাজে পটু এবং সুদক্ষ হয়ে উঠেছে। খালফ ঃ তাহলে শাহজাদীকে নিয়ে যাও সেই রাখালদের সাথে মিশিয়ে সাজা আরম্ভ করে দাও। রাবাহ্ঃ এতে তো আর তেমন কোন অপমান দেখা যাচ্ছে না প্রভু। অপমানতো তাকে করার মতই করতে হবে, আমার কাছে আর একটা সুন্দর পথ আছে। খলফ ঃ বল, নিঃসংকোচে তা বলে ফেল। রাবাহ্ ঃ আপনি ভাল করেই জানেন আমি আবিসিনিয়ার কোন সর্দার ছিলাম না। নিম্ন শ্রেণীর একজন প্রজাই ছিলাম, দেশে থাকলে আমি শাহজাদীর বাড়ীতে চাকর হওয়ার আশাও করতে সাহস পেতাম না।

---

১২. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আল-ওয়াদ আল-হক্ব, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তাকে অপমান করার যে পথ সবচেয়ে উত্তম তা হলো, তার চাকর বা অনুপযুক্ত লোকের সাথে..... খালফঃ (মুচকি হেসে) তা হলে তুমি তাকে তোমার রাণী করতে চাও? না, আমি তা চাই না, এটা শোভাও পায়না । কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ এবং নেতাদেরকে অপমান এর মত অপমান করতে চাইলে ওকে আপনি কোন আবিসিনিয়ার গোলামের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। খলফ ঃ আচ্ছা ঃ এসো এক্ষুনি তোমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি[১৭]।

এ রাজকুমারী ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াযজিন হজরত বিলালের জননী। আর রাবাহ্ ছিলেন বিলালের পিতা। এভাবে ত্বাহা হোসাইন ঘটনার এপিঠ ওপিঠ দেখিয়েছেন। কিভাবে এই মনিবদের পতন হলো আর এই অবহেলিত শিশু বিলাল বড় হয়ে ঘাত প্রতিঘাত, জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে এক সময় জালিমের প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের উপর মজলুমের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করলেন। পাঠক এই উপন্যাস পাঠ করে এ গ্রন্থের একএক জন নায়ক নায়িকার সাথে নিজেদেরকে মূল্যায়ণ করে কাংখিত বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন। পাঠকের নিকট এই গ্রন্থ খুবই প্রিয়। এর চাহিদা ও জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এটাকে চলচ্চিত্ররূপ দেওয় হয়েছে 'জহুরুল ইসলাম' নামে। উহার ইংরেজী চলচ্চিত্র রূপ 'ডন অফ ইসলাম'। দর্শকের মধ্যে এটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বাংলা ভাষায় আল-ও'আদ আল-হক্ক এর অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার মোমতাজী, 'ইসলামের আলো' নামে[১৮]। ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখে সাহাবীদের জীবন নিয়ে সাহিত্যরসে ভরা এমন উপন্যাস রচনায় ত্বাহা হোসাইন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। আধুনিক উপন্যাসে শিল্পগুনকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। সমাজ বিকাশের চিরন্তন ইতিহাসের সাথে তিনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘোষণাকে মিলিয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বিপ্লবের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর পরাজয়কে বলিষ্ঠতার সাথে প্রদর্শন করেছেন। আর্দশ প্রতিষ্ঠায় এই উপন্যাস মুমেনদেরকে সাহস যোগাবে। মুসলমানদের পূর্ব পুরুষদের সোনালী জীবনের ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে আল-ওয়াদ আল-হক্ক উপন্যাসে।

---

১৭. ডঃ ত্বাহা হোসাইন, আল-ওয়াঁদ আল-হক্ক, পৃ.

১৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার মোমতাজী, ইসলামের আলো, তরফদার বিপনি,(ঢাকা) ১৯৭৬ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসিক হিসেবে তওফীক আল-হাকীম

ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, পত্র সাহিত্য, রম্য রচনা এগুলো কথা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা। তওফীক আল-হাকীম এর জীবন ও কর্মে তিনি আজীবন এই কথা সাহিত্য নিয়েই ছিলেন এর বাহিরের জীবনও তাঁর এই কথা সাহিত্যকে নিয়েই যুক্ত ছিল।

বাল্যকাল থেকেই তার একটি শিল্পমন ছিল বলে তার জীবনী থেকে বুঝা যায়। জীবন ও পরিবেশ, মন ও মানস সমাজ ও প্রকৃতি এসবের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণনজর ছিল বাল্যকাল থেকেই। তাই আমরা লক্ষ্য করি মা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে যখন দেমানহুর পল্লীর স্কুলের সামনে উপস্থিত তখন তিনি মা'র আগমন টের পেয়েও খেলা ছেড়ে আসেননি বন্ধুদের হৃদয় আহত হবে এই কথা ভেবে।

মা কৃষক বলে কাউকে তিরস্কার করলে বাল্য বয়সেই তার মন প্রতিবাদী হয়ে উঠে। তিনি কল্পনা বিলাস মানুষ ছিলেন না। আবেগ আর কল্পনা দিয়ে গল্পের প্লট নির্মাণ করেননি জীবন ও পরিবেশ, যুগ ও মানুষ এর নিরিখে যা ঘটেছে জীবন ও পরিবেশ সময় ও সমাজে তাঁরই মনোরম চিত্র অংকন করেছেন শিল্প মনের তুলিতে শব্দের মাধুরী দিয়ে।

তাইতো দেখা যায় উপন্যাসের প্রধান বিষয় ও প্লট বাঁছাই করেছেন তিনি নিজের জীবন আলেখ্যের মাধ্যমে। তার বাল্যকাল আর শিক্ষা ও যৌবন চিত্রিত করেছেন 'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাসের মত বৃহৎ রচনার মাধ্যমে। উচ্চ শিক্ষা, যৌবনের চাহিদা, যুব মনের তাড়না ও অভিজ্ঞতার শিল্প চিত্র এঁকেছেন 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসে। কর্ম জীবনে চাকুরি বিচার বিভাগে, এ বাস্তবতার বিচিত্ররূপ তুলে ধরেছেন 'ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আর য়াফ' উপন্যাসে। সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন এর সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক বিষয়। সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবিদের জীবনে স্বার্থপরতা থাকতে পারে এর শিকার উপন্যাসিক নিজে দেখায়েছেন "হিমার আল-হাকীমে"। সুন্দর গল্প, উপন্যাস লিখে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠককে আন্দোলিত করবে উপন্যাসিক, পাঠক যদি বর্ণিত চরিত্রের বাস্তব দিক নিয়ে উপন্যাসিকের কাছে আসে তাহলেও কি শুধু সাহিত্যের কথাই বলবে না-কি তার কোন দায়বদ্ধতা আছে? প্রেম প্রেম খেলাই কি জীবনের নাটক, না-কি এ মঞ্চের পিছনে মধুমিলনের সংসার আছে? উপন্যাসিক বা সাহিত্যিকের জীবনে এই অধ্যায় বর্ণিত ও চিত্রিত হয়েছে আল-' আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাসে"।

এভাবেই তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পাঁচটি রচিত হয়েছে। এ পাঁচটি উপন্যাস তওফীক আল-হাকীমের বৃহৎ জীবনীর ৫টি খন্ড। তারপরেও এত বিদেশী ভাষায় এত অধিক সংস্করণ কেন হলো এ জীবনীগুলোর? এসব রচনার পূর্বে কি তাওফীকের কোন পরিচয় ছিল? তিনি কি কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যে তার জীবনী দেশে বিদেশের অগণিত পাঠক পড়বে। এখানেই উপন্যাসিক হিসেবে তওফীক আল-হাকীমের সফলতা ও সার্থকতা। তিনি তার জীবনী দিয়ে শুরু করেছেন জীবনী দিয়েই শেষ করেছেন জীবন নিয়েই লিখেছেন জীবনই তাকে পরিচিত করেছে, এ জীবনই আরবী উপন্যাসকে বিশ্বের দরবারে আসীন করেছে। এ ধারাবাহিকতায় তারই ছাত্র তিন প্রজন্ম আর তিন গলির জীবনী লিখে বিশ্ব শিরোপা নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর পরে। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন- আমার উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আমার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জড়িত, তারপরেও তাঁর উপন্যাসের এত কদর কেন? ফরাসী সমাজে বা ইংরেজী পাঠকের অথবা রুশ যুবকরাই বা কেন পড়ছে মিসরীয় গ্রামীণ পরিবেশ বেড়ে উঠা যুবকের আত্ম জীবনী। এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক যেমন দিয়েছেন, গবেষক সমালোচনাগণ যেমন বলেছেন তেমনিভাবে তওফীক নিজেও বলেছেন তার "আল-তাআ'দালিয়া" গ্রন্থে। তিনি বলেছেন- আমার সকল রচনার বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ[১]। মানুষকেই আমি ব্যাখ্যা করেছি মানুষকে নিয়েই শিল্প গড়েছি মানুষকে নিয়েই আমি স্বপ্ন দেখেছি মানুষকে আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এই মানসিকতা আর শিল্পমন তাঁকে সমসাময়িক উপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, অগণিত পাঠককে মোহিত করেছে।

আত্মজীবনীর ধারাবাহিকতায় তিনি গোটা জীবনকেই চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। এমনকি তাঁর জীবনের বিনোদনকেও চিত্রিত করেছে তাঁর বন্ধু রম্য রচনার ধারায় উপন্যাসের শাখায়।

---

১. তওফীক আল-হাকীম,আল-তাআ'দালীয়া, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ খৃ. সালে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন রসিক বন্ধু অন্ধ ত্বাহা হোসাইনসহ প্যারিসের আলেপ্পো পার্বত্য পল্লীতে। কয়েকদিন বেশ প্রমোদে রোমাঞ্চে কাটতে আড্ডা জমলো জাঁকালোভাবে। দু'বন্ধুর আড্ডার ফসল বেরিয়ে আসলো আল-কাস আল-মাসহুর বা যাদুর প্রাসাদ- রম্য রচনা বা রূপ কথা আকারে[২]।

বাংলা সাহিত্যিকের অনূদিত শব্দে তুলে ধরছি কিছু চিত্র:

"আমন্ত্রনপত্র পাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ত্বাহা হোসাইনকে শাহজাদির যাদুর প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো। শাহজাদীর অনুরোধ, শাহজাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর একজন সঙ্গী দরকার কারণ সঙ্গী ছাড়া তাঁর ঘুম হয়না এবং অনর্থক রাত কাটে। ত্বাহা হোসাইন হেসে ফেললেন এবং বললেন আপনার প্রস্তাবটি অতি উত্তম এবং আনন্দের বটে। আমার মতো অন্ধলোক আপনার সঙ্গ দিতে গেলে আপনিই বরঞ্চ বিব্রত বোধ করবেন, তারচেয়ে এক কাজ করুণ- তওফীক আল-হাকীম নামে আমার এক বন্ধু আছেন। তিনি সুদর্শন যুবক, তাছাড়া পুরস্কার প্রাপ্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং রসিক সুজন। আপনার সঙ্গী হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই বলে আমার বিশ্বাস। ত্বাহা হোসাইন চলে এলেন। লোক পাঠিয়ে তওফীক আল-হাকীমকে একরূপ জোর করে শাহজাদির যাদুর প্রাসাদে নেয়া হলো। আদ্যোপান্ত শুনে তওফীক আল-হাকীম বললেন, আমার চেয়ে ত্বাহা হোসাইন অনেক উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব এবং সঙ্গ দেয়ার ব্যাপারে দারুন ওস্তাদ। কাজেই আমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তিনি নিশ্চিন্তে তা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

শাহজাদি এ কথায় কান দিলেন না এবং তওফীক আল-হাকীমকে প্রাসাদের এক মনোরম কক্ষে আটকিয়ে রাখলেন। এখানেই শেষ নয়। তিনজন অতিশয় যৌবনবতী রূপসী রমনী নিয়োগ করলেন তওফীক আল-হাকীমের সেবাযত্ন করতে যাতে তাঁর আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এই আয়োজনের পর ত্বাহা হোসাইনকে লিখে পাঠালেন খুব জরুরিভাবে- আপনার বন্ধু তওফীক আল-হাকীম বিপদে আছে। কারণ 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা আরব্য রজনীর কয়েকজন চরিত্র এসে

---

২. ডঃ শাওকী দায়েফ,আল-আদব আল-আরবী, পৃ.২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মাথা কেটে নেবার চেষ্টা করছে। কেননা, তওফীক আল-হাকীম তাঁর "সম্রাটের দ্বন্দ্ব" "উন্মাদের নদী" "তেলাপোকার ভাগ্য" ইত্যাদি নাটকে সেই চরিত্রগুলো এমনভাবে বিকৃত করে চিত্রিত করেছেন যে, তাদের স্বকীয়তা নষ্ট হয়েছে এবং এ জন্য তারা ভীষণ অপমানবোধ করছে। এই অপমানের একমাত্র শাস্তিস্বরূপ তারা তওফীক আল-হাকীমের শিরোচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ[৩]।

এভাবে তাওফীকের জীবনের হাসি কান্না অনুভূতি সবকিছুই চিত্রিত হয়েছে উপন্যাস বা অন্যকোন কথা সাহিত্যে। এভাবে বলা যায় তওফীক আল-হাকীমের গোটা জীবনই উপন্যাস অথবা তাওফীকের সকল উপন্যাসই তাওফীকের ব্যক্তিগত বাস্তব জীবন– এই আলোকেই তাকে এবং তার উপন্যাসকে মূল্যায়ণ করতে হবে। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াই কোটি বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর কম্পিউটারে ইন্টারনেটের তথ্য অনুযায়ী তওফীক আল-হাকীমের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচটি[৪]।

১. *আওদাত আল-রূহ (আত্মার প্রত্যাবর্তন)*- ১৯৩৩ খৃ. প্রকাশিত।

২. *উসফুর মিন আল-শারক (প্রাচ্যের চড়ুই)*-১৯৩৭ খৃ.সালে প্রকাশিত।

৩. *ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ (আইনজীবির গ্রামের ডায়েরী)*-১৯৩৭ খৃ. সালে প্রকাশিত।

৪. *হিমার আল-হাকীম(জ্ঞানী গাধা)*-১৯৪০খৃ. সালে প্রকাশিত।

৫. *আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস (পবিত্র সম্পর্ক)* -১৯৪৪ খৃ. সালে প্রকাশিত।

---

৩. আব্দুস সাত্তার আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, পৃ. ১৫।

৪ . গবেষক ১৯৯০ খৃ. সালে সৌদী আরব সরকারের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের বৃত্তি নিয়ে কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষক প্রশিক্ষন কোর্সে অংশ গ্রহণ করার জন্য রিয়াদ গমন করেন। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ লাইব্রেরী যা বর্তমান আরব বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীর অন্যতম। এই লাইব্রেরীতে বক্ষমান গবেষনাপত্র নিয়ে অধ্যয়ন ও তথ্য সংগ্রহের ফলেই এই গবেষনা অভিসন্দর্ভটি প্রনয়ন করা সহজ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস সমূহঃ

উপন্যাস রচনায় তার বর্ণনা ছিল সংক্ষিপ্ত ও সহজ। আল- আওদাত উপন্যাসের বক্তব্য থেকেই দেখা যায় মুহসিনকে স্কুলে যখন ক্লাসে রচনা লিখতে বলা হয় তখন সে মাত্র কয়েকটি বাক্যে রচনা শেষ করে। রচনার বিষয় ছিল *"ভালবাসা"*। তিনি এভাবে বলেছেন ঃ ভালবাসা তিন প্রকার-

এক. আল্লাহর প্রতি ভালবাসা-এটি হচ্ছে বিনয়ের এবং মর্যাদার স্বীকৃতির ভালবাসা।

দুই. পিতামাতার প্রতি ভালবাসা- এটি হচ্ছে রক্তের ভালবাসা।

তিন. সুন্দরের প্রতি ভালবাসা, এটি হচ্ছে অন্তরের ভালবাসা[৫]।

তওফীকের এ বর্ণনা থেকে তার বর্ণনার ধারা এবং তার মনে প্রেম সম্পর্কিত ধারণা ও তার সুন্দর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প উপন্যাসের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে বিনোদন অথবা প্রেমের চরিত্র। অনেক উপন্যাসিকই হয়ত সুন্দর সুন্দর প্রেমের উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু ব্যক্তি জীবনের খবর নিলে দেখা যাবে প্রেম চরিত্র তাদের জীবনের অভিধানে নেই। তওফীক আল-হাকীম ছিলেন এ ব্যাপারে ভিন্নতর। শিল্পের জন্য শিল্প এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না বরং জীবনের জন্যই শিল্প অথবা জীবন শিল্প এই ঘোষিত নীতিমালার ভিত্তিতেই তিনি উপন্যাসের প্লট ও বিষয় নির্বাচন করেছেন। তিনি তিনটি উপন্যাসে অধিকভাবে এবং দুটি উপন্যাসে পরিমিতভাবে প্রেমের চরিত্র অংকন করেছেন। যা তার জীবনে এসেছে অথবা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শুধুমাত্র সেটাই তিনি শিল্প দিয়ে চিত্রিত করেছেন। কল্পনা বিলাসে ফানুস নিয়ে তিনি আকাশ ভ্রমন করেননি, তিনি মাটি ও মানুষ নিয়ে এ মর্তের পৃথিবীর সমাজেই ছিলেন মানুষ ঘেরা পরিবেশে। সানিয়্যা ও ইমা নায়িকা কল্পিত চরিত্র নয়, তাওফীকের জীবনের চলার পথে প্রিয়তমা দুই নারী মূর্তি। এখানেই উপন্যাসিক হিসেবে সচরাচর উপন্যাসিকদের থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

---

৫. তওফীক আল-হাকীম,আওদাত আল-রূহ প্রথম খন্ড, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রথম ও বৃহৎ সফল উপন্যাস "আওদাত আল-রূহ"তে তিনি সাধারণ বিষয় দিয়েই শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন[১]। সমসাময়িক সকল উপন্যাসিক অথবা কথা সাহিত্যিকের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ শিল্প 'আওদাত আল-রূহ'তে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এ ব্যাপারে প্রায় সকল গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক একমত[৬]।

নায়ক মুহসিন স্কুল ছুটি হওয়ার মৌসুমে শহর থেকে বাড়ী এসেছে পিতা-মাতার কাছে এতটুকু বিষয়কে তিনি কিভাবে শিল্প দিয়ে চিত্রিত করেছেন তা লক্ষ্যনীয়। এখানে তার উপন্যাস থেকে তুলে ধরা হচ্ছে:[৭]

وصل القطار اخيراً الى محطة دمنهور، فاطل محسن على الرصيف ووجد بانتظار البربرى السفرجى، والأسطى احمدالحوذى، وماكادايتعرفانه حتى تعلقا بمركبة القطار وصاحا: حمدالله على السلامة يابيه --- لوان سنية كانت حاضرة لترى وتسمع ---

"শেষ পর্যন্ত রেল গাড়ী দেমানহুর রেল ষ্টেশনে পৌছলো। আস্তে আস্তে মুহসিন অবতরণ করার প্রস্তুতি নিল। সেখানে তার অপেক্ষমান খাদেম সফরজী ও আহমদ হাওজীকে দেখতে পেল। তারা যখন মুহসিনকে চিনতে পারল দ্রুত রেলগাড়ীর সিড়িতে ঝুলে চিৎকার করে বললঃ আল্হামদুলিল্লাহ, বাপজান নিরাপদে এসেছেন।

হে বেলাল! চল (গাড়ী চালাও) আব্বুকে নিয়ে চল, আমরা আব্বুকে বাড়ী নিয়ে যাব। মেহেরবানী করে উঠুন আব্বু! এভাবেই যুবক রেলগাড়ী থেকে নেমে দুই খাদেমকে নিয়ে ঘোড়ার

---

৬. ডঃ আবদ আল-মুহসিন তাতাওর,পৃ. ২১৪,২৮৩।

৭. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

গাড়ীতে সওয়ার হলো। যেন তিনি নবাগত প্রবাসী। তার কর্ণে শব্দটি (বিরহ) নতুন মনে হলো। বার বার কানে শব্দটি বাজতে লাগল। এখানে শব্দটি তার অপছন্দ লাগছে এমনটি নয় বরং মূর্খ লোকদের থেকে শব্দটি অপ্রত্যাশিত মনে হচ্ছে। মনে পড়ে গেল বান্ধবী সানিয়্যার কথা। সানিয়্যা যদি এখানে থাকত তা হলে যে মুহসিনের এ দৃশ্য এই সংলাপ দেখত ও শ্রবণ করত। ঘোড়ার গাড়ী শহরের মাঝ পথ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। দু'দিকে রাস্তায় ও দোকান থেকে লোকজন গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তারা আরোহী এই যুবককে জানতে চাচ্ছে- পরিচিত সুন্দর ঘোড়ার গাড়ীতে করে কে যাচ্ছে। এভাবে মুহসিন বাড়ীতে পৌঁছল।

বাড়ীতে পৌঁছে মুহসিন মাকে সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত দেখতে পেল। মুহসিন যখন মায়ের কাছাকাছি হলেন মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। গভীর স্নেহ ভালবাসায় মুহসিন মায়ের সাথে মিলিত হলেন। খুশীতে মায়ের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল। কোলাকুলী শেষ করে মা মুহসিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন। যেন প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে নিলেন, তারপর মা মুচকি হেসে বললেন; বিছমিল্লাহ্ মাশা আল্লাহ! মুহসিন! তুমি একটু মোটা হয়েছ।

তারপর মা তাকে ভিতরের রুমে নিয়ে গেলেন ও তাকে পাশে বসালেন। আলাপ করতে শুরু করলেন; ফুফী ও চাচাদের কথা জানতে চাইলেন। এমন সময় পিতা প্রবেশ করলেন। অমনি মুহসিন লাফিয়ে উঠলো। দৌড়ে পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমু খেল। পিতা বসার পর সেও বসল। অতঃপর পিতা তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ মুহসিন তোমার ষান্মাসিক পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

মুহসিন কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললঃ মানসিক পরীক্ষা মানে একটা বাজে জিনিষ। পিতা বললেনঃ কেন? বাজে কেন হবে, এটাত সব সময়ই হওয়ার কথা। তারপর তার পড়াশুনার খবর নিলেন। শিক্ষকদের সম্পর্কে জানলেন। বিশেষ করে আগামী বার্ষিক পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এমন সময় মা বিরক্ত ভঙ্গিতে অবাক হয়ে স্বামীর প্রতি কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার যে কি হলো। কোন ধৈর্য্য নেই। তার নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ? তার শরীর কেমন আছে, চাচারা কেমন আছেন?

তোমার বুদ্ধি বিবেক কিছুই নেই। অতঃপর তিনি স্বামীর জুতার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তুমি এগুলো পরেছ কেন? তোমাকে না আমি বলেছি এই জুতাটি ফেলে দিতে। তারপরেও তুমি এগুলো পরেছ। তোমার কি আর সুন্দর জুতা নেই? তোমার এতগুলো সুন্দর জুতা থাকতে তুমি এই পুরানো ছেঁড়া জুতাটি পরেছ কেন? তুমি কি এ দেশের ছোট কেউ?

স্বামী জুতা খুলতে খুলতে জবাব দিল আমার ভুল হয়ে গেছে আর এমনিটি হবেনা - বেগম সাহেবা। আলী- আলী উত্তরে খাদেম সাড়া দিল। ষ্টেশনে যে খাদেম মুহসিনের সাথে ছিল এটি অন্যজন। খাদেমটি সাদা জামা ও লাল জুতা পরেছিল। ভূস্বামী বেগ তাকে অন্য একজোড়া জুতা আনতে বললেন। সে সময় মুহসিন ঘরের ভিতরে চারদিকে দৃষ্টি ফিরালেন। সুন্দর চাদর, মূল্যবান তোয়ালে দেখে ভাল লাগল। লাজ নম্রভাবে মায়ের প্রতি তাকালো। মায়ের পরনে মূল্যবান পোষাক ছিল। মা মুহসিনের প্রতি দেখতেছিলেন। মা বললেন.....[৮]। উপন্যাসে তওফীক আল-হাকীম আঞ্চলিক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'আওদাত আল-রূহ উপন্যাসেই আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়:[৯]

إزاى عايز توكلنا عيش من بتاع الغلاحين ياراجل يا مغفل: فاجاب الناظردهشا مبغوثا : واعيش طازه باست، خبيزالنهارده الصبح! وامراتى خبزاه بايدها خصوصى علشان خضرتك فصاحت به: بلاش قرف! أنا اكل عيش من ده ؟

তাওফীকের বাক্য ব্যবহার এবং চরিত্র চিত্রন সংক্ষিপ্ত হলেও তার উপন্যাস দীর্ঘ হয়েছে। 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসে তিনি এত অধিক বিষয়কে এত সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত করেছেন

---

৮. তওফীক আল-হাকীম, আল-আওদাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৯-১১।

৯. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, ২য় খন্ড, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

যা তার শিল্পগুণের পরিচয় বহন করে। অথচ এতসব বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনার ধারা বা শিল্পমান ক্ষুন্ন হয়নি। পাঠকের বিনোদন, আনন্দ-ভারাক্রান্ত হয়নি এখানেই তাওফীকের কৃতিত্ব।

বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শন নিয়ে তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন সাহিত্য সমালোচকগণ যখন এসব বিষয়কে সনাক্ত করেব তখন মনে হবে তওফীক তা হলেও উপন্যাস না লেখে প্রবন্ধপুস্তক লিখেছিলেন কিন্তু তাওফীকের মূল উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক টেরই পাবেনা তিনি কোথাও এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এবং মনে হবে সবই তিনি বিনোদন মূলক বর্ণনা দিয়েছেন।

উপন্যাস চরিত্রে তওফীক করুণ পরিণতির চিত্র খুব কমই দেখিয়েছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবেগ কে তাড়িত না করে বিবেককে নাড়া দেয়া। প্রেমের পত্র তাওফীকের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য, 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস'সহ অন্যান্য উপন্যাসে বর্ণিত তাঁর প্রেম পত্র নিয়ে আলাদা একটি প্রেম সাহিত্য পুস্তক রচিত হতে পারে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের চরিত্র নির্মাণে তাঁর বর্ণনা যাদুর মত কাজ করেছে। তাঁর উপন্যাসে অভিজাত চরিত্র অধিকভাবে চিত্রিত হয়েছে তবে তা দারিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতি বিদ্রুপ বা অবহেলার চরিত্রে ছিলনা। নারী চরিত্র নির্মাণে তিনি নারীকে মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ব্যক্তি জীবনে মায়ের প্রভাব তার উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে প্রভাবিত করেছে। 'আল-রাবাত আলমুকাদ্দাস' উপন্যাসে স্বামী যখন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন ঘর ছেড়ে দূরে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন তখনো স্ত্রী এতটা ভেঙ্গে পড়েননি। স্বামী তাকে তালাক দিবে শিশু সন্তান নিয়ে তার কি হবে এতটুকু ভেবেও তিনি তার স্বাভাবিক অবস্থা হারান নি।

তাওফীকের উপন্যাসে পশুপাখীর চিত্র ও কৃষকের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বকে গল্প চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তার উপন্যাসে তিনি মাঝে মধ্যে সংগীতের ব্যবহার করে বর্ণনা ও চরিত্রকে প্রানবন্ত করেছেন এবং পাঠকের বিনোদনকে উৎসাহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসকে তওফীক বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে এবং কখনো বিষয়ের সাথে মিল রেখে অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন। পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে যেমন এই পদ্ধতি সহায়ক তেমনিভাবে পাঠ্যাভ্যাস অব্যাহত রাখার জন্যও এটি আকর্ষনীয়। 'একজন পাঠক একটি উপন্যাস হাতে নিয়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের শিরোনামগুলো দেখে বইটি পাঠে উদ্বুদ্ধ হবে।

যেমনঃ সুন্দরী পড়ছে, কুরুক্ষে, শেষ পরিণতি, যাত্রা হলো শুরু, এসব নাম দেখলে মনে হবে এইগুলো কোন ছোটগল্প বস্তুত এগুলো বিভিন্ন অনুচ্ছেদের শিরোনাম। মূল উপন্যাসের কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে এ ধরনের নাম অথবা অধ্যায়ে বিভক্তিকরণ তাওফীকের উপস্থাপনা পদ্ধতির একটি কৌশল। 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসে তিনি নায়ক চরিত্র নির্মাণে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা মিসরীয়রা তথা প্রাচ্য সভ্যতার ধারক বাহক যারা ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করব তবে আমরা ইউরোপীয় হব না আমরা মিসরীয়ই থাকব। মানবিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য ইউরোপীয় জড়বাদী যান্ত্রিক জীবন থেকে উত্তম। যেকথা নায়ক রুশবন্ধু ঈফানকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয় রুশ যুবকই উপরোপীয় জীবনকে বর্জন করে প্রাচ্যের পথে রওনা হওয়ার জন্য ঘোষণা করেছে। তাওফীকের শিল্প তুলেতে এভাবে চিত্রিত হয়েছে যেমন-

"বন্ধু তুমি আমাকে যেতে দাও। আমি চলে যাব প্রাচ্যে। আমি দেখব যয়তূন পাহাড়। আমি পান করব নীল নদের পানি, যমযমের পানি আর.....পানি.....[১৯]"।

دعنى ايها الشاب، سنذهب الى الشرق اريد ان أرى جبل الزيتون وان اشرب من ماء النيل وماء الفرات وماء زمزم ---

মুহসিন চরিত্র নির্মাণে তওফীক ছিলেন নিজের সমাজের প্রতি আস্থাশীল এবং দরদী। প্যারিসের সংগীত নাটকে তিনি আকৃষ্ট হলেও নিজের জাতীসত্বা ও নৈতিকতাকে তিনি ভুলে যাননি। এভাবে তওফীক নিজের দেশ ও সমাজের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখে যে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করার জন্য, উপন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক তার উপন্যাসে নায়ক নায়িকা সহ বিভিন্ন চরিত্রকে কখনো নাম ব্যবহার না করে উপনাম ব্যবহার করেছেন 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসে স্বামী স্ত্রী, লেখক চিন্তাবিদ, এইসব পরিচিতি মূলক নাম ভেদ করে কখনো তাদের ব্যক্তিগত নাম ব্যবহৃত হয়নি। উপন্যাসে তওফীক নায়ক নায়িকাকে মুখোমুখি সংলাপে দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত রেখেছেন। যেখানে এই ধরনের চরিত্র নির্মিত হয়েছে সেসব রচনা কিন্তু তার উপন্যাস রচনা ধারার শেষ পর্যায়ের কথা। বস্তুত তিনি যে অচিরেই উপন্যাস থেকে নাটকে এককভাবে প্রবেশ করবেন উপন্যাসিক থেকে নাট্যকার হিসেবেই তিনি অধিক খ্যাতিমান হবেন এটি ছিল তাঁর পূর্ব লক্ষণ। বর্ণনা ধারায় তিনি শালীনতা বজায় রেখেই বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণ করেছেন, ব্যতিক্রম যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসের একটি কল্পিত চরিত্রে।

'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাসে প্রকাশ্য স্থানে সানিয়্যা মুহসিনের গালে চুমু খেয়েছে। মিসরীয় সমাজের জন্য এই দৃশ্যটি কতটুকু সার্থক শিল্প চিত্র ছিল তা পর্যালোচনার বিষয়। এই দুটি চরিত্র ব্যতীত তওফীক আরব তথা মুসলিম সমাজের মূল্যাবোধের কাছাকাছি অবস্থান করেই তার সামাজিক উপন্যাসের চিত্র ও চরিত্র অংকন করেছেন। এখানে তাকে সফল বলেই ধরে নিতে হবে। বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনার ফাঁকে তিনি কখনো নীতিবোধের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসে ফরাসী মা-দেরকে যখন জার্মানিদেরকে ঘৃনা করতে শিক্ষা দিতে দেখলেন তখন তিনি মন্তব্য করলেন 'মা-দের কি অধিকার আছে যে, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে প্রতিহিংসা ও ঘৃনা শিক্ষা দিয়ে শিশুদেরকে বড় করবে'[১০]?

اليس فى كل فرنسا يلقن اطفالهن كراهية الإلمان؟ --
باى حق تستطيع ام ان تنشئ ولداً علي العداوة
والبغضاء؟

১০. তওফীক আল-হাকীম, উসফূর মিন আল-শারক, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসিক হিসেবে তওফীক আল-হাকীমের মূল্যায়নের আলোচনায় তাঁর ৫টি উপন্যাস নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইয়াওমিয়াত না ইব ফী আল-আরইয়াফ (আইনজীবির পল্লী গাঁয়ের ডায়েরী)ঃ

তওফীক আল-হাকীমের পাঁচটি বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে 'ইয়াওমিয়াত না-ইব ফী-আল-আরইয়াফ' অন্যতম। প্যারিস থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বিচার বিভাগে সরকারী আইনজীবি হিসাবে চাকুরিতে নিযুক্ত হন। একই সাথে তিনি পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত রাখেন। পেশাগত কারণে তাঁকে মফস্বলের বিভিন্ন বিচারালয়ে কাজ করতে হয়েছে। কর্মজীবনের এইসব অভিজ্ঞতাকে শিল্প সাহিত্য রূপ দিয়ে তিনি একটি উপন্যাস রচনা করেন যার নাম দিয়েছেন আইনজীবীর ডায়েরী। এটা আবেগ ভিত্তিক কোন গল্প নয় বরং বাস্তব জীবন আলেখ্যের ভিত্তিতে রচিত শিল্পীর হাতে রচিত উপন্যাস। ১৯৩৭ খৃ. সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। ফরাসী ভাষায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খৃ., হিব্রো ভাষায় ১৯৪৫ খৃ.। ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে ১৯৪৭ খৃ. সালে এবং মাদ্রিদ থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয় ১৯৪৮ খৃ. সালে। উপস্থাপনার দিক দিয়ে এই উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য উপন্যাস থেকে ব্যতিক্রম। এখানে কোন অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ নেই বরং ১১ই অক্টোবর থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত ১২দিনের ডায়েরী তিনি উল্লেখ করেছেন।

১১ই অক্টোবরের ডায়েরী এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ আমি আজ রাতে রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমুতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। শরীরটা কিছুটা অসুস্থ ছিল। রাতে নির্ভয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে আল্লাহর কাছে বললাম যেন আমার ভাল ঘুম হয়.....।

আমার চোখ লেগে আসল আর অমনি দারোয়ানের দরজা ধাক্কায় আমার চোখ খুলে গেল। দুর্ঘটনা ঘটেছে; গুলি হয়েছে। আমার আর ঘুম হবেনা বুঝতে অসুবিধে হলোনা। আমি উঠে পড়লাম।

Dhaka University Institutional Repository

বাতি জ্বালালাম। খাদেম আসল সে আমার কাছাকাছি আসল। আলোতে ঘড়ি দেখে নিলাম রাত ৮টা.....। কামরুল হেটে যাচ্ছিল ফসলের জমি থেকে গুলি এসে লেগেছে। তার অবস্থা আশংকাজনক কে এই কাজ করেছে জানা যায় নি [১২]:

١١اكتوبر أويت الى فراشى البارحة مبكرًا- فلقدشعرت بالنهار الحلق، وهومرض يزورنى الان من حين الى حين فعصبت على رقبتى خرقة من الصوف ---

আমি মনে মনে ভাবলাম বিষয়টি নিয়ে দু'ঘন্টার বেশী ব্যস্ত থাকতে হবেনা। কেননা হত্যাকারীকে কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। দারোয়ান যেয়ে দেখত পেল গুলি লাগা ব্যক্তি কথা বলতে পারছেনা বরং সে লাশ হয়ে পড়ে আছে..... [১৩]।

من دايرالناحية اطلق عليه عيار نارى من زراعة قصب والفاعل مجهول : فقلت فى نفس لابأس تلك حادثة بسيطة تستغرمنى على الاكثرساعتين فالضارب مجهول ---

এভাবে ডায়েরী বর্ণিত হয়েছে। কোর্টে বিচারকের জেরা বাদী বিবাদীর জবানবন্দী আইনের জটিলতা ও গ্রামের কৃষকদের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা- বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতা প্রয়োজন। অপরাধী অনেক সময় আইনের ফাঁকে রক্ষা পেয়ে যায় কখনো নিরপরাধী শাস্তি পায়। অপরাধ প্রমাণ করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সমাজের সকলে যদি আইন সম্পর্কে সচেতন হতো তা হলে এমনটি হতে পারতনা।

বিশুদ্ধ আরবীতে উপন্যাসটি রচিত হলেও কিছু আঞ্চলিক কথ্যশব্দও বর্ণিত হয়েছে। এ উপন্যাসের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের অপরাধ ও বিচার ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

---

১৩. তওফীক আল-হাকীম, ইয়াওমিয়াত, পৃ. ১২।

১২. তওফীক আল-হাকীম, ইয়াওমিয়াত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীমের মত দক্ষ কথা শিল্পীর হাতে এর রচনা সম্পন্ন হওয়ায় এর সাহিত্য ও শিল্পমান সমাদৃত হয়েছে। এ জন্য কয়েক বছরের মধ্যেই উপন্যাসটির অনুবাদ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আইন ও বিচার ব্যবস্থার বিষয়টি তৃতীয় বিশ্বের সবদেশের জন্যই প্রযোজ্য।

এই উপন্যাসে প্রেমের চরিত্র খুব সামান্যই। শায়খ উসফুরের সাথে যুবতী রীম এর প্রেমকথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে[১৪]। বিষয় খুব রসাত্মক না হলেও রসিক শিল্পীর হাতে পড়ে নিরস বিষয়ও সরস বর্ণনা পেয়ে সুপাঠ্য হয়েছে। অন্যান্য উপন্যাস থেকে বর্ণনার ধারা এই উপন্যাসে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। এই উপন্যাসে তওফীক কিছুটা দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন যা অন্যান্য উপন্যাসে দেখা যায়না। এই ক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইনের বর্ণনা ধারার সাথে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে আইন ও বিচার বিষয়ক আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এই উপন্যাসে বর্ণনা বেশী, সংলাপ কম। উপন্যাসের বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে আছে আদালতের প্রশ্নোত্তর। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের সাথে এই উপন্যাসটি তুলনা করার মত বিষয় এখানে খুব কমই আছে। তবে ত্বাহা হোসাইন সমাজ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে যেমন বেছে নিয়েছেন তেমনিভাবে এখানে তওফীক শিক্ষাও বিচার ব্যবস্থাকে মনোনীত করেছেন। আইন বিষয়ে বিচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির এক্ষেত্রে এই উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামীণ জীবনের কঠিন বাস্তবতার চিত্রের মূর্তরূপ চিত্রিত হয়েছে তাওফীকের বর্ণনায়। বিনোদন এই উপন্যাসে খুব কমই। তবে জীবনের সামাজিক চিত্রের বাস্তব ছবি প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র। তিনি উকীল ছিলেন উকীলের ডায়েরী নামকরণ খুব সহজেই বিষয়ের সাথে যুক্তিযুক্ত এইকথা বুঝার জন্য কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এজন্য উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ বলা যায়।

ডঃ শাওকী দায়ফ বলেন 'ইয়াওমিয়াত' উপন্যাসে তিনি গ্রামের জনগণ আইনের ধরণ না বুঝার কারণে কিভাবে অসুবিধায় পড়ে তা সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তেমনিভাবে বিচারকসভা প্রশাসনিকগণ অব্যবস্থার কারণে বিচার ও আইন প্রয়োগ করতে কেমন জটিলতায় পড়েন তাও তিনি তুলে ধরেছেন[১৫]। যে কোন দেশের বিচারকদের জন্য উপন্যাসটি শিক্ষনীয়। যার জন্যই হয়ত বিনোদনের স্বল্পতা সত্বেও বইটি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

---

১৪. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৪০০।

১৫. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯১, ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

উসফূর মিন আল-শারক (প্রাচ্যের চড়ুই)ঃ

মুহসিন মিসরীয় যুবক। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিস গিয়েছেন। চার বছর তার প্যারিসে কেটেছে, একাডেমিক শিক্ষা থেকে অন্য বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহী হয়েছে বেশী। প্যারিসের সমাজের সাথে মেলামেশা করে ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। প্যারিসের বন্ধু আন্দারিয়া তাকে নাম দিয়েছে 'উসফূর আল-শারক' বা "প্রাচ্যের চড়ুই"। নায়ক প্যারিস সমাজে বিভিন্ন মতবাদ দর্শন নিয়ে বন্ধুদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। সংগীত, সিনেমা, নাটক ও উপন্যাসে দারুন মোহিত হয়েছেন।

রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী সমাজ তথা শ্রমিক শ্রেণী নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন উৎসুক নেত্রে। মুক্তচিন্তা ও অবাধ প্রেম চর্চার দৃশ্য দেখে রক্ষনশীল মুসলিম সমাজের সদস্য হিসেবে নায়ক আঁতকে উঠলেও এক সময় নিজেই একপা দু'পা করে প্রেমের পথে ফুল ছড়ানোর প্রয়াস পেয়েছেন। পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী সমাজ কাঠামো নিজেদেরকে এশিয়া আফ্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে গর্ববোধ করত। তৃতীয় বিশ্বের ধর্ম চর্চাকে তারা উন্নতির অন্তরায় বলেই যুক্তি দেখায়।

কর্মজীবি হোষ্টেলে তিনি শ্রমিকদের সাথে থেকে শ্রমিক জীবন ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণার সাথে সাথে সমালোচনাও শুনেছেন। কিভাবে শিল্প বিপ্লব উত্তর সমাজতন্ত্রের কবলে পড়ে পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ল প্রবীনদের মুখে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্যারিসে নায়ক সংগীত চর্চা ও নাটক তথা সংস্কৃতি চর্চায় জড়িয়ে পড়েন। নায়ক বরাবরই প্রাচ্য সভ্যতার পক্ষে ছিলেন। পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করলেও প্রাচ্যের মানবিক বিজ্ঞানের বিষয় এবং ধর্মের অবদানকে তিনি খাটো করে দেখেননি। আমেরিকার পূঁজিবাদীদের সমালোচনায় তিনি মুখর ছিলেন। রুশ বন্ধু ঈফান মুহসিনের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রাচ্য সভ্যতাকে ইউরোপের সমাজতন্ত্র, পূজিবাদ, ও যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার থেকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউরোপ ছেড়ে প্রাচ্যের দিকে রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈরী হলেন। ঈফানের বক্তব্যঃ বন্ধু তুমি আমাকে যেতে দাও।

Dhaka University Institutional Repository

আমি চলে যাব প্রাচ্যে। আমি দেখব সেখানে যয়তুন পাহাড়। আমি পান করব নীল নদের পানি। ফোরাতের এবং যমযমের পানি পান করব। আর পানি....[১৬]।

سنذهب الى الشرق اريد ان أرى جبل الزيتون وان
اشرب من ماء النيل وماء الفرات وماء زمزم وماء ---

এভাবে প্রাচ্যের চড়ুই পাখী প্যারিসের যুবক যুবতীদেরকে গানে মাতিয়ে প্রাচ্যমুখী করে তার প্যারিস জীবনের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব ভিত্তিক 'উসফূর মিন আল-শারক' উপন্যাসের ইতি টেনেছেন।

নামকরণঃ প্রাচ্যের চড়ুই মুহসিন। উপন্যাসে তিনি নায়ক। বাস্তবে তিনি তওফীক আল-হাকীম। আইন শাস্ত্রে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন প্যারিসে। ডিগ্রী অর্জন সম্ভব হয়নি। কিন্তু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তিনি নিখুঁত শিল্প মন চর্চায় সফলতা অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্বকারী যুব ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কপি হাউসে, পার্কে, রেস্তোরায়, সংগীতের আসরে, নাট্যশালায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংস্কৃতিক নির্মাতা শিল্পী রূপে।

প্রাচ্য সভ্যতা ও মূল্যবোধের পক্ষে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী বক্তা আর যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী বজ্র কণ্ঠ। তবে শব্দ ছিল সুমধুর তাই বন্ধু আন্দারিয়া তাকে নামকরণ করেছেন 'উসফূর আল-শারক' বা প্রাচ্যের চড়ুই নামে। গানে গানে মধুর কণ্ঠে এ প্রাচ্যের চড়ুই পাখী মাতিয়ে দিয়েছে প্যারিসের যুবক যুবতীদের। এমনকি রুশ যুবক দীর্ঘ দিনের বিতর্কের পর সমাজতন্ত্র ও বস্তবাদী সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্যের অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন।

এতএব তওফীক আল-হাকীমের সামাজিক উপন্যাসের নামকরণ প্রাচ্যের চড়ুই যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। ২০ অধ্যায়ে ২০৮ পৃষ্ঠায় ছোট সাইজের উপন্যাসটিতে লেখক বিচিত্র বিষয়াবলীর সমাবেশ করেছেন।

---

১৬. তওফীক আল-হাকীম, উসফূর মিন আল-শারক, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

উসফুর মিন আল-শারক (প্রাচ্যের চড়ুই) উপন্যাসে যেসব বিষয় বর্ণিত ও চিত্রিত হয়েছেঃ

⌘ প্রেম, ইউরোপীয় ও প্রাচ্যরূপ; প্রেমের ধর্ম ও দর্শন। প্রেমের তুলনামূলক আলোচনা। প্রেমের মিলন ও বিরহ।

⌘ দর্শন, গ্রীক, ফরাসী, রুশ, ভারতীয়, মিশরীয় তথা প্রাচীন ও আধুনিক। ইউরোপীয় দর্শন বনাম প্রাচ্য দর্শন;

⌘ জাতীয়তাবাদ ও প্রতিহিংসা;

⌘ বিভিন্ন মতবাদ ও জীবনাদর্শ যেমন, সমাজতন্ত্র, পূজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ভারতীয় ধর্ম।

⌘ সংগীত বিনোদন, নাটক, উপন্যাস, তথা সাংস্কৃতিক জীবন।

⌘ জীবন সংগ্রাম, জীবন বোধ শ্রমিক অধিকার ও কারখানা;

⌘ শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজ কাঠামো ও পরিবর্তিত পারিবারিক জীবন ও শিশু অধিকার।

⌘ মানবিকতা, বস্তুবাদ ভোগবাদ, যান্ত্রিকতার যাতাকলে নিষ্পেষিত মানবতা।

উপরে বর্ণিত উপন্যাসের বিষয়াবলীর প্রতি কোন সচেতন পাঠক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন, তওফীক আল-হাকীম উপন্যাসের নামে একটি কঠিন প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেছেন যা পাঠ করা খুব কঠিন হবে। বস্তুতঃ বিষয়টি সম্পুর্ণ বিপরীত। বরং রসাত্মক ও সহজ সরল প্রাঞ্জল সাবলিল শব্দ অলংকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজানো উপন্যাস পাঠক দারুন আগ্রহ সহকারে পাঠ শেষ করবেন। কোন গবেষক বা সাহিত্য সমালোচক যখন বিচিত্র বিষয়াবলীকে একত্রিত করে পেশ করবেন, তখনই বিষয়টি কঠিন মনে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে এসব বিষয় নিয়ে ১০টি উপন্যাস রচনা করা যেত, বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে যা মনে হয়, সেখানে তওফীক আল-হাকীম নির্মাণ করেছেন একটি উপন্যাস। এখানেই তাওফীকের শৈল্পিক সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাচ্যের চড়ুই উপন্যাসে তওফীক আল-হাকীমের শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছোট বাক্য ব্যবহার করে সহজ রসালো সাবলীল শব্দ দ্বারা আন্তরিকভাবে কাহিনী তুলে ধরেছেন। মুহসিন নামের নায়ক যিনি তওফীক আল হাকীম, জীবন দর্শন, মূল্যবোধ, গল্পের ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন। প্যারিসে তিনি চার বছর অবস্থান করেছিলেন তার প্যারিস জীবনের প্রেক্ষাপটেই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে[১৭]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বই হলো আলোচ্য উপন্যাসের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

তিনি বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করেছেন গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। তওফীক আল হাকীম পাশ্চাত্যের দর্শন ও সভ্যতাকে প্রাধান্য ও অনুকরণীয় বলেছেন তার অন্য রচনায়। কিন্তু কৌশল হিসাবে তিনি এখানে এই উপন্যাসে রুশ, আমেরিকা, বৃটিশ, ফরাসী, সবার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এসব দেশের দর্শন, মতবাদ ও সাহিত্যকে মিসরীয় জনগণের নিকট পরিচিত করার মানসে উপন্যাসের শিল্প বা টেকনিক হিসেবে তিনি প্রাচ্যের চড়ুই পাখী হয়ে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে কথা বলেছেন বলিষ্ঠভাবে। শুধু তাই নয় তিনি বিজয়ীও হয়েছেন। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের ক্ষেত্রে। মিসরের তৎকালীন অবস্থার সাথে বর্ণিত বিষয়ের মিল রয়েছে। তাঁর উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট ইতিমধ্যে সামগ্রিকভাবে তাওফীকের জীবনী ও আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তার বর্ণনার ও উপস্থাপনার চাতুর্যতা ও সাবলীলতার কারণে পাঠকের নিকট উপন্যাসটি খুবই আকর্ষণীয়। তিনি একটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্য আরেকটি বিষয়কে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যা তার অনন্য বৈশিষ্টের প্রতীক বলা যায়। যেমন- নায়ক প্যারিসে এক যুবতীর প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু প্রেমিকা সহজে প্রেম খেলায় একাত্মতা ঘোষণা করতে রাজী হচ্ছেনা। বন্ধুর স্ত্রী জারমিন পূর্বেই তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ পথে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? কিভাবে

---

১৭. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিসের যুবতীদেরকে বশ করতে হয়। সে অনুযায়ী নায়ক বাজারে গিয়ে একটি তোতা পাখী কিনে আনে। পাখীকে শিখানো হল "আমি তোমাকে ভালবাসি"। পাখীটি প্রেমিকাকে উপহার দেয়া হয় এবং পাখীটির নামও রাখা হয় মুহসিন। প্রেমিকা যখন পাখিটিকে আদর করে মুহসিন বলে ডাকত, তখন পাশের রুমে অবস্থানকারী প্রেমিক আনন্দিত হত। একবার যখন যুবতী চিৎকার করে মুহসিন বলে ডাক দেন নায়ক মনে করল আমার ফাঁদে শিকার ধরা পড়েছে, প্রেমিক আমাকেই ডাকছে, না- যখন জানা গেল তোতা পাখীই ছিল যুবতীর লক্ষ্য বস্তু তখন সে দুঃখ করে বললঃ

آه لألئك الاشتركيين الذين يطلبون المساواة بين الناس فى الحظ والنصيب- وانا لاأستطيع ان اطمع فى مساواتى فى الحظ والنصيب بهذا الببغاء -

"সমাজতন্ত্রীরা বলে থাকে- সকল মানুষের সমান অধিকার আর আমি ত দেখি এ প্রেমিকার নিকট এ পাখীর মত অধিকারটুকুও পাচ্ছিনা"[১৮]।

এটা তার শিল্প কৌশল। পরম প্রেমের সংলাপে তিনি মতবাদ ও দর্শনে চলে গেছেন, কিন্তু উপন্যাসের পাঠককে তিনি মোটেও ভারাক্রান্ত করেননি। বরং রোমান্সে তিনি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পরবর্তী পরিণতির দিকে। এটি তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে শিল্প কৌশল বৈ আর কি? উসফুরুন মিন আল শারক থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছেঃ

চায়ের চুমুক আর "টলষ্টয়" এ দুটিকে আমরা রাশিয়া থেকে অধিক ভালবাসি। লোকটির কথায় মুহসিন কিছুক্ষণ স্থির থেকে অতঃপর বললঃ এটা কিভাবে হয়? বর্তমান রাশিয়া হলো সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য...........। লোকটি উত্তরে বললঃ পৃথিবীতে কোনদিন সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য হতে পারেনা। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবার বললঃ সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য নিয়ে যারা কুসংস্কারে ডুবে আছে তুমিও কি তাদের একজন?

---

১৮. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ১১২।
১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ان الروسيا الان هى جنة الفقراء ---
ان جنة الفقراء لن تكون على هذه الارض ---

না- বিষয়টি আমি অনেক চিন্তা করেছি। আর অনেকেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। এটি এমন এক সমস্যা যার সমাধান এ পৃথিবীতে সম্ভব নয়। আর সেটি হচ্ছে এ ধরায় ধনী, গরীব, সৎ ও অসৎ লোকের অস্তিত্ব ও অবস্থান.....এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই নবী রসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন ঃ[২০]

ان الأنبياء الشرق قدفهموا ان المساواة لايمكن ان تقوم على هذه الارض-

ঈফান! তুমি কি মনে করো- এ সমস্যার কোন সমাধান নেই? নবীগণ আছমান থেকে এর উত্তম সমাধান নিয়ে আগমন করেছেন....। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে নিজেকে প্রশ্ন করে বললেন; তোমাদের নবীগণ.....তোমাদের....হ্যাঁ হয়ত তা সম্ভব.....প্রাচ্যত একদিনেই জটিলতার সমাধান.....এটি নিশ্চয়ই হতে পারে.....প্রাচ্যের নবীগণ বুঝেছিলেন, পৃথিবীতে সমতা কোনদিনই সম্ভব হবেনা। ধনী গরীবদের মধ্যে পৃথিবীর রাজত্ব বন্টন করে পরিমাপ করা কি সম্ভব? অতঃপর তারা অধিকার ও বিতরণ ব্যবস্থার মূলনীতি ঠিক করেছেন। এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে ও আকাশে (জান্নাতে) সমভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীতে কেউ যদি তার অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, সে অবশ্যই জান্নাতে তা পাবে.....এটি চমৎকার সন্দেহ নেই.....।

---

২০. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীম তাঁর 'উসফূর' উপন্যাসটি উপস্থাপন করেছেন যেভাবেঃ-

বৃষ্টিভেজা দিবসে লোকেরা পানশালায়

- আশ্রয় নিয়ে খোশগল্পে মশগুল.....

(আন্দারিয়া মুহসিনকে বললঃ) চল আমার সাথে, এই দায়িত্ব পালনের জন্য

- কার প্রতি দায়িত্ব?

- ম্যাডাম শার্লের কন্যার স্বামী যিনি পরলোকগমন করেছেন।

- প্রথমে বলতো!- ম্যাডাম শার্ল কে?

- তিনি হচ্ছেন- কারখানায় আমার এক সহকর্মীর মাতা।

- আমার কি পাপ?

- তোমার আর পাপ কি, তুমি আমার বন্ধু, অতএব আমি

যে দায়িত্ব পালন করি স্বভাবত তোমাকে তাতে শরীক হতে হয়।.....

এভাবে আলাপ করতে করতে তারা চলে গেল এক পাতাল রেল ষ্টেশনে।

প্রাচ্যের প্রেমিক প্রেমিকাদের সম্পর্ক কতটা গভীর পক্ষান্তরে ইউরোপীয় বস্তুবাদী সমাজের প্রেমের সম্পর্ক কতটা স্বার্থপরতায় মিশ্রিত এ চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় সতীদাহ বিষয়ক উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন:[২১]

وذات صباح استيقظت الفتاة فوجدت حبيبها الى جانبها ميتًا، فبكته بكاء مرًا- وجاء الناس والكهنة واحرقوا، كمايفعل الهنود بموتاهم، فاسرعت الفتاة والقت بنفسها الى جانبها فى اللهب فاصعدما معه الى السماء، تلك قصة الفتاة الهندية امالفتاة الأوربية اليوم فانها تفعل غير ذلك انها اعقل من تلقى بنفسها فى اللهب ---

২১. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

একদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে যুবতী তার পাশে শায়িত বন্ধুকে মৃত দেখতে পেল। সে ভীষন অশ্রুপাত করল। অনেক লোক জড়ো হলো, পুরোহীতগণও আসল। মৃতের লাশ আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। ভারতীয়রা মৃত দেহকে এমনটিই করে থাকে। যুবতী দ্রুত নিজকে প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করল। এভাবেই তাকে প্রেমিকের সাথে উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নেয়া হলো। এটি হলো- ভারতীয় যুবতীর গল্প, কিন্তু ইউরোপীয় যুবতীর গল্প ভিন্নতর ....।

অর্থনৈতিক বিষয়ে এই উপন্যাসে অনেক আলোচনা আছে। আমরিকার পূজিপতিরা কিভাবে অন্যদেশের সম্পদ শোষণ করছে এ বিষয়ে কপি হাউসে আলোচনার ঝড় উঠে :[২২]

وان فرنساالآن اصحاب المال الأمركيين- وان هؤلاء
الامريكان قد بلغ عتوهم ---

হোটেলে আলোচনার টেবিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় সেখানে মুহসিন উল্লেখ করলঃ[২৩]

كانت حضارات افريقيا وآسياقدوصلت به حقيقة الى
قمم المعرفة البشرية --- امالعلم الظاهر ---

প্রযুক্তি বিজ্ঞানে ইউরোপ উন্নতি করেছে কিন্তু মানবিক মূল্যবোধে এশিয়া ও আফ্রিকার সভ্যতা বেশী অগ্রসর হয়েছে।

উগ্রজাতীয়তাবাদী হিটলার বাহিনী ফরাসীদেরকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। জার্মানীদেরকে বুঝানোর জন্য ফরাসীরা ঘৃণাভরে বুশ শব্দ ব্যবহার করত। উগ্রজাতীয়তাবাদ থেকে প্রতিহংসা ছড়ায়ে ক্ষুধা, রক্তপাত ব্যাপকহারে বীভৎস রূপ লাভ করে।[২৪]

২২. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ৪২।

২৩. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ২০১।

২৪. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

الست جوعان ياجنو؟
كلانى احارب البوش-
فقالت جدته فى تحمس:
نعم : قاتل البوش ياجانوا ولايبْق منهم
احداً على وجه الارض---

"বুশদেরকে হত্যা কর, যেন একজন বুশও পৃথিবীতে জীবিত না থাকে।"[২৫]

البوش؟ من هم البوش؟
فابتسمت العجوز وقال:
هم الألمان! نحن عامة الفرنسيين نطلق عليهم هذاالاسم

নায়ক চিন্তা করলেন- তা হলে কি প্রতিটি ফরাসী মা - তার শিশুকে জার্মানদেরকে ঘৃনা করতে শিক্ষা দেয়! হয়তোবা প্রতিটি জার্মান মাও তার সন্তানকে ফরাসীদেরকে শত্রু ভাবতে শিক্ষা দেয়![২৬] তারপর নায়ক আরও মন্তব্য করে বলেনঃ

اليس فى كل فرنسا امهات يلقن اطفالهن كراهية الألمان
ومن يدرى؟ ---
لعل كل نساء المانيا يعلمن اطفالهن كذالك بغض
الفرنسيين باى حق تستطيع ام ان تنشئ ولداً على
العداوة والبغضاء -

কোন্ অধিকারে মায়েরা শিশুদেরকে হিংসা ও শত্রুতা শিক্ষা দেয়।

২৫. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ২৭।
২৬. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

উসফূরুন উপন্যাসে নায়ক প্রেমে ব্যর্থ হন প্রাচ্যদেশীয় জড়তার কারণে। এই উপন্যাসের প্রেম এবং আওদাত আল-রূহ উপন্যাসের প্রেম বাস্তব সত্য বলে তওফীক আল-হাকীম তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের "আদীব" উপন্যাসের সাথে উসফূর মিন আল-শারক এর সংক্ষিপ্ত তুলনা করা যেতে পারে।

"আদীব" উপন্যাসে নায়ক আদীব তথা ত্বাহা হোসাইন নিজে, আর উসফূর উপন্যাসে মুহসিন নামে তওফীক আল হাকীম নিজে নায়ক। দু'নায়কই মিসরীয় যুবক। দুজনই উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন। প্যারিসে গিয়ে তারা পরিবর্তিত হয়েছেন। চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনে তারা ছিলেন ভিন্নতর। আদীবের নৈতিক পরিবর্তনের কারণে উচ্ছৃংখল হয়ে প্যারিসেই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। পরিণামে প্যারিসেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আসলে আদীবের মৃত্যু ছিল নিজের নাচ ভুলে গিয়ে অন্যের নাচ রপ্ত করতে যখন ব্যস্ত হয় তখনই নেমে আসে তার করুণ মৃত্যু। এ কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। বিদেশী যৌবনবতী এবং রূপবতী নারীর প্রেম-আগুনে পুড়ে অপরিনামদর্শী এবং বিবেকহীন পতঙ্গ যুবক কিভাবে ধ্বংস হয় এরই নিখুঁত চিত্র আঁকলেন ত্বাহা হোসাইন আদীব উপন্যাসে। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ এবং বর্ণনা কৌশল উপন্যাসটিকে করেছে রসাত্মক এবং শিক্ষণীয়। যে কোন দেশের বিদেশ যাত্রী তরুনদের জন্য বইটি গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে।

মুহসিন চরিত্রে তওফীক ছিলেন নিজের সমাজের প্রতি আস্থাশীল এবং দরদী। প্যারিসের সংগীত নাটকে তিনি আকৃষ্ট হলেও নিজের জাতিসত্বা ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতাকে তিনি ভুলে যাননি, তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন মিসরীয় সমাজে, ফরাসী সমাজে নয়। উপন্যাসের শিল্প চরিত্র, রচনাশৈলীর অনেক মিল থাকার পরেও শ্রেণী চরিত্র ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

চরিত্র নির্মাণে ত্বাহা হোসাইন যেখানে নায়কের লাশের উপর রচনার মূল বিষয়কে বিজয়ী করে পতাকা হাতে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে তওফীক বিজয়ী বেশে প্রাচ্যের প্রকৃতিও মানবতার গান গেয়ে প্যারিসের বন্ধুকে মাতোয়ারা করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন।

ما أحسن تعبير توفيق

Dhaka University Institutional Repository

হিমার আল-হাকীম (জ্ঞানী গাধা)ঃ

'আমি' নামে তিনি নায়ক। তিনি কখনো সে বা তওফীক হননি। বরাবরই 'আমি' ছিলেন। কায়রোর সেলুনে চুল দাড়ী কাটতে যাওয়ার পথে তিনি একটি সুন্দর গাধার বাচ্চা ক্রয় করেন। হোষ্টেলে এনে একে রাখতে ও পালন করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যাও হয়েছিল। এটি ছিল খুব কম বয়সি শাবক। দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত গরীব কৃষক হয়ত বাধ্য হয়েই এ দুধের শাবকটি বিক্রী করে দিয়েছিল। এক মহিলার সহযোগীতায় বাজার থেকে কৌটার দুধ এনে বাচ্চাটিকে খাওয়ানো হচ্ছিল। এটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর এর নাম রাখা হয় "ফিলোসফার" দর্শকের মন কেড়ে নিত ফিলোসফার।

সে সময় একদিন হোষ্টেলে নায়কের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে আসেন ফরাসী সিনেমা কোম্পানীর এক প্রতিনিধি। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজে জড়িত ছিলেন। কয়েকটি ফরাসী ও ইংরেজী গল্পে মিসরীয় গ্রামীণ জীবন চরিত্র ছিল। তাই মিসরের গ্রামে এ ছবির সুটিং করার জন্য এ কোম্পানী কায়রোতে এসেছে। নায়ককে তাদের এ সিনেমা নির্মাণের অন্যতম অভিনেতা হিসেবে বিশেষভাবে সংলাপে কণ্ঠ দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর আর্থিক লেনদেনসহ বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বেশ দর কষাকষি হয়েছিল। যাহোক অন্যান্য চিত্রশিল্পী ক্যামেরাম্যান পরিচালক প্রযোজক ও কারিগরী সামগ্রীসহ নির্ধারিত দিনে তারা মিসরীয় গ্রামের পথে রওয়ানা করেন। সাথে নিয়ে যান নায়ক তার প্রিয় গাধার শাবকটিকে।

গ্রাম থেকে গ্রাম, দূর থেকে দূর আরও দূরে বন বনানী পাহাড় নদী-পেরিয়ে তাদের সফর চলছে। গ্রামীণ জীবন, কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র শিশু ও বালক বালিকাদের দৌড়াদোড়ী ভীড়সহ বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা আছে নায়কের বর্ণনায়। একই সাথে চলেছে সিনেমার স্যাটিং। গ্রামের জনসাধারণের সাথে মিশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিকতা সহ অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। অনেক কিংবদন্তি ও ভৌতিক গল্প সহ কৃষকদের জীবনের অনেক হাসি কান্নার চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ চিত্রিত হয়েছে তাওফীকের শিল্প তুলিতে।

Dhaka University Institutional Repository

পশুপাখী বাহন হিসেবে গাধা ঘোড়া এবং গাড়ীর বিবরণও পাওয়া যায়। পরিচালক, প্রযোজক শিল্পী অভিনেতা-অভিনেত্রী কলাকৌশলীদের পারস্পরিক আলোচনা স্থান পেয়েছে কাহিনীর বিরাট অংশে। এসব আলোচনার মধ্যে চুক্তিভঙ্গ স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার অর্থের লোভসহ বিভিন্ন চরিত্র ও বিষয় সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। বস্তুতঃ এটিই ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। গ্রামীণ সফরের শেষ পর্যায়ে নায়কের গাধার বাচ্চাটি মারা যায়। গাধার মৃত্যুতে নায়ক যে দুঃখ ও মন্তব্য প্রকাশ করেন তা দিয়েই উপন্যাসে শেষ চিত্র অংকিত হয়েছে এবং নামকরণের যৌক্তিকতাকেও তুলে ধরা হয়েছে।

তওফীক আল-হাকীম বলেনঃ এ ক্ষুদ্র নগন্য ঘৃণীত প্রানী যাকে আমরা নাম দিয়েছি গাধার বাচ্চা প্রকৃত পক্ষে এ এক সম্মানিত সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আমরা যাদেরকে নেতা, বড়লোক, তারকা বলে নামকরণ করেছি প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতারক, এরা আমাদের মাথার উপর সওয়ার হয় (আর গাধা আমাদেরকে পিঠে বহন করে)। আসল ব্যাপার হচ্ছে এ গাধার শাবকের প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। যে ভালবাসা ছিল আবেগমুক্ত ও উত্তেজনাহীন। আমি এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করি যে, এ গাধার শাবকটির পিঠে সওয়ার হওয়ার পূর্বেই সেটি মারা গিয়েছে, কারণ তার পিঠেই সওয়ার হওয়াটি হতো আমার জন্য লজ্জা জনক (যেখানে আমি প্রতারকদেরকে নিজের মাথায় বহন করি সেখানে পরোপকারী এ গাধার পিঠে আমি কোন যুক্তিতে উঠব)। নিশ্চয়ই আমি শুনতে পাচ্ছি মহাকালের করুণ আর্তনাদ- "আমি কি ন্যায় বিচার পাব"। আমি গভীর সাগরে পতিত হচ্ছি আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি মূর্খ আর আমার বন্ধু সে তো গন্ড মূর্খ[২৭]।

ان هذا الشئ الحقيرالذى سميناه جحشًا هوفى نظرا
لحقيقة العليا مخلوق يثيرالاحترام، فى حين ان كثرًا ممن
سمينا هم زعماء وعظماء فركبوه ولم يبصروالغرور
وهو يركب رؤو سهم هم فى تظرالحقيقة العليا مخلوفات
تثيرا لسخرية! نعم لقدكنت اشعردائما شعورًا غامضًا
ان حبى لهذا الجحش هوحب مقترن بشئ اخر غير
العطف والاشفاق انه التقدير والتبجيل احمدالله انه
مات قبل ان يكبر فيركب انى كنت اخجل من ذالك، ---
ايها الزمان متى تنصف، ايها الزمان فاركب فا ناجاهل
بسيط واما صاحبى فجاهل مركب

২৭। তওফীক আল-হাকীম, হিমার আল-হাকীম, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

'হিমার আল-হাকীম' একটি সামাজিক উপন্যাস। নারী প্রেমের উল্লেখযোগ্য চিত্র এ উপন্যাসে নেই কিন্তু এর বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে সমাজের সংস্কৃতিবান প্রগতিশীল শ্রেণীর কার্যক্রম ও সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে। চল্লিশের দশকে রচিত এ উপন্যাসটি ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। এই উপন্যাসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তওফীক ছিলেন একজন সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, প্রতিকূল অবস্থা বা বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রে বেপরোয়া ব্যক্তিত্ব। শিল্প থেকে মানুষ বড়- হিমার আল- হাকীমে তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন।

তওফীক আল-হাকীমের এ উপন্যাসটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। সাধারণতঃ উপন্যাসের বিষয়ের সাথে এখানে কিছুটা যেন গরমিল আছে। আসলে এটি গল্পের পিছনের গল্প উপন্যাসের ভিতরে উপন্যাস। সিনেমা নাটকে সুন্দর কাহিনী সুন্দর ছবি দর্শন বা শ্রোতার নিকট পেশ করা হয়। বিষয়ের প্রতি দৃশ্য চরিত্রের প্রতি দর্শন নিজেকে ভাবতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়। অভিনেতা অভিনেত্রী নায়ক নায়িকা তথা শিল্পীদের প্রতি তাদের দরদ ভক্তি আস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ দৃশ্য কিভাবে হলো। সিনেমার পর্দায় বা টিভির পর্দায় এলো সেখানেও থেকে এক নাটক চমকপ্রদ গল্প উপন্যাস যা অনেকাংশে অন্ধকারে রয়ে যায়। এখানেও সংঘাত আছে বঞ্চনা আছে নির্যাতন আছে। শিল্পীর অভিনেতার মিষ্টি চেহারা বা মেকআপের পিছনেও কিছু চিত্র আছে। অনেক শিল্পী এ পথে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছে নিঃগৃহীত হয়েছে আত্মহত্যা করেছে এমনকি নিহতও হয়েছে। দু'চারটি ঘটনা জানাজানি হলেই শুধুমাত্র দর্শক ও শ্রোতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন কিন্তু নিত্য দিনের অনেক কিছু আছে যা প্রকাশ পেলে আমরা যাদেরকে মডেল বা তারকা ভাবি যাদেরকে শিল্প সংস্কৃতির ধারক বাহক পৃষ্ঠপোষক মনে করি ঘৃণায় তাদের মুখে কালিমা লেপে দেব।

তওফীক আল-হাকীম এখানে এমন কিছু চিত্রই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। যেহেতু তিনি নাট্যকার ছিলেন মঞ্চ নাটক সিনেমার সাথে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। এখানে বিভিন্ন পেশার লোকদের আনাগোনা ও বর্ণচোরা লোকদের তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এ উপন্যাসে তাই তিনি গাধাকে জ্ঞানী বলেছেন যে শুধু পরের উপকার করতে জানে। স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, নির্যাতন সে করেনা। অথচ সভ্য মানুষ শুধু নয় যারা নিজেদেরকে সমাজের সংস্কৃতিবান,

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবি নেতা বলে দাবী করে তাদের চরিত্র যদি এমন হয় তা হলে তারা জ্ঞানী নামে আখ্যায়িত হতে পারে না। বরং জ্ঞানী হচ্ছে এ গাধা। তওফীক আল-হাকীম এ উপন্যাসে নায়কের নাম না নিয়ে 'আমি' শব্দে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের পুরো কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু নাটকের চলচ্চিত্ররূপ নির্মাণে তওফীক নাট্যকার হিসাবে জড়িত ছিলেন। তাই ধরে নেয়া যায় তার অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এখানেও তিনি ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহের খন্ড চিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। "আল-আইয়্যামে" ত্বাহা হোসাইন 'সে বালক' বলে নিজেকে বুঝিয়েছেন আমি বলে কোথায়ও প্রকাশ করেননি। আল রাবাত আল-মুকাদ্দাসে তওফীক স্বামী-স্ত্রী লেখক, এখানে নায়ক নায়িকা বা অন্য চরিত্রের নামকরণ করেছেন কোথায়ও এদের নাম উল্লেখ করেননি। ইয়াওমিয়াত উপন্যাসেও তিনি নায়ক হিসাবে আমি উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন এক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ত্বাহা তার উপন্যাসে নায়ক নায়িকার নাম উল্লেখ করেছেন। হিমার আল হাকীম উপন্যাসে তওফীক বিভিন্ন ঘটনা বলার ফাঁকে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু আলোচনাও করেছেন শিল্প সাহিত্যর কিছু দর্শনও তুলে ধরেছেন। তওফীক বলেন.....[২৮]

ان قلب الفنان وقلب المرأة سيان كلاهما كنز مسحور ان لم يفتح من تلقاء نفسه ---

শিল্পী আর নারীর হৃদয় রহস্যময় যাদুর খনি। এই খনি ইচ্ছাকৃত তারা উন্মুক্ত না করলে সামনের বন্ধুর পথ অতিক্রমকারীকে সামনের অনেক কিছুকে জ্বালিয়ে দিয়ে এগুতে হয়[১৭]।

এ উপন্যাসেও তিনি কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন তবে তা গ্রামের জনসাধারণের সাথে আলাপের চরিত্রে বর্ণিত হয়েছে। আওদাত আল-রূহ এর তুলনায় এখানে আঞ্চলিক শব্দের

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার খুবই সীমিত। প্রথম অধ্যায়ে আঞ্চলিক শব্দ দেখা যায়। ত্বাহা হোসাইন আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার শুধু পরিহারই করেননি বরং আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারকে তিনি রমনীর কুষ্ঠ রোগের শ্বেতি দাগ বলে উল্লেখ করেছেন।

'হিমার' উপন্যাসে কোম্পানীর লোকদের আর্থিক নোংরামীর কথা উল্লেখ করে তওফীক বলেনঃ.......[২৯]

وعند ئذ شعرت بسلطان المال وادركت ان المال قدير
احيانًا على تقرير مصير الأشياء حتى فى سائل الأدب
والفكروالفن

"তখন আমি বুঝলাম অর্থের ক্ষমতা কত বেশী। অর্থ কখনো সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশীল হয়। আবার কখনো সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কলা সবকিছুর উপরই অর্থ প্রাধান্য বিস্তার করে"[১৮]।

রচনাশৈলীর দিক দিয়ে এবং উপস্থাপনার কৌশলের দিক বিবেচনা করলে ত্বাহা হোসাইনের আল ওয়াদ আল-হক্ক উপন্যাসের সাথে একে তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে তিনি ইতিহাসকে কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আর এখানে করেছেন অর্থ ও স্বার্থপরতাকে। তাওফীকের এ উপন্যাসে সে কথাই যেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অর্থই সকল অনর্থের মূল। হিমার উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের শিল্পে বিভিন্ন চিত্র নির্মান করলেও সমাজের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিজীবি বলে পরিচিত জনেরা তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে বলে উপন্যাসটির সমালোচনা করেন। সংস্কৃতি কর্মীদের চরিত্রহননের মাধ্যমে তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে অনেকে এই উপন্যাস ও তাওফীকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন।

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসে তওফীক আবেগ বিবর্জিতভাবেই তার কাহিনী বলে গেছেন। রোমান্স না থাকলেও সাবলীল বর্ণনাধারায় তিনি তার বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে পাঠকের নিকট পেশ করতে পেরেছেন। সকল বিষয়কে আরবী কথ্য সাহিত্যে তুলে ধরা পশ্চাৎপদ আরবী কথা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত তওফীক প্যারিস থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঘোষণা করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় ভিন্ন স্বাদের এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কথা সাহিত্যিক হিসেবে উপন্যাসিক তওফীক আল-হাকীম সার্থক। পরিমানের দিক দিয়ে তাওফীকের এ উপন্যাসটি ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের মত। কেননা এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১৬৪ যা ত্বাহা হোসাইনের বেশীরভাগ উপন্যাসের মত।

হিমার আল-হাকীমে সামাজিক জীবনের সাথে অর্থনৈতিক জীবনও আলোচিত হয়েছে। অর্থের লোভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৈতিক ও মানবিক বিষয়াবলী ফুটে উঠেছে। পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দিকও চিত্রিত হয়েছে। কেননা উপন্যাসিক নেতাদের চরিত্রকে তুলে ধরে তাদের ভূমিকাকে মানবিক পেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। পশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার দৃশ্য এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উপন্যাসেও তওফীক পাঠককে গ্রামে ও প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে গেছেন।

'আওদাত আল-রূহ্ (আত্মার প্রত্যাবর্তন)ঃ

আওদাত আল-রূহ্ তওফীক আল হাকীমের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নায়ক মুহসিন, মুহসিনের বাড়ী মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া প্রদেশের বুহাইরা জেলায়। দেমানহুর থানার দালেন্দজাত গ্রামে। পিতা তাকে দেমানহুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। বাড়ি থেকে দেমানহুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কয়েক মাইলের পথ। ঘোড়ার গাড়ীতে মুহসিন যাতায়াত করে। সে ছিল আবাসিক ছাত্র। প্রতি সপ্তাহে এবং ছুটির সময় বাড়ীতে আসা হয়। কখনো মা নিজেই ঘোড়ার গাড়ীতে করে ছেলেকে দেখতে স্কুলে চলে যেতেন। মা কৃষক সমাজের কৃষক পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে মেয়েদের সাথে তাকে মিশতে দিতে রাজী ছিলেন না। মা কৃষকদেরকে পছন্দ করেন না। মায়ের এ বিষয়টি মুহসিনের কখনও ভাল লাগেনি। বিদ্যালয়ে বন্ধুদের থেকে তার জামাকাপড় পোষাক ভাল এজন্য সে নিজে নিজে লজ্জিত হত। তার জন্য নিজেদের পারিবারিক ঘোড়ার গাড়ী আসে পিতা মাতা তার জন্য অধিক যত্ন নেন এসবে সে গ্রামের বন্ধুদের থেকে কিছুটা যেন পৃথক এ বিষয়টি এ ছোট বয়সেও তার ভাল পছন্দ হয়নি। বরং নিজে গ্রামে দশজন বন্ধুর মত একজন হিসেবেই থাকতে পছন্দ করে।

বালক নায়কের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তাকে পিতা রাজধানী কায়রোতে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কায়রোতে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র মুহসিন। এখানে আছেন তার এক চাচা যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট এক চাচা, যিনি প্রকৌশল কলেজের ছাত্র। তাদের সাথে থাকেন মুহসিনের এক ফুফী নাম যনূবা। সম্পর্কীয় সেলীম নামের অন্য এক চাচাও থাকেন, পাচঁজন এক পরিবারের সদস্য হিসেবে একটি বাসাতে থাকেন, একটি কাজের ছেলেও রয়েছে।

মুহসিন স্কুলে যায়। স্কুলের বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা আড্ডা পড়াশুনা ও শিক্ষক প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনার বর্ণনা আছে। পাশের বাড়ীর ডাক্তার কন্যা সুন্দরী যুবতী সানিয়্যা। ফুফীর সাথে প্রথমে বাড়ীর ছাদে সানিয়্যার সাথে পরিচয় হয়। এ পরিচয়ের সূত্র ধরে মুহসিনের সাথে সম্পর্ক। মুহসিন সানিয়্যার সংগীতের শিক্ষক হিসেবে তাদের বাসায় প্রথম প্রবেশ করে। ভাব বিনিময় সংগীতের সুর তাল বিনিময়, এভাবে মনের আদান প্রদান এমন কি রুমাল বিনিময় এভাবেই গভীর প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হয়। এ প্রেম চলেছে ৫১৬ পৃষ্ঠার উপন্যাসের ৫০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। জীবনের প্রথম প্রেম আবেগভরা স্বপ্ন জড়ানো হয়। পরবর্তী জীবনেও তাওফীকের বিভিন্ন সাহিত্যে জীবনের প্রথম প্রেমের নারীর কথা স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। মুহসিনের প্রেমের বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও অবহিত ছিলেন তবে নায়কের জীবনে এটি এত গভীরভাবে রেখাপাত করবে তা কিন্তু তারা অনুমান করেনি, কেননা নায়িকার বয়স নায়ক থেকে দু'বছর বেশী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সানিয়্যার পিতা ডাঃ হিলমী সামরিক বাহিনীর ডাক্তার ছিলেন। সুদানে সামরিক বাহিনীর সাথে দীর্ঘদিন চাকুরি করেছেন। চিকিৎসা জীবনের কিছু স্মৃতি চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকার জঙ্গলে বাঘ ও হরিণ সিংহসহ পশু শিকারের রোমাঞ্চ গল্পের চরিত্র আকর্ষণীয়ভাবে চিত্রিত হয়েছে। নায়ক নায়িকার প্রেম চরিত্র, মান-অভিমান সবশেষে বিরহ ও বিচ্ছেদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ফুফীর সাথে মুহসিনের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল, ফুফীর বয়স মুহসিন থেকে একটু বেশীই ছিল। যে বয়সে মিসরের গ্রামীণ মেয়েদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার কথা, সে বয়স পেরিয়ে গেলেও যনূবার বিবাহ হয়নি। এ ব্যাপারে মুহসিন বড় চাচা হানাফীকে কিছুটা দায়ী করেছে। যনূবা দেখতে তেমন সুন্দরী ছিলনা। তেমনিভাবে স্কুলের মেধা পরীক্ষায়ও সে পাশ করতে পারেনি। এসব কারণে যে ধরণের পাত্র আসত চাচা তাদেরকে গুরুত্ব দিতেন না বরং তিনি আরও ভাল পাত্র আশা করতেন কিন্তু তার বোন পাত্রীর যোগ্যতার প্রতি সঠিক মূল্যায়ন করেননি। এক সময় বিবাহের প্রস্তাব আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে তার বিবাহের আলোচনা স্তিমিত হয়ে যায়। যনূবার জীবনে হতাশা দেখা দেয়। হতাশা থেকে রুক্ষতা বা প্রতিহিংসার মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

পীর ফকীরের দরবারে ঘুরে কথিত আধ্যাত্মিক সাধকদের তাবীজ কবজ সংগ্রহ করেও তেমন ফল পাওয়া যায়নি। পাশেই থাকত মোস্তফা বেগ নামে এক যুবক ডাক্তার। তার সাথে সম্পর্ক পাতানোর অনেক চেষ্টা করেও মোস্তফাকে যনূবা তার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়নি। যুবতী বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা একে একে ভেঙ্গে পড়তে দেখে সানিয়্যার প্রতি কিছুটা প্রতিহিংসা দেখা দেয়। এখানেই নায়ক নায়িকার প্রেমের কালো অধ্যায়ের সূচনা। একসময় সানিয়্যা ও তাঁর পিতা মাতার সাথে যনূবার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। এজন্য পিতা মাতা কোনভাবেই দায়ী ছিলনা। যনূবা তাদেরকে কটু কথা শুনায় এবং রুক্ষ ব্যবহার করে। তারা খুব মনঃক্ষুণ্ন হন। মেয়েকে বিষয়টি অবহিত করেন। প্রেমিক প্রেমিকা বেকায়দায় পড়ে যায়।

ছুটির সময় মুহসিন রেলযোগে গ্রামে বাড়ীতে পিতা মাতার নিকট চলে যেত। একমাত্র সন্তান হিসেবে পিতা মাতা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করত সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে। খাদেম বেষ্টিত অবস্থায় মুহসিন ঘোড়ার গাড়ীতে করে দেমানহূর রেল ষ্টেশন থেকে গ্রামের বাড়ী পৌছত। তার জৌলুস জীবনের এ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র সে সানিয়্যাকে দেখ বার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সে স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবায়িত হয়নি। তারুণ্যের এ ধরনের রঙ্গীন স্বপ্ন, তাঁকে বিভিন্ন শিল্প কর্মে শিল্পমন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। গ্রামের বন্ধু-বান্ধব ও কৃষক সমাজের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে আবার কায়রোতে চাচাদের নিকট চলে আসতেন, লেখা পড়ায় মন দিতেন, কবিতা, গল্প ও নাটকের বই আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন।

সানিয়্যার সাথে দীর্ঘ দিন ভাল সম্পর্ক থাকার পর কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে প্রেমিকের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। পাশের যুবক মোস্তফা পূর্ব থেকে ওৎ পেতে ছিল এবার তার ফাঁদে শিকার গিয়ে ধরা দেয়। সানিয়্যা ঝুঁকে পড়ে মোস্তফার প্রেমে। মোস্তফা ছিল নবীন ডাক্তার, যুবক বয়সে বিবাহের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। সংক্ষিপ্ত প্রেমের নাটকের পর অভিভাবক মহলে বিবাহের প্রস্তাব সম্মানজনক ভাবে গৃহীত হয় এবং বিবাহের দিন কালও ঠিক হয়।

এ সময় ছিল ১ম মহাযুদ্ধের শেষ দিকের কথা। মিসরে বিশেষ করে কায়রোতে তখন রাজনৈতিক বিশৃংখলা চলছে। গণআন্দোলনে মিসরীয়রা জড়িয়ে পড়ছে। দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজ করেছে। পথে পথে বৃটিশ সৈনিকেরা টহল দিয়ে ফিরছে। মাইকিং করে লোকদেরকে সর্তক করা হয়েছে। সন্দেহভাজন লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এমনি প্রেক্ষাপটে একদিন মুহসিন পরিবার বন্দী হয়ে জেলখানায় একই কামরায় নীত হয়। শুধুমাত্র মহিলা হওয়ার সুবিধায় যনুবা গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা পায়। যনুবা বাড়ীতে খবর পাঠায় এবং নিজেও একাকী থাকা নিরাপদ নয় প্রয়োজনও নেই ভেবে গ্রামে চলে যায়। পিতা মাতা খুব শংকিত ও চিন্তিত হন। মা দস্তুর মত বিলাপ শুরু করেন। কায়রোতে ছেলেকে চাচাদের কাছে থাকার সুবিধে বলে রাজধানীতে পড়ানোর সিদ্ধান্তের জন্য স্বামীকে তিরস্কার করেন। যদিও তিনি জানেন যে, দেমানহুরে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিলনা।

পিতা ছুটে আসেন কায়রোতে। খোঁজ খবর নিয়ে জেলখানায় ছেলের সাথে দেখা করেন। ইতিমধ্যে একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারের সাথে পিতার পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে আলাপ হয়েছে। তিনি পিতাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, মুহসিনের কম বয়স বলে তাকে মুক্ত করা যাবে। কিন্তু সাক্ষাতে মুহসিন চাচাদের ছেড়ে একলা মুক্তি পাওয়া অপছন্দ করে বলে পিতাকে জানায়। শেষে

Dhaka University Institutional Repository

মুহসিনের বিষয়টিও জটিল হয়ে যায়। সামরিক অফিসারটির প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর তিনি ভিন্ন একটি বুদ্ধি বের করে সবাইকে হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এখানে তারা কিছুদিন ভাল ভাবেই ছিল। তারপর একসময় সবাই একসাথে মুক্তি পায়। যেদিন তারা মুক্তি পায় সেদিনটি ছিল সানিয়্যা ও মোস্তফার বিবাহের দিন।

"আওদাত আল-রূহ" তওফীক আল-হাকীমের সর্ব প্রথম উপন্যাস এবং সর্ববৃহৎ রচনা। ৫১৬ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি দুই খন্ডে বিভক্ত। ১ম খন্ডে ২৬৯ পৃঃ ও ১৮ টি অনুচ্ছেদে প্রথম খন্ড বিভক্ত। ২য় খন্ডে আছে ২৪৭ পৃষ্ঠা অনুচ্ছেদ আছে ১৬ টি। রচনা কাল ১৯২৭ খৃ. স্থান প্যারিসের গামবাতা। প্রথম প্রকাশিত হয় কায়রো থেকে ১৯৩৩ খৃ. সালে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ. সালে প্যারিস থেকে। প্রথমে তওফীক এটি ফরাসী ভাষায় রচনা করেন তার পরে আরবী ভাষায় লেখেন[৩০]। রুশ ভাষায় ইহা অনূদিত হয়ে লেলিন গ্রাড থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃ. সালে। লন্ডন থেকে এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খৃ. সালে।

আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তাওফীকের এই উপন্যাস উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এর পূর্বে এত বৃহৎ ও পূর্নাঙ্গ উপন্যাস আরবী সাহিত্যে রচিত হয়নি। ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর একে সমসাময়িক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন[৩১]। এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খৃ. সালে ইতিমধ্যে ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এত অল্প সময়ে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হওয়া ও বার বার সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা ও শিল্প গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর কথা সাহিত্যিক হিসেবে তওফীকের স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সাহিত্য জগতে সাড়া পড়ে যায়। কথা সাহিত্যে আরবী ভাষা পিছিয়ে আছে বলে দীর্ঘ দিন থেকে যে কথা চলে আসছিল সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে সে কথা সম্ভাবনার এক ধাপ এগিয়ে যায়। কথা সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পীরা তাদের শিল্প কর্মের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা পান।

---

৩০. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৩৮৯।
৩১. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক তার উপন্যাসে আত্মজীবনীকে ভিত্তি করে ইউরোপীয় কথা সাহিত্য বিশেষ করে ফরাসী ও রুশ কথা সাহিত্যিকদের অনুকরণে এই উপন্যাস রচনা করেন।

১৯১০ খৃ. সালে বিশ্ববিখ্যাত রুশ কথা সাহিত্যিক টলস্টয় মারা যান। ইউরোপ যখন টলস্টয়ের কথা সাহিত্যের জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন ১৯২৪ খৃ. সালে তওফীক প্যারিসে এই সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। উসফূর মিন আল-শারক উপন্যাসে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাওফীকের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট বুঝার জন্য উসফূর উপন্যাসটি অন্যতম সহায়ক।

আওদাত উপন্যাসে বিষয় বস্তু হিসেবে তিনি সাধারণ বিষয়কে বেছে নেন্ এ উপন্যাসে তার কথা সাহিত্যের শিল্পই ছিল মূখ্য বিষয়। বর্ণনার ধারায় তিনি শব্দ ও বাক্যের মাধুর্যতা মিলিয়ে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাবে কাহিনী চিত্রিত করেছেন। তার পরবর্তী উপন্যাসে তিনি শিল্পের দিকে এতটা সচেতন থাকার প্রয়োজন মনে করেননি বরং বিষয় বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি উসফুর মিন আল-শারক 'আল-বারাত আল-মুকাদ্দাস' সহ অন্যান্য উপন্যাস রচনা করেছেন। গ্রামীণ জীবনের বৈশিষ্ট্য, গ্রামীণ জীবনের চিত্র তিনি অনুপম ভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রামের কৃষক পরিবার কাঁচা ঘরে সবাই থাকে অনেক সময় তারা একই কক্ষে যা একটি হল ঘরের মত তাতে পরিবারের সকল সদস্য এমনকি পালিত পশুও থাকে। একদিনের একটি দৃশ্যের বর্ণনা তিনি এভাবে দিচ্ছেনঃ[৩২]

فدخل مترددًا وجعل ينظرالى المكان فراى رحبة صغيرة مغطى نصفها بسقف من حطب القطن --- غيران مادهش محسن انه شاهد بجانب هذا العجل الرصيع طفلاً رصيعا ايضا لعله ابن اصحاب الدار وهو يزاحم العجل ويدافعه علي ضرع البقرة ساكنة هادئة لاتمنع هذا ولاذاك وكانه لاتفضل احدهماعلى الاخركانما العجل والطفل كلاهما والداها ---

৩২. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

এক কৃষকের বাড়ীর উঠানে তিনি পৌছলেন। বাড়ীর ঘরের ছাদ এক অংশ খড়ের বাকী অংশ কাঠের। হঠাৎ তার দৃষ্টি ঘরের অভ্যন্তরে পড়ল। একটি হল; পরিবারের লোকদের ঘুমাবার স্থান। ঘরের বা হলের দরজা খোলা ছিল। ভিতরে যে দৃশ্য দেখা গেল তা ভুলবার মত নয়।

ঘরের হলে কয়েকটি ছাঁটাই পাতা বিছানা রয়েছে। একটি বিছানার সামনে একটি গাভী। গাভীর ছিপনের দু'পায়ের এক পাশে এক বাছুর গাভীর স্তন্য থেকে দুধ পান করছে। একই সাথে অবাক দৃশ্য দেখা গেল- পায়ের অপর পাশে একটি শিশু খুব সম্ভব সে এই ঘরের শিশুই হবে, গাভীর স্তন্য থেকে একই সাথে দুধ চুষছে। গাভীটি শান্তভাবে দাড়িয়ে আছে। গাভীটি একাজের কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করছেনা। যেন বাছুর ও শিশু দু'টিই তার সন্তান, আর সে দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য করছেনা[৩৩]।

কায়রোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনের একটি দৃশ্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে। জোহরের বিরতীর পর ক্লাসের ঘন্টা বাজল। ছেলেরা ৬ষ্ঠ ঘন্টার জন্য প্রস্তুতি নিল। পুনরায় ঘন্টা বাজলে সবাই ক্লাসে প্রবেশ করল। দাঁড়ীওয়ালা বৃদ্ধশিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলেন। নিয়ম মাফিক শিক্ষকের সম্মানে সবাই দাঁড়াল, শিক্ষক বসার পর সবাই বসল। শিক্ষক প্রথমে সবার প্রতি একবার নজর দিলেন। তারপর হাযিরা খাতা খুলে নামগুলো দেখে পুনরায় নামের সাথে ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য করলেন। ছাত্ররা অস্থিরতা প্রকাশ করছিল কেননা রচনার ক্লাস হিসেবে কার নাম ডাক পড়ে এই ভয়। অনেকের ধৈর্য্য কাজ করছিল। অবশেষে শিক্ষক মুহসিনের নাম ডাকলেন তাকে বোর্ডের নিকট যেতে বললেন।

মুহসিন! একটি বিষয় ঠিক করে বোর্ডে লিখ। তারপর সে বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। মুহসিনের মাথায় হাত পড়ল। অনেক চিন্তা করেও কোন বিষয় ঠিক করতে পার ছিল না। কিছুক্ষণ

---

৩৩. তওফীক আল-হাকীম, আল-আওদাত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়ে থাকার পর সাহস করে চিন্তা করে একটি বিষয় লিখল। বিষয়ঃ ভালবাসা-। ক্লাসের সবাই চিৎকার করে উঠল, শিক্ষক সবাইকে শান্ত করলেন.....[৩৩]

ينقسم الحب الى ثلاثة اقسام :

(١) حب اللّه عزوجل وهوحب الخشووع والاعتراف الفضل-

(٢) حب الوالدين- وهوحب الدم-

(٣) وحب الجمال وهوحب القلب- ----------

এবার মুহসিন লিখলঃ ভালবাসা তিন প্রকার-

১. মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য ভালবাসা, এটি হচ্ছে বিনয়ের এবং মর্যাদার স্বীকৃতির ভালবাসা।

২. পিতামাতার প্রতি ভালবাসা- এটি হচ্ছে রক্তের ভালবাসা।

৩. সুন্দরের প্রতি ভালবাসা- এটি হচ্ছে অন্তরের ভালবাসা।

শিক্ষক ভালবাসার প্রথম দুইটি ব্যাখ্যায় একমত পোষণ করলেন। তৃতীয় প্রকার ভালবাসার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ না করলেও ঐক্যমত প্রকাশ করেননি[৩৪]।

'আওদাত উপন্যাসে তিনি প্রেমের দৃশ্য চিত্রিত করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি আবেগকে প্রাধান্য দেননি। সানিয়্যার সাথে নায়কের দীর্ঘ দিন প্রেম যখন ভেঙ্গে পড়ল নায়ক নায়িকা বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছেন, যদিও মন মানতে চায়নি এখানে নায়ক নায়িকা বুদ্ধি বিবেক

---

৩৪. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ বাস্তবতার সীমাকে বিবেক দিয়ে মূল্যায়ণ করেছেন শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে নয়। অন্যান্য উপন্যাসেও তিনি প্রেমের চিত্র এভাবেই চিত্রিত করেছেন। ডঃ ত্বাহা হোসাইনের আল-আয়্যাম ও আদীব উপন্যাসের চরিত্রের সাথে আওদাত চরিত্রের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে।

আদীব উপন্যাসে নায়ক তার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে বন্ধন ছিন্ন করেছে শুধু তাই নয় বরং বলা যায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে গ্রামকে নিজের পরিবেশ ও আত্মীয়-স্বজনকে ভুলে গেছে আদীব। তাকে এর নির্মম পরিণতিও ভোগ করতে হয়েছে। আওদাত উপন্যাসের নায়ক গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছে। শহরের শিক্ষা সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেছে কিন্তু গ্রাম কৃষক সমাজ গ্রামের পরিবেশ আত্মীয় কাউকে কোন দিন ভুলে যায়নি। নিজ দেশ ও জাতির বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি কোনটিকেই সে বিসর্জন দিতে রাজী হয়নি। প্রেম হয়েছে, প্রেমের বিরহ হয়েছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার পথে নয়। আদীবের নায়ক নৈতিকতা বিবর্জিত ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পিতামাতাকে পর্যন্ত মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি কিন্তু মুহসিন শুধু পিতামাতা নয় গ্রামের কৃষক পরিবারের বন্ধুদের মলিন চেহারাকেও সহানুভূতির সাথে স্মরণ করেছে। নায়ক মুহসিন তার জীবনে অগ্রগতিসাধন করেছে পক্ষান্তরে নায়ক আদীব পাপের পরিণতিতে জীবনে পরাজিত হয়েছে। জীবনে দুঃখ কষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

আদীব যেমন সাহিত্যিক ছিল মুহসিনও সাহিত্যিক ছিল দু'জনই মিসরের নাগরিক ছিল। মুহসিন প্যারিসে বসে নীল নদের পানি নিয়ে লিখেছে আর আদীব নীল নদ থেকে যাত্রা করে অতলান্তিক সাগরে গিয়ে ডুবে গেছে। আদীবের মৃতদেহ স্বাক্ষ্য দিয়েছে নীল নদই শ্রেষ্ঠ, আর মুহসিনের যুক্তি প্রমান করেছে নীল নদের পানি মিষ্ট। ফরাসীরা মুহসিনের সাহিত্য অনুবাদ করেছে আদীবের সাহিত্য ফরাসীরা মিসরে প্রেরণ করেছে দাফন করার জন্য। চরিত্র ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল তওফীক ও ত্বাহার এক ও অভিন্ন।

ত্বাহা হোসাইন আদীব চরিত্র নির্মাণে মিসরীয় যুবকদেরকে মিসরীয় থেকে ইউরোপীয় শিক্ষা সভ্যতা গ্রহণ করতে বলেছেন। তওফীক মুহসিন চরিত্র নির্মাণে মিসরীয়দেরকে ইউরোপীয় শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে তাদেরকে পরাজিত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ত্বাহা হোসাইনের রচনাশৈলী ও চরিত্র নির্মাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি আদীব উপন্যাসে নায়কের করুণ পরিণতির সাথে সাথে নায়িকার করুণ পরিণতিও চিত্রিত করেছেন যা পাঠকের হৃদয়ে করুণার সৃষ্টি করে কিন্তু তওফীক তার চরিত্র নির্মাণের পথ হিসেবে বরাবরই করুণ পরিণতিকে এড়িয়ে গিয়েছেন এখানেও তিনি নায়ক বা নায়িকার চরিত্রে করুণ চিত্র অংকন না করে বাস্তবধর্মী ও জীবনধর্মী চরিত্রের প্রতি প্রাধান্য দিয়েছেন। আওদাত উপন্যাসে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, ও প্রেমসহ একটি সামাজিক উপন্যাসের পূর্ণরূপ রয়েছে।

তওফীক এই উপন্যাসে মাঝে মধ্যে সংগীতের সংযোজন করে উপন্যাসের চরিত্রকে প্রাণবন্ত করেছেন কিন্তু আদীব উপন্যাসে করুণ পরিণতি দেখিয়ে পাঠককে অশ্রুসিক্ত করা হয়েছে। মুখের হাসি চোখের পানি দু'টিই মানুষের হৃদয়কে প্রফুল্ল করে বিনোদন দেয় তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র ভিন্ন। ভিন্ন স্বাদে নিজস্ব ভঙ্গিতে দুইজনেই পাঠককে বিনোদন দিতে চেষ্টা করেছেন। কেউ শিল্পকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেউ চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক কারণে ১ম মহাযুদ্ধ উত্তর আরবী কথা সাহিত্য তেমন উন্নত ছিলনা, যে কারণে বিশুদ্ধ আরবী শব্দে শিল্পগুণ রক্ষা করে উপন্যাস রচনা ছিল কষ্টস্বাধ্য, এজন্য তওফীক আঞ্চলিক কথ্য শব্দ প্রয়োগ করেছেন ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে আওদাত উপন্যাসে।

ডঃ ত্বাহা হোসাইনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আদীব' আর তওফীক আল-হাকীমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আওদাত আল-রূহ; বা 'আত্মার প্রত্যাবর্তন'[৩৫]। তওফীক আল-হাকীম আওদাত রচনা করেছেন ১৯২৭ খৃ. সালে প্যারিসে বসে। প্যারিসে গিয়ে তিনি নতুন প্রাণ খুঁজে পেয়েছিলেন তাই তিনি মিসরীয় সমাজের বিপ্লব উত্তর (১৯১৯ খৃ.) নব জাগরণের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন তার এই উপন্যাস। এখানেই তার নামকরণের সার্থকতা। এই উপন্যাসের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের বিশেষ করে গ্রামীণ জীবন ও একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র নিখুঁতভাবে তিনি ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন বিদেশী এই উপন্যাসের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের ব্যক্তি পরিবার ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে

---

৩৫. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিকভাবে জানতে পারে এই ক্ষেত্রে উপন্যাসিক হিসেবে তওফীক আল-হাকীম সত্যিই দক্ষতার দাবীদার। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিদেশী ভাষায় 'আওদাত আল রূহ' উপন্যাসের এত অধিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্যারিসে বসে লেখক তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে অন্য কোন বিষয় বেছে না নিয়ে নিজ দেশ, নিজ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের স্মৃতি কথাকে নির্বাচন করার মাধ্যমে তাওফীকের নিজ দেশ ও সমাজের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে যা তার এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়েই জীবন্ত হয়ে চিত্রিত হয়েছে। প্যারিসে বসে রচিত হলেও প্যারিশের অলি গলি পরিবেশ তাকে চরিত্র নির্বাচনে প্রভাবিত করেনি। যা করেছে সেটি হেলা শিল্প গুণ বা টেকনিক। তার সমসাময়িক বন্ধু মুহাম্মদ হোসাইন হাইকেলের যয়নাব, আব্বাস মাহমূদের সারা এবং ডঃ ত্বাহা হোসাইনের আদীব উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রম বিকাশে তিনি এই 'আওদাত আল-রূহ কে স্থাপন করেছেন শীর্ষে। 'আওদাত আল-রূহ্' এর পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে নাজীব মাহফূজের 'ছুলাছিয়্যাত'কে উল্লেখ করা যায়। 'আওদাত' উপন্যাসের যত সমালোচনা গবেষক ও সাহিত্যিকগণ করেছেন আর কোন উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আদীব ও আওদাত দু'টিই সামাজিক উপন্যাস। তবে আদীব উপন্যাসে নায়কের চরিত্রের পরিবর্তন ও অধঃপতন ইউরোপীয় অন্ধ প্রভাব এবং এর কুফল চিত্রিত হয়েছে সার্থকভাবে এখানে ত্বাহা হোসাইন সফল হয়েছেন উপন্যাসিক হিসেবে। আওদাত আল রূহতে নাযকের তেমন পরিবর্তন হয়নি ইউরোপে বসে লিখলেও তার জীবনী ইতিহাস ছাড়া জানার কোন সুযোগ নেই এটি প্যারিসে রচিত, কেননা বিষয়ে বা চরিত্রে ইউরোপের তেমন কিছুই নেই।

শেষ পরিণতিতে ত্বাহা হোসাইন আদীব উপন্যাসে করুণ চিত্র অংকন করেছেন। অসুস্থ আদীব যার মৃত্যুর শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ইউরোপীয় স্ত্রী আদীবের সাহিত্য পান্ডুলিপি প্রেরণ করেছে ত্বাহা হোসাইনের নিকটে। পক্ষান্তরে 'আওদাত চরিত্রে নায়ক তার সঙ্গী সাথীসহ জেলখানায় থেকে যেদিন মুক্তি পান সেটি ছিল তার ব্যর্থ প্রেমের প্রেমিকার সাথে নতুন প্রেমিকের বিয়ের দিবস।[৩৬]

---

৩৬. তওফীক আল-হাকীম, 'আওদাত আল-রূহ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস (পবিত্র সম্পর্ক)ঃ

একজন সাধক লেখক যিনি মানুষ নিয়ে ভাবেন। জীবন নিয়ে বই লিখেন। অধ্যয়ন করেন দেশী বিদেশী বিখ্যাত লেখকদের নাটক ও উপন্যাস। বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই। সমাজের একান্ত নগন্য সদস্য হিসেবে অনেকটা নিঃসঙ্গভাবে বিলাসহীন জীবন যাপন করেন। লেখালেখি, পত্র যোগাযোগ, বই পড়া মোটামুটি এটা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তি জীবন। গল্প উপন্যাস তাঁর সাথে সমাজের সেতুবন্ধন।

পত্র যোগাযোগের সূত্র ধরে এক সুন্দরী মহিলার আগমন তাঁর গ্রন্থাগারে। তার ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনের সমস্যার ব্যাপারে লেখকের সহযোগিতাই ছিল সুন্দরীর প্রত্যাশিত বিষয়। এক সময় স্বামীর সাথেও লেখকের পরিচয় হয়। লেখক মহিলাকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর চরিত্র নিরূপণ করে উপন্যাস ও নাটকের বই পড়তে দেন। এ পড়াই তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায় এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়।

এক সময় লেখকের সাথে মহিলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতক্ষণে তাঁর হৃদয়ে মহিলার সুন্দর রূপের প্রেম উথলে উঠে। বিবাহিতা সুন্দরীর গোপন প্রেমে সাধক তিলে তিলে দগ্ধ হতে থাকেন। অন্ধকারে জেগে জেগে প্রেমিকার মূর্ত্তি খুঁজে বেড়ান। প্রেম পত্র কল্পনা করতে করতে এক সময় পত্র লেখা শুরু করেন। পত্রের তালিকা অনেক হলো কিন্তু কোন পত্রই প্রাপকের ঠিকানায় ডাক বাক্সে রাখা হয়নি। ইতিহাসের পাতা খুঁজে প্রেমিক প্রেমিকাদের জীবন থেকে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বা রচিত পত্রগুলো সংকলন করেন নিজের প্রেম যাতনা লাঘবের ব্যর্থ কসরত করেন।

এভাবে লেখক বিশাল প্রেম পত্র সাহিত্যের রচনা শেষ করেন। এসব প্রেম পত্র সাহিত্যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং খাদীজা যেমন আছে তেমনি আছেন কার্ল মার্কস, টলস্টয়সহ আরো অনেকের। অনেকটা নাটকীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে এক হোটেলে তিনি সুন্দরীর স্বামীর সাথে দেখা পান। তার কাছে জানতে চান তার মনের গোপন প্রিয়তমা সুন্দরীর খবর। স্বামী দুঃখ ভারাক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ে জানান- এ ব্যাপারে তার পক্ষে এ মূহুর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। বরং তিনি লেখকের হাতে একটি লাল নোট বই তুলে দেন।

লাল ডায়েরীতে তাদের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বিষদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সর্বশেষ ঘটনা হিসেবে স্বামীর বিদেশ সফরের প্রাক্কালে সুন্দরী এক যুবকের প্রেমে পড়ে কিভাবে হাবু-ডুবু খেয়েছেন। শুধু তাই নয় প্রেম মন থেকে দেহে কিভাবে উন্নীত হলো এবং একসময় সমাজ পরিবার সন্তান, স্বামী, মূল্যবোধ সব কিছু ভুলে তারা যাত্রা করল উচ্ছশৃংখল যৌন জীবনে। এ পাপ পংকিল জীবনের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে মহিলার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে। প্রবাসী স্বামী বাড়ী ফিরে আসার পর হঠাৎ করে কাজের মেয়ের কুড়ান বস্তু হিসেবে স্বামীর হস্তগত হয় বিখ্যাত লাল নোট। লেখাগুলো পড়ে তিনি হতাশ হন এবং ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। স্ত্রীর এধরণের বিশ্বাসঘাতকা এবং উচ্ছশৃংখল চরিত্রের কথা তার কল্পনায়ও ছিলনা। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন না-কি বাস্তবেই স্ত্রীর হাতের লেখায় তাকে প্রেমিকের কোলে এবং নগ্ন সঙ্গমের চিত্র শব্দের অক্ষরে দেখছেন।

স্বামী মনস্থির করলেন, না-আর এক মুহুর্তও এ ঘরে থাকা যায়না। এ স্ত্রীর মুখ দেখাও তারপক্ষে সম্ভব নয়। এমন দাজ্জাল স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাসা থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। আশ্রয় নিলেন পাশ্ববর্তী শহরের এক হোটেলে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি ভাবলেন। চরিত্রহীন মায়ের কারণে শিশু সন্তানদেরকে নির্মম যাতনা ভোগ করতে হতে পারে। সামাজিকভাবেও শিশুরা বড় হয়ে নিগৃহীত হবে মায়ের পরিচয়ের কারণে।

হোটেলে উঠে স্বামী তার বাল্য বন্ধু যিনি সম্পর্কে মামাত ভাইও বটে তাকে সংবাদ দিয়ে এনে তার সমস্যাবলী তাকে জানালেন। এ বিষয়ে দু'বন্ধু মিলে পরামর্শ করতে লাগলেন কিভাবে সামনে অগ্রসর হবেন। তার দুঃখের কাহিনী শুনে বন্ধুটিও মর্মাহত হলেন। বন্ধুকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তিনি রাজী হয়ে হোটেলে অবস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময়ে লেখকের সাথে স্বামীর সাক্ষাৎ হলো। ডায়েরী পড়ার পর স্বামী লেখকের নিকট তাদের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যাবলী তুলে ধরেন। একই সাথে পূর্বের ন্যায় এ বিষয়ে তিনি লেখকের সহযোগীতা কামনা করেন। অবশ্য প্রথম অধ্যায় সমঝোতার আহবান নিয়ে এগিয়েছিলেন স্ত্রী, আর এবার কিন্তু স্বামী স্বয়ং। লেখক তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সহমর্মিতা জানিয়ে সম্ভব সকল সহযোগীতার আশ্বাস দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পরামর্শ দেন। এ ঘটনার প্বার্শ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরেক সমস্যা দেখা দেয়। মামাতোভাই নিজ স্ত্রী সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থান করেন। যেগুলো আসলে অনুমানভিত্তিক ছিল।

লেখক স্বামীকে বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাকে একবার স্ত্রীর সাথে একান্তে তার লেখা ও এ ঘৃণীত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন। কারণ শুধুমাত্র এ লেখাই তাঁর অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি এ লেখার ভিত্তিতে তালাক দেয়াও তালাকের বিধান অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত নয়। দীর্ঘ আলাপের পর স্বামী এতে সম্মত হন এবং তালাক দেয়ার পূর্বে স্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে মর্মে মত দেন। তবে স্বামীর নিজের পক্ষে স্ত্রীর মুখোমুখি হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কেননা এমন চরিত্রহীন স্ত্রীর মুখ দর্শনের মত মানসিক অবস্থা তার নেই। সিদ্ধান্ত হয় লেখকই স্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।

লেখক সেই সুন্দরী যাকে নিয়ে কয়েক বছর তিনি অনেক লিখেছেন অনেক ভেবেছেন তাঁর সম্মুখীন হলেন। কিন্তু লেখকের আগের মতো আর সে আবেগ উচ্ছাস অথবা ভালবাসা নেই। একান্ত দ্বায়িত্ব পালনের তাগিদে তার অফিস কক্ষে আলাপচারিতা। স্ত্রী বিষয়টির ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিলেন। লাল ডায়েরীতে লিখিত কাহিনীকে তিনি কল্পিত উপন্যাস চরিত্র বলে উল্লেখ্য করলেন। মহিলা স্বামীর সাথে তার চমৎকার সম্পর্ক এবং স্ত্রী হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন বলে দাবী করেন। তিনি স্বামীর সাথে কথা বলতে আগ্রহী হন। স্বামীর ঠিকানা জানার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, স্বামী যেমন ভেঙ্গে পড়েছিলেন স্ত্রী কিন্তু সেভাবে হতাশ হননি। স্বামী যেহেতু তার সাথে কথা বলতে রাজী হননি, তাই লেখককে তার পক্ষ থেকে স্বামীর সাথে আলাপ করার জন্য অনুরোধ করেন। লেখক তার স্বামীর সাথে কয়েক দফা কথা বলেও তেমন অগ্রসর হতে পারেন নি। স্বামী তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং তালাকের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও লেখককে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। এ আলাপের প্রক্রিয়ার লেখক মহিলার সাথে দীর্ঘ আলাপ করেন। এবার মহিলা স্বামী বা পুরুষ শ্রেণীর প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ উথাপন করে নারীর বঞ্চনা ও অধিকার, সম্পর্কে কথা বলেন। এক পর্যায়ে মহিলা স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেনঃ 'স্বামীরা স্ত্রীদেরকে দাসী হিসেবে মনে করে।' লেখক জবাবে বলেনঃ এ জন্যইতো আমি ঘর বাধিনি কোন মহিলাকে দাসী করিনি[৩৭]।

স্বামী স্ত্রীর সংঘাত অনেক দিন চলেও কোন উত্তম সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি হয়ে কথাও হয়েছিল। কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ ও আস্থার অভাবে বন্ধন জোড়া লাগেনি। দীর্ঘ কুরুক্ষেত্রের এক পর্যায়ে পরস্পরে ছাড়া ছাড়ি হয়ে যায়। নতুন করে নাটক রচিত হলো। লেখক ছিলেন এক সময় প্রেমিক। প্রিয়তমা ছিলেন মহিলা এবার মহিলা প্রেমিক সেজে প্রিয়তমের আঙ্গিনায় ঘুরঘুর করেও লেখকের মত পরিবর্তন করতে পারেননি। লেখক মহিলাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। অতঃপর তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । এভাবে ইতিহাস অনেক দিন পর্যন্ত নিরব হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল- সেই মহিলা এক সংস্কৃতিবান পুরুষকে বিয়ে করেছেন। লেখক পূর্বের মতই নিঃসঙ্গ আছেন। এই ছিল তাওফীকের আল-রাবাত উপন্যাসের সারাংশ।

নামকরণ ঃ আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস বা পবিত্র সম্পর্ক বলে লেখক তাঁর উপন্যাসে প্রেমের সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক, বন্ধুর সম্পর্ক, লেখকের সাথে পাঠকের সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই যোগসূত্র প্রেম। এই প্রেমের ক্ষেত্রে সন্দেহ অনাস্থা কিভাবে সম্পর্ককে ছিন্ন করে আবার কিভাবে সম্পর্ক জোড়া লাগে এসব বিষয়ের চিত্র অবলম্বনে আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস। এটি

---

৩৭. তওফীক আল-হাকীম, আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস, পৃ. ২২৩.

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীমের প্রেমের দীর্ঘ উপন্যাস। প্রথম থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত প্রেমই ছিল গল্পের প্রধান ও মূখ্য বিষয়। প্রেমের বিরহ মিলন প্রেমের আবেদন নিবেদন বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে।

একটি ভাল বই, একটি উপন্যাস অথবা একটি নাটক একজন পাঠকের চিন্তা-চেতনা কিংবা চরিত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করে 'তওফীক' উপন্যাসে তা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পাঠকদেরকে বই পড়ার গুরুত্ব ও বই এর প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্য লেখকের এই পদ্ধতি যা তিনি চরিত্র নির্মাণে তুলেছেন এটি তাঁর অন্যতম শিল্প কৌশল। পাঠক ''পবিত্র সম্পর্ক'' এ উপন্যাস পড়ে শুধু এর বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করবেনা বরং তারা সিদ্ধান্ত নিবে আমাদের

কথা সাহিত্য পড়া প্রয়োজন। দেশী বিদেশী কথা সাহিত্যের মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জটিল সমস্যা কেটে উঠতে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন লেখক মিমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন- বলেছেন সাধকঃ[৩৮]

لاتطلب رأى تلك مسألة عائلية دقيقة لايحسن بى ان اتدخل فيها برائى كل مالى ان افعل هو ان اقوم بينكما بدورالرسول اوالسفير --- اجعلانى فقط واسطة اتصال بينكما لااكثر ---

এটা আপনার ঘরোয়া সমস্যা, এ ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনা। আমি আমার মতামত আপনাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিনা বরং আমি শুধুমাত্র দূত বা প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করছি.....।

৩৮.প্রাগুক্ত পৃ.২১৬

Dhaka University Institutional Repository

তওফীক আল-হাকীম উপন্যাসে উপস্থাপনাকে কখনো রূপক বা পরোক্ষ করেননি বরং সরাসরি গল্প শুরু করেন। এখানেও তাঁর এ নীতিমালার পরিবর্তন দেখা যায় না। লেখকের পাঠাভ্যাস তার চিন্তা ধারা নিয়ে কথা বলতে গিয়েই তিনি কাহিনী শুরু করেছেন। এখানে ত্বাহা হোসাইনের ''আদীব'' উপন্যাসের সাথে উপস্থাপনায় এ উপন্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও অনেক সময় ত্বাহা হোসাইন উপন্যাস উপস্থাপন করেন রূপক ভঙ্গী পরোক্ষ আলোচনা দিয়ে।

এখানে প্রেমের দীর্ঘ সংলাপ চলেছে। এ সংলাপে পাঠক কিছুটা ভারাক্রান্ত হতে পারেন। তবে শব্দালঙ্কার ও বাক্যের সাবলীলরূপ পাঠককে আনন্দিত করে। আসলে প্রেমের সংলাপে বরাবর মানুষ আগ্রহী থাকে। ত্বাহা হোসাইন তাঁর ''হুব আল-দায়'' হারানো প্রেম অথবা ''দো'য়া আল-কারাওয়ান''- কোকিলের ডাক উপন্যাসে প্রেমের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে করেছেন। তার সংলাপ ছিল খুব ক্ষণিকের জন্য। সরাসরি প্রেমের সংলাপ এড়িয়ে তিনি শুধুমাত্র বর্ণনা দিয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে তওফীক আল-হাকীম নায়ক নায়িকাসহ বিভিন্ন চরিত্রকে শুধু মুখোমুখি সংলাপের চিত্রেই আনেন নি বরং আরেকটু এগিয়ে ছবি তুলেছেন।

সার্বিকভাবে তওফীক আল-হাকীমের বক্ষমান উপন্যাসে যা আলোচিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে- লেখকের দায়বদ্ধতা ও গণমানুষের জন্য সাহিত্য। জীবনে সাহিত্যের প্রভাব, পাঠক সৃষ্টি ও বই পড়ার জন্য গল্প চরিত্র, প্রেম ও দাম্পত্য জীবন। প্রেমের ধর্ম, নারী অধিকার, নারী প্রগতি, প্রেমের প্রাচীন ও আধুনিক ধরণ, প্রেম চর্চার ইউরোপীয় ও প্রাচ্যরূপ। প্রেমের পত্রাবলী, যা এ উপন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

উপস্থাপনায় পাঠকের আকর্ষণ করার মত একটি কৌশল তওফীক এ উপন্যাসে যুক্ত করেছেন তা হচ্ছে; বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দিয়ে তিনি গোটা ২০৮ পৃষ্ঠার উপন্যাসটিকে ১৫টি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন। বিষয়ের সাথে মিল রেখে আর্কষণীয় শিরোনামগুলো একবার দেখে নিলেও যেন একপলকে

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের প্রাথমিক ধারণা এসে যাবে। ভূমিকায় তিনি কোন শিরোনাম দেননি। তারপর যেভাবে পেশ করেছেন-

২. টেনিস/তানিস

৩. সুন্দরী বই পড়ছে

৪. দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি

৫. বিনিদ্র রজনী

৬. বিরতি

৭. বিরহ

৮. প্রেমের পত্রাবলী

৯. ভাগ্য দ্বার খুলল

১০. লাল নোট বই (ডায়েরী)

১১. মাটির দেবতা

১২. মুখোমুখি

১৩. স্ত্রীর স্বরূপ

১৪. কুরুক্ষেত্র

১৫. শেষ পরিণতি/অন্তিম সুর- শেষ কৃত্য।

অনুচ্ছেদের শিরোনামগুলো দেখলে মনে হতে পারে যেন তিনি ছোটগল্পের নাম দিয়ে সংকলন করেছেন। বস্তুতঃ কাহিনীর বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে আলাদা ভূমিকা না দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকভাবে গোটা উপন্যাস শেষ করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসে তিনি এমনটি না করে শিরোনাম ছাড়া বিভিন্ন অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে এ পদ্ধতিটি অনুপস্থিত।

আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছেঃ [৩৯]

ان زوجًا ذبح زوجته اواخته بسبب الغيرة اوالاشتباه فى السير والسلوك --- فكيف تنسى ان الحرية هى اساس كل شئ الان ---

একজন স্বামী আত্মমর্যাদার উত্তেজনায় নারীর আচরণে সন্দিহান হয়ে স্ত্রীকে অথবা তার বোনকে যবেহ্ করে দিতে পারে .....। একজন নারী জন্মগতভাবে পুরুষের মত স্বাধীন। স্ত্রী মানে এমন কোন সামগ্রী নয়, যাকে বিবাহ নামক ঘরে আবদ্ধ কক্ষে রাখা হবে। বরং তার বাঁচার অধিকার আছে। তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা দিতে হবে। নারীর দেহ মন এমনকি প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বাধীন। বিবাহ এমন কোন শিকল নয় যে, তা নারীকে পরানো হবে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তার শরীর বা মনের উপর মালিকানা অর্জন করতে পারে না।

فهز راهب الفكر رأسه وقال هامسًا- كالمخاطب نفسه- الحمد لله انى لم اتزوج ---

আজকে সময় এসেছে, এসব পরাধীনতার জাল ছিন্ন করে যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করা। লেখক মাথা নাড়লেন এবং পরক্ষণে বললেনঃ ''আল-হামদুল্লিাহ্! আমি বিয়ে করিনি''। আল-রাবাত উপন্যাসে তওফীক আল-হাকীম আঞ্চলিক অথবা কথ্য শব্দ ব্যবহার করেননি।

---

৩৯. প্রাগুক্ত পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধ আরবী ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁকে প্রাচীন আরবী বাক্য বিন্যাসের কাছাকাছি কখনো পৌঁছতে হয়েছে, যে কথা ডঃ ত্বাহা হোসাইনের বেলায় উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ আল-রাবাত থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি.....[৪০]।

مريومان على زيارة الفتاة، واذاالباب يطرق على راهب الفكر انه ليس موعدها، فمن الطارق؟ --- وأذن فى الدخول واذا هوامام رجل ناضج السن حسن السمت -- انيق الثياب، مشرق الوجه لطيف الاشارة كل شئ فيه يدعوالى احترامه ومحبته ---

"মধ্যযুগীয় ইতিহাসে পড়েছি। সেকালের পুরুষেরা যারা অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিল। যদি কখনো তারা অভিযানে দূর দেশে যেত, তখন রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তাদের স্ত্রীদের জন্য তারা বিশেষ ধরণের তালা ব্যবহার করত। সে তালার চাবি একমাত্র তাদের নিকটই থাকত। তালাটি তারা স্ত্রীর শরীরের নিম্নাংশে লাগিয়ে দিত। দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে যখন তারা বাড়ী ফিরে আসত তখন চাবি দিয়ে হতভাগা মহিলার শরীর থেকে তালা খোলা হত। এ ব্যবস্থাকে "সতীত্ব রক্ষা" নামে আখ্যায়িত করা হত। আপনি একে কি নামে বিশেষিত করবেন? আক্বদ্ না-কি ক্বায়দ (বিবাহ নাকি বন্দি), [৪১]।

---

৪০. তওফীক আল-হাকীম, আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস, পৃ. ২২৪।

৪১. তওফীক আল-হাকীম, আল-রাবাত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

لقدكان الفارس من الئك الفرسان النبلاء، قبل ذهاده
الى الحرب يصنع لزوجته قيداً من الفولاذ، له قفل
ومفتاح يقيدبه الجزءالسفلى من جسم زوجته
ويطلقون على هذا القيد حزام العفة ---

ত্বাহা হোসাইন তাঁর দো'আ আল-কারাওয়ান এবং হুবব আল-দাই উপন্যাসে প্রেমের চরিত্র নির্মাণ করে এর পরিণতি, বিরহ ও মিলন দেখিয়েছেন। তওফীক আল-হাকীম এ প্রেমের চরিত্রে দীর্ঘ সংলাপ চালিয়েছেন।

ত্বাহা হোসাইনের প্রেমের চরিত্রে নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রে সাহস, দায়িত্ববোধ ও আত্ম-মর্যাদাবোধ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে ত্বাহার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। পক্ষান্তরে; তওফীক আল-হাকীম যেখানে অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় নিজেই সাধক লেখক সেজে জড়িয়ে পড়েছেন পুরুষ চরিত্রে ভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই সমালোচকগণ তাঁকে নারী বিদ্বেষী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ত্বাহার উপন্যাসে নারী ধর্ষিতা হয়েছে, নির্যাতিতা হয়েছে, প্রতিবাদী রূপে দায়িত্ব সচেতন থেকে আবার ঘর বেঁধেছে। পুরুষও এ প্রতিবাদী মহিলাকে বশ করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে পুরুষ ও মহিলা চরিত্রে নিজ নিজ স্থানে সফলতা এসেছে। কিন্তু তাওফীকের চরিত্রে পুরুষও ব্যর্থ মহিলাও ব্যর্থ। লেখক নিজে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে ৪০ বছর বয়সেও বিবাহ করতে সাহস পাচ্ছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে সুন্দরী যুবতী তার সকল সৌন্দর্য ভালবাসা নিয়ে তার সামনে এসে প্রেম নিবেদন করে সেখানে তিনি পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছেন। তিনি কি একজন সুস্থ পুরুষ- পাঠকের নিকট এ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তবে সাধক নাম দিয়ে কোন লেখকের এত কঠিন চরিত্র কিছুটা বেমানান কেননা অন্য অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি প্রেমে মশগুল হয়ে বিনিদ্র রজনীতে প্রেম পত্র লিখে যাচ্ছেন। ত্বাহা তার নীতিমালা অনুযায়ী এ দু'টি উপন্যাসের চরিত্রের নিজে জড়াননি ঠিক কিন্তু তিনি নায়ক চরিত্র নির্মাণে নিজেকে সার্থক পুরুষ এবং জীবন বোধেও পুরুষ মনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। একই সাথে নারীর অসহায়ত্ব ও প্রেমকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমিনা চরিত্রে দেখা যায় গ্রাম থেকে দরিদ্রের কষাঘাতে নিস্পেষিত একটি বালিকা কিভাবে উঠে এসেছে জীবন সংগ্রামে। নিজ বোনের ধর্ষনকারীকে আত্মমর্যাদাবোধের কারণে হত্যা করতে চেয়েছে কিন্তু নারী মনের চাহিদা অনুযায়ী নিজেই সে পুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ইঞ্জিনিয়ার পুরুষ যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন সে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমার বোনের স্মৃতি আমাকে বাধা দেয়।

পুরুষ নিজের অপরাধ স্বীকার করে। চোখের অশ্রু দিয়ে আমেনার নিকট প্রেম নিবেদন করে। এবার আমিনা দুর্বল হয়ে যায়। এ প্রসংগে কবি আবদুস সাত্তার সুন্দর মন্তব্য করেছেন কোকিল কি বসন্তকালে না ডেকে পারে।[৪২] তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাস চরিত্রে বসন্ত এসেছে যতটুকু সাহিত্যের পাতায় বাস্তবে তা রয়েছে অনেক দূরে। সাহিত্যে শিল্প অলঙ্কার হিসাবে আল-রাবাত উপন্যাসে লেখক যে চরিত্রটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা হচ্ছে তার প্রেমের পত্র সাহিত্য।

সুন্দরী মহিলার প্রেমে আসক্ত হয়ে মনের শান্তনার জন্য তিনি রাত জেগে জেগে প্রেম পত্র লিখতে শুরু করেন। এসব পত্রে তিনি মন উজাড় করে প্রিয়তমাকে ভালবাসা পেশ করেন। প্রিয়াকে তুলনা করেন পৃথিবীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক নারী হিসেবে। এসব পত্রে প্রকৃতির চিত্র শোভা মুদ্রিত হয়েছে মনোরমভাবে।

---

৪২. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মোট ৮টি দীর্ঘ পত্র তিনি ২১ পৃ. ব্যাপী রচনা করেন। (পৃ. ৭৪ থেকে ৯৫ পর্যন্ত)[১]। বিশ্বসাহিত্য প্রেমপত্র হিসেবে এগুলো সেরা পত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রথম পত্রটি শুরু করেছেন এভাবেঃ[৪৩]

آه :- لوأتيح لك ان تعلمى ماحدث لى بعد
ذهابك؟ انك ----

হায়! তুমি চলে যাওয়ার পর আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল তা যদি প্রিয়তমা তুমি জানতে.....

৩য় প্রেম পত্র থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি.....

كنت أقرأ عن "كارلماكس" عند ماطرد من بلاده لان قومه
وجدوفى كتابه الاشتراكية خطراً علي كيان المجتمع--
لقد أبت زوجته الان تخرج معه، وتشردكمايشرد ---
واراد أهلها أن يستبقو بينهم، وان يجتنبوها مصير
زوجها المبهم وطريقه المدلهم، ---

৬ষ্ঠ পত্র,

صباح ٢١مارس :
صديقى
---- احب ان احدثك عن واحدة تعرفينها ولا شك--
تلك هى خديجة النبى العربى صورتها تخطرلى داءمًا --
-

৪৩. তওফীক আল-হাকীম, আল-রাবাত, পৃ. ৭৯, ৭৪,৮৭,

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন এবং তওফীক আল-হাকীমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রারম্ভে তাঁদের ব্যক্তি জীবনের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ত্বাহা হোসাইন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিন বছর বয়সেই অন্ধ হয়ে যান। অনেক ভাইবোনের মধ্যে একটি ভাই বোবা ছিল। সে ভাইটিই তাঁকে বিদ্যালয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করত। মেধা ও ভাগ্য গুণেই এ অন্ধ ছেলেটি পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। পরিণত বয়সে ত্বাহা হোসাইন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরও ছিলেন। পক্ষান্তরে তওফীক আল-হাকীম ধনী পিতার সন্তান ছিলেন, তুর্কী বংশের মা আভিজাত্যের গর্বে ছেলেকে আর দশটি ছেলে থেকে পৃথক মনে করতেন। তাই গ্রামের কৃষক বা সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে তাঁকে খেলতে দিতেও রাজী ছিলেন না[১]। মা তাঁকে আদর যত্ন করে নিজের আভিজাত্যবোধের উত্তরসূরী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তওফীক যখন মায়ের আঁচলে লোকচুরি খেলে, ত্বাহা সে বয়সে কুরআন মুখস্ত শেষ করেছে।

বলা যায় তওফীক আল-হাকীম সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল বা ছাত্রাবস্থায় তাঁকে আর্থিক বা সামাজিক কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে এমন কোন অধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিনি সাহিত্যিক হওয়ার প্রেরণা পিতার নিকট থেকে বাল্যকালেই পেয়েছিলেন। পারিবারিক পাঠাগার ও পরিবেশ তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে তৈরী হতে সাহায্য করেছিল[২]।

---

১. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ২৮৮।
২. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমর, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ত্বাহা হোসাইনের জন্ম ১৮৮৯ খৃ. সালে আর তওফীকের জন্ম ১৮৯৮ খৃ. সালে। দু'জন বন্ধু ছিলেন বটে তবে একজন প্রবীন একজন নবীন অথবা একজন তরুণ একজন যুবক। ত্বাহা হোসাইন মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৭৩ খৃ. সালে। তওফীক আল-হাকীম এর মৃত্যু হয়েছে ১৯৮৭ খৃ. সালে। ত্বাহা হোসাইন ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আর তওফীক আল-হাকীমের বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ত্বাহা হোসাইন প্যারিসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে তওফীক আল-হাকীম প্যারিসে চার বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য অবস্থান করে আইন শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন না করেই কায়রো ফিরে এসেছিলেন।

দু'জনই ইউরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অনুসারীও ছিলেন। প্যারিসে অন্ধ ত্বাহা হোসাইন প্রেম করে প্রেমিকাকে বিয়ে করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন সঙ্গিনী করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু তওফীক আল-হাকীম প্যারিসের যুবতীর প্রেমে কসরত করেও প্রেমিকাকে বশ করতে পারেননি। এমনকি তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছে মিসরে, বেশ অনেক বছর পরে।

ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতির দিক দিয়ে দু'বন্ধুর মধ্যে ত্বাহা হোসাইন শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা বলার জন্য গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। গল্প বা উপন্যাস রচনায় তাদের যোগ্যতা বা অবদান পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। তবে সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকগণ কথা সাহিত্যে সমসাময়িকদের মধ্যে তওফীক আল-হাকীমকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে থাকেন[৩]।

আলোচ্য প্রেক্ষাপটে দু'বন্ধুর মধ্যে উপন্যাসিক হিসাবে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। ত্বাহা হোসাইন এবং তওফীক আল-হাকীম যখন মিসরীয় সমাজে গল্প উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত তাদের সমসাময়িক যারা উপন্যাস রচনা করেছিলেন বা করতেছেন অথবা একটু পরে করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাহমূদ তাইমূর, মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ইব্রাহীম আবদুল কাদির আল-মাযিনী এবং আরও পরে নাজীব মাহ্ফুজ। এদের সকলেই লেখক হিসাবে, উপন্যাসিক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে অবস্থান করেন। পারস্পরিক ভাবে কেউ বন্ধু,

---

৩. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ ছাত্র, কেউ গুরু, কেউবা প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের প্রত্যেকের রচনায় নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। তবে অনেক সাহিত্য সমালোচক নাজীব মাহ্ফুজকে এদের পরবর্তী যুগের উপন্যাসিক বলেই উল্লেখ করে থাকেন। ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর- নাজীব মাহ্ফুজকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছেন[৪]।

ত্বাহা হোসাইন যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই তিনি লিখতে পারতেন না। তিনি বলতেন অন্যরা বিশেষ করে তাঁর পত্নী লিখতেন। অন্যদিকে তওফীক আল-হাকীম নিজে লিখতেন। এ জন্য ভাষার কথ্যরূপ ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে অধিক। তওফীক পড়তেন ত্বাহা শুনতেন তাই উপন্যাস রচনায় তওফীক শব্দ খুঁজে বাছাই করে লিখতেন কিন্তু ত্বাহা মুখস্ত ভাবে যে শব্দ আসত তাৎক্ষণিকভাবে তাই বলে যেতেন সহযোগী সেটাই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করত। এ ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহারের মধ্যে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

তওফীক আল-হাকীম উপন্যাসে একটি বিষয়ের আলোচনায় অন্য একটি বিষয়ের মধ্যে চাতুর্যতায় ও শিল্প কৌশলের মাধ্যমে প্রবেশ করে উপস্থাপন করেন। এ তাঁর অনন্য বৈশিষ্টের প্রতীক বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ "উসফূর মিন আল-শারক বা প্রাচ্যের চড়ুই" উপন্যাসে নায়ক মুহসিন প্যারিসে এক যুবতীর প্রেমে পড়েছেন। বিষয়টি সত্য ঘটনা বলে তিনি তার "যাহ্রাত আল-উমর বা জীবনের ফুল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[৫]।

প্রেমিকা সহজে প্রেমিকের সাথে প্রেম খেলায় একাত্মতা ঘোষণা করতে রাজী হচ্ছে না। বন্ধুর বান্ধবী "জারমিন" পূর্বেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল কিভাবে প্যারিসের যুবতীদেরকে বশ করতে হয়। মুহসিন বাজারে গিয়ে একটি পোষা তোতা পাখী কিনে আনল। পাখীকে শিখানো হলো- "আমি তোমাকে ভালবাসি" পাখীটি প্রেমিকাকে উপহার দেয়া হয় এবং পাখীটির নাম রাখা হয়েছিল মুহসিন। প্রেমিকা খুব খুশী হলো মুহসিনের পাখী পেয়ে, যদিও সে এখনও আসল মুহসিনের নামটি পর্যন্ত জানেনা।

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

কালের বিবর্তনে এমনি এক সময় এল যখন ইতিহাস এ গরীবদের জীর্ণ কুটিরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এমনকি বেচারা ইয়াসির এর মত সাধারণ দরিদ্র লোকদের সাথেও মিতালী করতে রাজী হয়ে গেল[৮]। বিষয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তওফীক আল-হাকীম যত দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করেন ত্বাহা হোসাইন তা করেন না। তওফীক পরিবর্তিত বিষয় থেকে আবার দ্রুত পলায়নও করেন, কিন্তু ত্বাহা ভিন্ন বিষয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তবেই মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলা ভাষায় যেমন আঞ্চলিক কথ্যভাষা রয়েছে আরবীতেও তা আছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরবী ভাষায় প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন রূপ অপরিবর্তনীয় ভাবে রয়েছে। কারণ আরবী ভাষার নিয়ন্ত্রনকারী শক্তি হলো "আল-কুরআন"।

তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে আঞ্চলিক কথ্য আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ত্বাহা হোসাইন উপন্যাসে শুধু নয়, সকল গ্রন্থে এমনকি তিনি বক্তৃতায়ও বিশুদ্ধ আরবী শব্দ ব্যবহার করতেন। ত্বাহা হোসাইন ব্যতীত সমসাময়িক সব সাহিত্যিকই আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ত্বাহা হোসাইনের আরবী ভাষা অনারব বিশ্বের পাঠকদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ার এটি একটি কারণ বটে। তিনি কোন আঞ্চলিক আরবী শব্দ অথবা অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেননি। পক্ষান্তরে তাঁর বন্ধু তওফীক আল-হাকীম তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আওদাত আল-রূহ" (আত্মার প্রত্যাবর্তন) উপন্যাসে দু'চারটি সংলাপেই নয় বরং সাধারণভাবে ৫১৬ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থে সর্বত্র আঞ্চলিক মিসরীয় কথ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ সে সময় আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার কোন দোষণীয় বিষয় ছিলনা, বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তেমনিভাবে "ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ" উপন্যাসে তিনি ব্যাপক না হলেও আঞ্চলিক আরবী ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বা রচনাবলীতে কিছু আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তওফীক আল-হাকীম পরবর্তী জীবনে একক নাট্যকার রূপে আরবী সাহিত্যে আবির্ভূত হওয়ার লক্ষণ পূর্ব থেকেই তাঁর উপন্যাসে বিদ্যমান ছিল। কথ্য সাহিত্যে যেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব সেখানে মিসরীয় গণমানুষের কাছে তাঁর উপন্যাস ও নাটক জনপ্রিয় হওয়ার এটি অন্যতম কারণ। অন্যদিকে অনারব বিশ্বে যারা আরবী পাঠক আছেন তাদের নিকট তাওফীকের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার রীতিমত

---

৮. তওফীক আল-হাকীম, আল-ওয়াদ আল-হক্ব, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে ত্বাহা হোসাইন দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন যদিও বিষয় বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে। পক্ষান্তরে তওফীক আল-হাকীম বাক্য ব্যবহার করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে বিষয় বর্ণনা দিয়েছেন দীর্ঘভাবে। 'আদীব' উপন্যাস এবং 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাস দুটির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি ধরা পড়ে।

তওফীক আল-হাকীমের বিখ্যাত পাঁচটি উপন্যাস আওদাত আল-রূহ পৃঃ ৫১৬ (দু'খন্ডে) আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস পৃঃ ২৮২, ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ পৃঃ ১৭৬, 'হিমার আল-হাকীম' পৃঃ ১৬৫ 'উছফুর মিন আল-শারক,' পৃঃ ২৪৮। দেখা যাচ্ছে তাওফীকের উপন্যাস দীর্ঘ কিন্তু ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস ছোট ছোট। অন্য দিকে ছোট গল্পে দেখা যায় ত্বাহা হোসাইন মাত্র কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করেছেন কিন্তু তওফীক আল-হাকীমের ছোট গল্পের সংকলনের পরিমান অনেক। ত্বাহা হোসাইনের দীর্ঘ বাক্য বা কথা যা কয়েক পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলে, পাঠ করে কখনো পাঠক ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু তওফীক আল-হাকীমের দীর্ঘ কাহিনী পড়ে কখনো পাঠককে দীর্ঘশ্বাস নিতে হয় না। একজন ছোট বাক্যে-দীর্ঘ কাহিনী বলেছেন, অন্যজন দীর্ঘ বাক্যে সংক্ষিপ্ত গল্প বলেছেন। আওদাত আল-রূহ এবং 'দোয়া আল-কারাওয়ান'-এ লেখক দ্বয়ের এ বৈশিষ্ট্য ভালভাবে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের আলোচনা বা গবেষণা করতে হলে অশ্লীলতা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আসতে বাধ্য। শালীনতা, নগ্নতা অথবা উশৃংখল যৌন চিত্র এসব বিষয়ে সামাজিক ভিন্নতায় সভ্যতা ও মূল্যবোধের পার্থক্যতায় দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয়ে থাকে। ফরাসী সমাজে শালীনতার ব্যাখ্যা একরকম আরব সমাজে অন্য রকম। তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে অশ্লীলতার চিত্র পাওয়া যায়। যেমন 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসে তিনি পরকীয়া প্রেমের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি প্রেমিক প্রেমিকার দেহ মিলনের যে নগ্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন সমালোচকদের দৃষ্টিতে এর তেমন প্রয়োজন ছিলনা এবং বিষয়টি প্রাসঙ্গিকও ছিলনা। যৌন সঙ্গমের বর্ণনায় হাতের অবস্থান ও হাতের ভূমিকা, চোখের ভূমিকা, ঠোঁটের ভূমিকাসহ তিনি দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী যে চিত্র অঙ্কন করেন তা অশ্লীলতার নগ্ন মূর্ত্তি বৈ কিছু বলা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে এসব চরিত্র তওফীক থেকে অধিক হওয়া সত্বেও তিনি শালীনতার মাধ্যমেই এসব চিত্র তুলে ধরেছেন। যেমন 'দোয়া' আল-কারাওয়ান সহ অন্যান্য উপন্যাসে তিনি প্রেম বিরহ নারী নির্যাতনের বিষদ বর্ণনা দিয়াছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিল। অথচ বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি প্রেমিক প্রেমিকাকে মুখোমুখি সংলাপে খুব কমই দাঁড় করিয়েছেন। উপন্যাসে মুখোমুখি সংলাপ অত্যাবশ্যক নয় কিন্তু উপন্যাসে নাটকের ন্যায় তওফীক আল-হাকীম বর্ণনাকারীর চরিত্র ডিঙ্গিয়ে কখনো মুখোমুখি সংলাপে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে কাহিনীকে দীর্ঘ করেছেন। এই ধারা তাঁকে নাটকে টেনে নিয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে তাঁর গল্পসমূহও নাট্যরূপ লাভ করে তাঁর নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

ত্বাহা হোসাইন সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি তাঁর সংস্কার কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন। তেমনিভাবে উপন্যাসে তিনি কুসংস্কারের নগ্নচিত্র অঙ্কন করে এর ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরেছেন। প্রচলিত কুসংস্কার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 'শাজারাত আল-বুস' উপন্যাসে দেখিয়েছেন কিভাবে পীর প্রথা ও সামাজিক কুসংস্কার সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। মুর্খতা ও অন্ধ অনুকরণের ভয়াবহ পরিণাম তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পীর তার দুই মুরীদের ছেলে মেয়ে অসম বিবাহের সিদ্ধান্ত দেয়। আর মুরীদদ্বয় অন্ধভাবে পীরের আদেশকে প্রভুর আশীস মনে করে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করল। কিন্তু এই বিবাহ দুঃখ বিষাদের একটি জীবন্ত বৃক্ষের গোড়াপত্তন করল।

তওফীক আল-হাকীম বরাবরই এসব বিষয়কে এড়িয়ে গিয়েছেন। সামাজিক কুসংস্কার যা বিভিন্নরূপী ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের অন্যতম বিষয় কিন্তু তাওফীকের উপন্যাসে এসব চিত্র নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইনের ভূমিকা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ তাওফীকের উপন্যাসে বিনোদনের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

ত্বাহা হোসাইন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি বরং নিরপেক্ষ বর্ণনাকারী হিসেবে ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে কাহিনী নির্মান করেছেন। শুধু মাত্র 'আদীব' উপন্যাসে তিনি নায়কের বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পরিচয় নিয়ে বর্ণনাকারী হিসেবে নিজেকে বিশ্বস্তরূপে তুলে ধরেছেন এর থেকে বেশী কিছু নয়। নায়কের বিভিন্ন চরিত্র এবং নায়িকাসহ অন্যান্য চরিত্রের সাথে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েননি যেখানে তার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে, অথবা তিনি অন্যতম চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর নীতিমালা অনুযায়ী এখানেও তিনি অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় নিরপেক্ষ ছিলেন।

তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসের দিকে তাকালে ভিন্ন চিত্র ফুটে উঠে। যেন প্রতি উপন্যাসেই মূল চরিত্র বা নায়ক তওফীক আল-হাকীম স্বয়ং নিজে, অন্য চরিত্র গুলো নায়কের চরিত্রেকে শিল্প চরিত্রে পূর্ণতা দেয়ার জন্যই। 'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাসে নায়কের নাম মুহসিন। কাহিনী অধ্যয়ন করতে গিয়ে পাঠকের প্রথমেই বুঝে নিতে অসুবিধে হবেনা নায়ক স্বয়ং তওফীক আল-হাকীম, বর্ণিত স্থান ও অন্যান্য চরিত্র তাওফীকের পরিচিত ও স্বজন। 'উসফুর মিন আল-শারক' উপন্যাসে নায়ক মুহসিন। এখানেও নায়ক নিজেই তওফীক আল-হাকীম। 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসে 'সাধক লেখক' যিনি নায়ক নায়িকার সাথে প্রায় সব চরিত্রে যুক্ত। সরাসরি না হলেও পাঠক অনুমান করতে পারে সাধক লেখকই তওফীক আল-হাকীম। সাধক চল্লিশ বছর বয়স পেরিয়ে গেলেও বিবাহ করেননি। তওফীক আল-হাকীমের বিলম্ব বিবাহ, লেখালেখি ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা এসবকিছুতে পাঠক তওফীককে একান্ত ছায়া চরিত্র হিসেবে উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ে স্মরণ করে।

'ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ' উপন্যাসেও যিনি ডায়েরী লিখেছেন অথবা ডায়েরী থেকে বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি যে তওফীক আল-হাকীম নিজে, তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধে হয়নি। কেননা তিনি আইন ও বিচার বিভাগে কিছু দিন চাকুরি করেছিলেন বলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী থেকে জানা যায়।

'হিমার আল-হাকীম' উপন্যাসে মূল নায়ক তওফীক যা কিছুটা রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী চরিত্র নির্মাণে গল্পের অবতারনা করেছেন। বর্ণনাকারী যে তওফীক আল-হাকীম তা তাঁর পেশা ও অন্যান্য চরিত্র নির্মাণে ফুটে উঠেছে। সেজন্য রূপক ও অসম্পষ্ট থেকেও উপন্যাসটি নিষিদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিত হয়েছে তথাকাথিত সংস্কৃত শিল্পীদের চরিত্র কলুষিত করে চরিত্র নির্মাণের অপরাধে। অতএব, এখানেও তওফীক জড়িয়ে পড়েছেন স্বয়ং উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে।

ত্বাহা হোসাইন এবং তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসের শিল্প কৌশলে এটি উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা যা তাদের প্রায় সব ক'টি উপন্যাসেই ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে মনোরমভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু অন্ধ উপন্যাসিক মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবন-চরিত্র নির্মাণে কার্পণ্য করেননি। প্রকৃতির শোভা তিনি দেখেননি বলে তিনি সেদিকে কল্পিত চিত্র অঙ্কন করতে যাননি। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি ও চরিত্রের সফল চিত্রায়ন পাঠককে আন্দোলিত করে। আর তাওফীকের প্রকৃতির চিত্র পাঠককে আবেগের মরুদ্যানে তাড়িত করে।

অধিক বিষয়কে একটি উপন্যাসে বর্ণনা করা তওফীক আল-হাকীমের অন্যতম শিল্প কৌশল। এ ক্ষেত্রে ত্বাহা হোসাইন উপন্যাসে এত অধিক বিষয়কে একত্রে বলার পক্ষে ছিলেননা। তিনি বক্তৃতা দিয়ে যেতেন বিষয়ভিত্তিক। সে বিষয়টি যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজনে যে সব বিষয়ের অবতারণা করার প্রয়োজন মনে করতেন শুধুমাত্র সেটুকুই উল্লেখ করতেন। কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি তার বিষয় শেষ করতেন শ্রোতা লেখকের সে- কলমের পরশে সেটি একটি উপন্যাস হিসাবে প্রসব করত।

তওফীক আল-হাকীম আর বক্তৃতা দিতেন না। এক অধ্যায় লিখে চিন্তা করেছেন মনস্থিরকৃত বিষয় পরিবর্তন করেছেন নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন এভাবে দীর্ঘ সময়ে তার উপন্যাস রচিত হয়েছে। রচিত হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। উসফুর মিন আল-শারক উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২০৮ সেখানে তিনি যেসব বিষয় আলোচনা করছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

* প্রেম-বিরহ ও মিলন; ইউরোপীয় ও প্রাচ্যরূপ।
* দর্শন- গ্রীক, ফরাসী, রুশ, ভারতীয়, মিসরীয়। ইউরোপীয় দর্শন বনাম প্রাচ্য দর্শন।
* জাতীয়তাবাদ ও প্রতিহিংসা।

Dhaka University Institutional Repository

* বিভিন্ন মতবাদ বা জীবনাদর্শ, সমাজতন্ত্র, পুজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ। ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ও ভারতীয় ধর্ম।
* সঙ্গীতবিনোদন, নাটক, উপন্যাস, তথা সাংস্কৃতিক জীবন।
* জীবন সংগ্রাম- জীবনবোধ শ্রমিক অধিকার ও কারখানা।
* শিল্প বিপ্লব উত্তর সমাজ কাঠামো ও পরিবর্তিত পারিবারিক জীবন ও শিশু অধিকার।
* মানবিকতা, বস্তুবাদ, ভোগবাদ, যান্ত্রিকতার যাতাকলে নিষ্পেষিত মানবতা। এমনিভাবে আওদাত আল-রূহসহ অন্যান্য উপন্যাসেও বিষয়বস্তুর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। নারীর বঞ্চনার কাহিনী নির্মাণে তিনি সার্থক চরিত্র চিত্রায়নে ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'দো'আ আল-কারাওয়ান' উপন্যাসে তিনি নির্যাতিতা 'হানাদী' চরিত্রকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা পাঠকের হৃদয়ে রেখাপাত করে। তেমনিভাবে 'আদীব' উপন্যাসে তিনি নায়কের প্রথমা স্ত্রীর বঞ্চনার করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'হুব্ব আল-দা'ই' উপন্যাসেও নারীর বঞ্চনার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাওফীকের উপন্যাসে এ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যেন দু'বন্ধু পরামর্শ করে কিছু বিষয়াদি ঠিক করেছেন তুমি এ বিষয়ের প্রাধান্য দিয়ে উপন্যাস বা গল্প লিখবে, আর আমি এ বিষয়ে নিয়ে লিখব। দু'জনের সম্মিলিত উদ্যোগে আরবী কথা সাহিত্যের সকল দিক পূর্ণতা পাবে।

তাই গবেষক লক্ষ্য করবে যে, ত্বাহা ও তাওফীকের উপন্যাসকে একত্রিত করে আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যাবে। শিল্প, বিষয়, রচনাশৈলী উপস্থাপনা, শব্দের ব্যবহার সব কিছুরই একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ চিত্র যে দু'জনার সাহিত্য একসত্ত্বা রূপে ফুটে উঠেছে। তবে তওফীকের বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনা সাহিত্যরসকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। এটি যে তাঁর সেরা শিল্প গুণ, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাঁর উপন্যাস পর্যালোচনা করলে তাই মনে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকদের মূল্যায়নে কথা সাহিত্যে তওফীক আল-হাকীমের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ এখানেই নিহিত।

তওফীক আল-হাকীম তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন মতবাদ জীবনাদর্শ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কোনটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার চেষ্টাও করেছেন। আবার কখনো পাঠকের বিবেচনার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তবে বিষয়গুলো এসেছে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক আলাপের ভিত্তিতে। উপন্যাসে পাঠক সাধারণত বিনোদন, প্রেম রসাত্মক বিষয়ই প্রত্যাশা করে। পাঠকের চাহিদা তিনি ঠিকই পূরণ করেছেন কিন্তু সাথে সাথে তার বিভিন্ন মতবাদও শিখানো হয়েছে। এ কারণে তাওফীকের উপন্যাস শুধুমাত্র রসাত্মক বা রোমান্স সৃষ্টি করেনা বরং ইতিহাস ও মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

যেমন 'উসফুর' উপন্যাসে তিনি সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানবিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। পুজিবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার পুঁজিপতিরা ফরাসী জনগণের সম্পদ কিভাবে শোষণ করে নিয়ে গেছে তা তুলে ধরেছেন, নবীদের উপস্থাপিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদ বা সকলে সমান থিওরির মোকাবেলায়। খৃষ্টধর্ম অনুযায়ী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে তিনি শরীক হয়েছেন[১০]।

ত্বাহা হোসাইন তাঁর উপন্যাস সমূহে বিভিন্ন মতবাদকে এভাবে চরিত্রদান করার চেষ্টা করেননি। বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে তিনি আলাদা পুস্তকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তওফীক গল্প উপন্যাস নাটক বা রম্য রচনার বাহিরে খুব কমই বই লিখেছেন, তাই তিনি তাঁর সব চিন্তা, বিশ্বাস অভিজ্ঞতা উপন্যাস ও নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাওফীকের উপন্যাস দীর্ঘ হওয়ার এটিও ছিল একটি কারণ।

উপন্যাসের শ্রেণী বিশ্লেষণে ব্যক্তিগত জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস অন্যতম। তওফীক আল-হাকীমের প্রায় সবগুলো উপন্যাসই তাঁর ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রীক। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িক

---

১০. তওফীক আল-হাকীম, উসফুর মিন আল-শারক, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসিকদের থেকে বিশেষ ধারার অধিকারী[১১]। তাঁর সময়ের উপন্যাসিকদের মধ্যে ত্বাহা হোসাইন একটি মাত্র উপন্যাসই ব্যক্তিজীবনী কেন্দ্রিক লিখেছেন।

'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাসে তাঁর বাল্যকাল, স্কুল জীবন, গ্রামের কৃষক সমাজে সাথে তার অবস্থান, বান্ধবী সানিয়্যার সাথে সংলাপ, পিতা মাতার সাথে ভ্রমন, কৃষক সমাজের জীবন যাত্রা, স্কুল জীবনের স্মৃতি, এসব কিছু তাঁর ব্যক্তি জীবনের চিত্র। শুধুমাত্র গল্পের রূপে কিছুটা আবেগ ও রস দিয়ে শিল্পের খাতিরে কিছুটা কমিয়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। এখানেও নায়ক মুহসিন, নায়িকা সানিয়্যা।

'উসফুর মিন আল-শারক' উপন্যাসেও নায়ক মুহসিন। প্যারিসে তার চার বছর অবস্থানের অভিজ্ঞতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'ইয়াওমিয়াত নাইব আল-আরইয়াফ' ও তাঁর বিচার বিভাগে চাকুরিকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ডায়েরী। গ্রামের বিচার প্রার্থী ও আসামী লোকদের বিচার ও বিচারকদের আচরণ, আইন সম্পর্কে কৃষকদের অজ্ঞতা এসব কিছুই তার অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণিত হয়েছে। 'আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস' উপন্যাসেও তিনি রাহের আল-মুফাক্কির বা সাধক লেখক নামে অভিনয় করেছেন।

'হিমার আল-হাকীম' এটিও তার সংস্কৃতি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চিত্র ও সংস্কৃতি জগতের তারকাদেরসহ অন্যান্যদের দুর্নীতি বা অবিবেচক ভূমিকাকে রূপকভাবে গল্পের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। ভিন্ন প্রসংগে বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাস সমূহ ব্যক্তি জীবন কেন্দ্রিক ছিলনা। উপন্যাসিক হিসেবেই তাদের দু'জনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার এ বিষয়টি অবশ্যই গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

প্রেমের চরিত্র বর্ণনায় তওফীক আল-হাকীম দীর্ঘ সংলাপ চালিয়ে গেছেন। এত দীর্ঘ সংলাপে মনে হয় যেন প্রেম মূখ্য বিষয় নয় বরং প্রেমের এ দীর্ঘ সংলাপে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়ে প্রেমকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু ত্বাহার উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী প্রেমের চরিত্র সব কিছুইকে পরাজিত করে

---

১১. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমই চিরন্তন বলে প্রতীয়মান হয়। 'আল-রাবাত' উপন্যাসে স্ত্রী চরিত্র, 'দো'আ' আল-কারাওয়ানে' আমিনা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি ফুটে উঠে।

গ্রামীণ জীবনের চিত্র কৃষকের জীবন যাত্রা, অনুভূতি তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য চরিত্র পেয়েছে। বিশেষ করে আওদাত আল-রূহ উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে কৃষকদের জীবন, গ্রামের জীবনের চিত্র যেমন-একই কক্ষে পাঁচ জন পরিবারের সদস্যকে রাত্রি যাপনের যে দৃশ্য উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করার মত[১২]।

اتراهم فلاحين من اهل الأريأف اعتأدوا المبيت هم
ومواشيهم فى قاعة واحدة

জীবনের শত সমস্যা সহ্য করেও তারা প্রভুর দরবারে কোন অভিযোগ করেনা। তাদের জীবনে চাহিদা খুবই স্বল্প[১৩]। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কাজের মধ্যে থেকে গান গায়।

'ইয়াওমিয়াত' এবং 'হিমার' উপন্যাসে কৃষকের জীবনের চিত্র রয়েছে। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন থেকে শহুরে জীবনের চিত্রই অধিক বর্ণিত হয়েছে।

'আওদাত আল-রূহ' উপন্যাসে নায়কের পিতা-মাতা, চাচা, ফুফু, বোন, ভাইসহ এমন পারিবারিক দৃশ্যের চরিত্র ত্বাহার উপন্যাসে দেখা যায় না।

শিল্প বিচারে তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাস সার্থক ও শ্রেষ্ঠ একথা সমালোচক ও গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন[১৪]। প্যারিসে থাকাকালীন তওফীক ফরাসী নাটক ও উপন্যাসের টেকনিক ও রচনাশৈলী রপ্ত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যেকোন মূল্যে তাকে এই শিল্পে উপন্যাস নাটক লিখে

---

১২. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৭।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
১৪. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

একজন উপন্যাসিক বা নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটা ছিল তাওফীকের সাধনা। এ সাধনায় তওফীক সফল হয়েছেন।

এ জন্য তাওফীকের উপন্যাসের বিষয় থেকে শিল্পমান মূখ্য। তবে তার উপন্যাসে বিষয়বস্তু অস্পষ্ট এমনটি নয়, বরং উপন্যাসের শিল্পগুনকে ক্ষুন্ন করে তিনি কিছু রচনা করতে যাননি। এ প্রেক্ষাপটে তওফীক আল-হাকীমের 'আওদাত আল-রূহ'কে সমসাময়িক অন্যান্য উপন্যাসিকদের উপন্যাস থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়[১৫]। ত্বাহা হোসাইনও ফরাসী শিল্প টেকনিক আয়ত্ব করেছিলেন এবং ফরাসী সংস্কৃতিকে তওফীক থেকে অধিক অনুসরণ করেছিলেন। তথাপি তার উপন্যাসের টেকনিকের প্রতি লক্ষ্য করে গবেষক পর্যবেক্ষণ করবেন যে, তিনি তার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার বিষয়ে যতটুক গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন উপন্যাসের শিল্প বা টেকনিকের প্রতি ততটা মনোযোগী ছিলেন না। তাওফীকের মত এখানেও একই কথা আসে ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে কি শিল্প উপেক্ষিত হয়েছে অথবা দুর্বল? না- তা কিন্তু নয়।

শিল্পী হওয়া তাঁর মুখ্য বিষয় ছিলনা, শিল্প থেকে বিষয়কেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, কখনো তার শিল্পও উৎকৃষ্টতার চরম শিখরে আরোহন করেছে। সমাজের কুসংস্কার ও নারী নির্যাতনের চিত্রকে তিনি তুলে ধরে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন উপন্যাসিক হিসেবে নয়। তাই নারী নির্যাতন ও পীর পূজার নামে সমাজে কুসংস্কারকে তিনি তার উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নিবার্চন করেছেন 'শাজারাত আল-বুস' উপন্যাসে। তাই ত্বাহার উপন্যাস চরিত্র মানুষের হৃদয়ের একান্তে চলে যায়। গভীর গবেষণা করলে দেখা যায় ত্বাহা হোসাইনের রচনাশৈলীতে আল কুরআনের বাচন ভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। যা তার প্রায় সবকটি উপন্যাসেই লক্ষ্যনীয়।

উল্লেখ্য যে, ত্বাহা হোসাইন শৈশবে কুরআনে হাফিজ হয়েছিলেন এবং তার শিক্ষা জীবনের প্রধান অংশ ব্যয় হয়েছে জামে' আল-আযহারে। যেখানে তিনি কুরআন হাদীছসহ অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ণ করেছেন। আলকুরআনের সাহিত্য মান পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'আল আদব আল-জাহিলী'

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সঙ্গত কারণেই ত্বাহার উপন্যাস ও কথা সাহিত্য রচনায় আল-কুরআনের গদ্য ভঙ্গি বা বাচন ভঙ্গির প্রভাব পড়েছে। তিনি দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং একই শব্দ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় সমার্থক একাধিক শব্দ ব্যবহার করেছেন এধরণের পুনরাবৃত্তি রচনাশৈলী আল-কুরআনের বাচনভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই আধুনিক শিল্প বিচারে ত্বাহার উপন্যাসে কোথায়ও শিল্পমান কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও সার্বিক বিচারে তাঁর শিল্প উন্নত ছিল এ জন্য পাঠকের নিকট তার বক্তব্য এতটা জনপ্রিয়।

অন্যদিকে তাওফীকের রচনায় আধুনিক শিল্পমান পুরোপুরি থাকলেও যেহেতু তিনি আল-কুরআন চর্চায় ত্বাহা থেকে পিছিয়ে ছিলেন তাই আল-কুরআনের রচনা শৈলীর প্রভাব তার মধ্যে স্বল্পমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তিনি শিল্পকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন তাই তার বিষয়বস্তু তথা তার উপন্যাস দীর্ঘ হয়েছে এবং ত্বাহার উপন্যাস সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে মানবিকতা, মমত্ববোধ যতটা সেক্ষেত্রে তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে জীবন দর্শন চিত্রিত হয়েছে বেশী। মানব প্রেম সবার উপরে স্থান পেয়েছে ত্বাহার চরিত্রে। আর তাওফীকের উপন্যাসে জীবন ও প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম দু'জনই সংগীতের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসে তওফীক সংগীত উল্লেখ করেছেন ত্বাহা হোসাইন করেছেন এমনটি দেখা যায়না। ত্বাহা হোসাইন মুক্ত চিন্তার জগতে আরব বিশ্বের উজ্জ্বল দিকপাল হিসেবে আখ্যায়িত। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি কখনো হোচট খেয়েছেন নিজের কাছে আবার কখনো আঘাত খেয়েছেন প্রতিপক্ষের কলমে। তিনি যেহেতু ছিলেন অন্ধ, বাল্যকাল কেটেছে দরিদ্রতার মধ্যে অতএব তিনি মানসিকভাবে কিছুটা প্রতিবাদী হিসেবেই গড়ে উঠেছেন সমাজের কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদের ভাষা মার্জিত ভদ্র হবে এমন আশা করা ভাল, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রথম জীবনে তিনি মিসরীয় সমাজ জীবনের কুসংস্কার আর অনগ্রসরতার জন্য ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের কর্ম বিমুখ নীতিমালাকে কিছুটা দায়ী করেছিলেন কিন্তু পরিণত বয়সে নিজেই তার ভুল স্বীকার করেছেন এবং তিনি ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে জাতীয় উন্নতির পথ সুগম করার জন্য ইসলামী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ এমনকি উপন্যাস, 'আল-ওয়াদ আল-হক্ক' এর অন্যতম। ত্বাহার এই প্রতিবাদী মানসিকতা ও মুক্ত চিন্তা ফুটে উঠেছে তার উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে। তেমনি ভাবে ইসলামী ঐতিহ্যের সোনালী চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে তার উপন্যাসের মাধ্যমে।

তওফীক আল-হাকীম কখনো এতটা প্রতিবাদী ছিলেন না যে, তিনি মিসরীয় সমাজ ভেঙ্গে নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন অথবা ইসলামী মূল্যবোধকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। তার রচনায় বিশেষ করে নাটক উপন্যাসে প্রথম জীবন আর শেষজীবন প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে চরিত্র নির্মিত হয়েছে অথবা গল্প চিত্রিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণে ত্বাহা হোসাইন যতটা সমালোচিত হয়েছেন বিশেষ করে রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে তওফীক আল-হাকীম তেমনটি হননি।

১৯৫৫ খৃ. সালে তওফীক আল-হাকীমের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, আল-তা'আদালিয়া'ভারসাম্য' (জীবন ও শিল্পে আমার দৃষ্টি ভঙ্গি) ঃ এই ভারসাম্য নীতিমালা যার ঘোষণা তওফীক নিজে দিয়েছেন তার রচনাবলী ও উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়েছে বিভিন্ন বিষয় চরিত্রে ও বাচন ভঙ্গিতে। কথা সাহিত্যে ও উপন্যাসে দু'বন্ধু ত্বাহা ও তাওফীকের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলা কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের সাথে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। তওফীক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভারসাম্য ও আভিজাত্য ধারার কথা সাহিত্যিক আর ত্বাহা নজরুলের স্বাধীন বিদ্রোহী ধারার উপন্যাসিক। তওফীক ছিলেন ধনী ভূস্বামী পিতা ও তুর্কী মায়ের সন্তান। খাদেম বেষ্টিত জীবনে তার বাল্যকাল বেড়ে উঠেছে তাই তার উপন্যাসে আভিজাত্যের ছায়া চরিত্র বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিশেষ করে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আওদাত আল-রূহতে।

ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসের চরিত্রে অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র তেমন চিত্রিত হয়নি, বিভিন্ন বিষয় বা চরিত্রকে সার্থকভাবে বর্ণনা করতে আভিজাত শ্রেণীর সাথে যতটুকু সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল এর বেশী তার উপন্যাসে খুজে পাওয়া যায়না। তাওফীকের রচনায় যেখানে জীবনের উপকরণ বিলাসীতা হাতছানী দেয় সেখানে ত্বাহার বর্ণনায় কঠিন বাস্তবতা বার বার নির্মম আঘাত হানে।

Dhaka University Institutional Repository

তওফীকের বর্ণনায় করুণ পরিণতি নির্যাতন, হাহাকারে নিহত হওয়া, ধর্ষিতা হওয়া এসব চরিত্র স্বল্প মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ত্বাহার উপন্যাস চরিত্রে এসবের করুণ দৃশ্য দেখা যায়। তাই ত্বাহার রচনায় যতটা আবেগ রয়েছে তাওফীকের রচনায় জীবনের গান রয়েছে তার চেয়ে বেশী। তওফীক জীবন নিয়ে বলেছেন বেশী ত্বাহা হৃদয়কে খুলে দিয়েছেন অধিক। পশুপাখী কৃষক গ্রামীণ জীবন দিয়ে তওফীক যেখানে জীবন সাজিয়েছেন সেখানে ত্বাহা শত বাধা দুঃখ অতিক্রম করে মানবীয় মূল্যবোধকে এগিয়ে নেয়ার গানে সুর দিয়েছেন।

নারী চরিত্র তাওফীকের বর্ণনায় মর্যাদার বিলাসীতার ও আভিজাত্যের সাথে প্রেমের প্রতীক। তিনি প্রগতিতে আস্থাশীল। নারীকে তিনি বড় করে দেখেছেন নারীর অধিকারের চরিত্রকে বলিষ্ঠতার সাথে প্রদর্শন করেছেন। ত্বাহা নারীকে প্রেম নির্যাতন হতাশা প্রতিবাদী চরিত্র দিয়ে মুক্তির জয়গান গেয়ে অগ্রসর হতে শিখায়েছেন। তাওফীকের জীবনে ও উপন্যাসে তার তুর্কী মা'র প্রভাব সর্বদাই কার্যকরী ছিল। যিনি ছিলেন অভিজাত্যের প্রতীক সংস্কৃতিবান সর্বদাই কার্যকরী ছিল। আওদাত আল-রূহ ও আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাসে এ চিত্রই বার বার মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

ত্বাহার উপন্যাসে মায়ের পরিশ্রমী চেহারার ছায়া সকল নারী চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে, তেমনিভাবে ফরাসী প্রেমিকা স্ত্রীর সহযোগী প্রেমময়ী রূপেও তাকে আন্দোলিত করেছে নারীর গভীর প্রেম চরিত্র নির্মাণে। ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে স্বার্থপরতা, পরিবেশের ভিন্নতায় ব্যক্তির পরিবর্তিত মানসিকতা নৈতিক পদস্খলন বিভিন্ন চরিত্রে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'আদীব চরিত্র', ইঞ্জিনিয়ার, আমিনা মেকজিনসহ বিভিন্ন চরিত্রে। তাওফীকের উপন্যাসে এধরণের পরিবর্তিত মানসিকতার চরিত্র তেমন চিত্রিত হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তর তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। এ দ্বন্দ্বে মিসর শরিক ছিল। এ দ্বন্দ্ব সভ্যতা সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। তাওফীকের উপন্যাসে সভ্যতা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব চরিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে উসফুর মিন আল-

Dhaka University Institutional Repository

শারক উপন্যাসে প্রধান বিষয় ছিল প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সভ্যতার দ্বন্দ্ব। যে কথা উল্লেখ করেছেন মিসরীয় গবেষক ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর [১৬]।

ত্বাহা হোসাইনের রচনায়ও দ্বন্দ্বের বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু তিনি উপন্যাসে বা গল্পে এ সব চরিত্রকে মূল বিষয় হিসেবে চিত্রিত করেননি বরং তিনি এ সংঘাতকে উপন্যাসে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে তওফীক উপন্যাসে যতটা সহজ ও সাবলীল ছিলেন অন্যান্য রচনায় তিনি এত সহজ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে পারেননি। তাঁর কথা সাহিত্য এবং প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনায় দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয় ।

কিন্তু ত্বাহা হোসাইনের উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য ধারা অন্যান্য রচনায়ও পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্বাহার উপন্যাসে আত্মমর্যাদাবোধ চরিত্র প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে বিশেষ করে দো'য়া আল-কারাওয়ান উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে। "শির দেব তবু নাহি দেব আমামা" চরিত্রের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় নাসীর, হানাদী ও আমিনা চরিত্রে। এই আত্মমর্যাদার জন্য তাদের জীবন বিসর্জন দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। এ ধরণের ছরি তাওফীকের রচনায় কমই পরিলক্ষিত হয়।

নায়ক ও নায়ীকার নাম উল্লেখ না করে চরিত্র নির্মাণ করা তাওফীকের উপন্যাসের রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট, যেমন- আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস উপন্যাসে তিনি স্ত্রী শব্দে নায়ীকাকে উল্লেখ করেছেন উপন্যাসের কোথায়ও তিনি স্ত্রীর নাম ব্যবহার করেননি। তেমনি স্বামী শব্দ দিয়েই তিনি নায়কের চরিত্র বুঝায়েছেন এই স্বামী আর কোন নামেই পরিবর্তিত হয়নি। আমি শব্দ দিয়েই লেখক হিমার আল-হাকীম উপন্যাসের নায়ক চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আমি শেষ পর্যন্ত বর্ণনাকারী এবং নায়ক হিসেবে আমিই ছিল। মুহসিন যা তওফীক নামে রূপান্তরিত হয়নি।

ত্বাহা হোসাইন নায়ক নায়িকার চরিত্র নির্ধারণে নাম ব্যবহার করেছেন। শুধু মাত্র আল-আয়্যাম যা তার আত্মজীবনী মুলক উপন্যাসে বা জীবনীতে সেখানে তিনি সে বালক বলে নায়ক

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থাৎ নিজকে বঝায়েছেন কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল উপন্যাসে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ করেছেন।

বিলাস কল্পনা প্রসূত উপন্যাস আধুনিক আরবী উপন্যাসে খুব কমই চরিত্র পেয়েছে। তথাপি তাওফীকের তুলনায় তাহা হোসাইনের চরিত্র নির্মাণ বাস্তবতার অধিক কাছাকাছি ছিল। অর্থাৎ ত্বাহার চরিত্রে বিষয়ই মুখ্য ছিল শিল্প বা বিনোদন নয়। রোমান্স ও বিনোদনের জন্য তিনি আলাদা রম্য রচনা প্রনয়ন করেছেন যেমন- 'কাসর আল-মাসহুর' যা উপন্যাসের কাছাকাছি শিল্পে বর্ণিত। সেখানেও তিনি বন্ধু তওফীককে নায়ক রূপে অভিনয় করার জন্য বাছাই করেছেন। দুই বন্ধু উপন্যাসিক যাদের যৌথ উদ্যোগে আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ও গতি পেয়েছে। যার স্বীকৃতি দেখা যায় ১৯৮৮ খৃ. সালে আধুনিক আরবী উপন্যাসে নাজীব মাহফুজের নভেল পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে। যে কথা নাজীব মাহ্ফূজ নিজেই স্বীকার করেছেন এ পুরস্কার পাওয়ার উচিত ছিল ত্বাহা হোসাইন তওফীক আল-হাকীম এবং আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদের যাদের অবদান আধুনিক আরবী উপন্যাসকে করেছে বেগবান ও সমৃদ্ধশালী। বিশ্ব সাহিত্যে আধুনিক আরবী হয়েছে স্বীকৃত ও জনপ্রিয়।

অনেক মিল থাকা সত্বেও ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের রচনাশৈলী বিষয়বস্তু চয়ন উপস্থাপনা ও শিল্প বিচারে নিজস্ব স্বকীয়তায় দীপ্তমান। সমাজের প্রতি লেখক বা সাহিত্যিকদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ত্বাহা এবং তওফীক উভয়েই সচেতন ছিলেন। আদীব চরিত্রে লেখক যেমন নায়কের উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেছেন তেমনিভাবে তওফীক আল-হাকীম সাধক লেখক চরিত্রে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহে দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের অশান্তি দুর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিযেছেন।

ত্বাহা হোসাইন ব্যক্তি জীবনে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন আর তওফীক সাধনা করেছেন। ত্বাহা প্রতিবাদী ছিলেন, বিপ্লবী ছিলেন উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে তা প্রমানিত হয়েছে। তওফীক

Dhaka University Institutional Repository

ধীরস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পিতা থেকে এ চরিত্র পেয়েছিলেন[১৭], যা তাঁর নিজ বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন বিভিন্ন বিপরীত বিষয়কে একই টেবিলে পরিবেশন করার চেষ্টা করতেন। তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্র ফুটে উঠেছে। তওফীক জীবনকে মূল্যায়ন করেছেন যে, মানুষ চিন্তা কল্পনায় স্বাধীন কিন্তু কর্মে ও পরিবেশে পরাধীন।

স্বাধীন চিন্তা ও স্বপ্নকে তিনি জীবনের ফুল বলে আখ্যায়িত করে রচনা করেছেন 'যাহরাত আল-উমর', তেমনিভাবে জীবনের কঠিন বাস্তবতা তথা কর্ম ও পরিবেশকে তিনি কারাগার হিসেবে চিত্রিত করে রচনা করেছেন 'সিজন আল-উমর' বা জীবনের কারাগার নামক আত্মজীবনী[১৮]। দায়িত্বকে তিনি ভয় পেতেন, আল-রাবাত আল-মুকাদ্দাস উপন্যাসে তিনি বিবাহকে এড়িয়ে বা পিছিয়ে রাখার চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহ করেছেন যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায় কিন্তু ত্বাহা হোসাইন সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে সকল প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ করে হানাদী সেজে এগিয়ে গিয়েছেন, এইভাবেই তাঁর উপন্যাসে চরিত্র নির্মিত হয়েছে। তওফীক ছোট বয়সে মাকে গল্পের বই পড়তে দেখেছে, খাটের নিচে লুকিয়েও গল্পের বই পড়েছে[১৯]। সেই সময় থেকেই গল্প শিল্পের সাথে তার পরিচয়। অতএব তওফীক শিল্পগুণ উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। উপন্যাসিক হিসেবে ডঃ ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিচারে ভিন্ন হলেও তাদের উপন্যাসে শুধু আরবী কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি বরং বিশ্ব সাহিত্যকে সংযোজন করেছে। তাদের অবদানের কারণেই তাদের উত্তরসূরী আরবী উপন্যাসে আন্তর্জাতিক নোবেল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নাজীব মাহ্ফুজ সত্যিই বলেছিলেন আমাকে নোবেল পুরস্কার না দিয়ে বরং ডঃ ত্বাহা হোসাইন, তওফীক আল-হাকীম ও আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদকে দেয়া উচিত ছিল। কারণ এদের অবদানই আধুনিক আরবী উপন্যাসকে বিশ্ব সাহিত্যের শীর্ষ স্থানে পৌছে দিয়েছে।

---

১৭. তওফীক আল-হাকীম, সিজন আল-উমুর, পৃ. ২৬১।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্ব সাহিত্যে তাঁদের উপন্যাসের স্থান

যে কোন সাহিত্যের চাহিদা ও আবেদন যখন বিশ্বজনীন হয় তখনই সেই সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা যায়। ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম সাহিত্যিক, উপন্যাসিক ও লেখক হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিত ও সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপন্যাস শুধু নয় বরং তাঁদের প্রতিটি রচনা ও গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। তাঁদের উপন্যাস শুধুমাত্র মিসরীয় পাঠকের নিকট জনপ্রিয় ও বহুপাঠ্য নয় বরং আরব বিশ্ব, মুসলিম বিশ্বের গন্ডি পেরিয়ে ইউরোপ আমেরিকার প্রতিটি ভাষাভাষি ও সমাজের কাছে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে গেছে।

তাঁদের প্রতিটি উপন্যাস আরবীতে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে পাঠককে আনন্দিত করেছে। উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাস কোনটিই মিসরে অনূদিত বা প্রকাশিত হয়নি। প্রতিটি উপন্যাস লন্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো সহ বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন ছিলনা, বরং সাহিত্যমান শিল্পগুণ ও পাঠকের জনপ্রিয়তার কারণেই এইসব অনুবাদ দ্রুত পূণঃ পূণঃ মূদ্রিত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যে বিপুল ভাবে আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছে। এমনকি কয়েক দশক পুর্বেই বাংলা সাহিত্যেও ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাস ও নাটক অনূদিত হয়ে বাংলাভাষি পাঠকের সুপাঠ্য হয়েছে। উপন্যাসের শিল্পগুণ রচনা শৈলী উপস্থাপনা শুধু বিশ্ব সাহিত্যের সাথে প্রতিযোগীতায় উর্ত্তীণ ছিল এমনটি নয় বরং বিষয় বস্তু সহ আঙ্গিক কাঠামোসহ সাহিত্যের টেকনিক উপস্থাপিত হয়েছে ত্বাহা ও তাওফীকের উপন্যাসে সার্বজনিন বিচারে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতি পূর্বে তাদের উপন্যাসের মূল্যায়ণ করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এইসব উপন্যাসের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট সমাজের জন্যই প্রযোজ্য ছিলনা। প্রেম ও বিরহের সার্থক চিত্র অনুপম ভঙ্গিতে অংকিত হয়েছে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাসে। প্রেম চিরন্তন, প্রতিটি সমাজের রয়েছে এসব চরিত্রের আবেদন। নারী নির্যাতন, নারী প্রগতি, সব চরিত্রের প্রায় প্রতিটি সমাজই আবেদন রয়েছে। নারীর বঞ্চনা এবং নারীর প্রতিবাদী চরিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত রয়েছে তাদের বিভিন্ন উপন্যাসে। স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক অধিকার প্রতিটি সমাজে শুধু নয় প্রতিটি মানুষেরই মজ্জাগত অনুভূতিতে এইসব চরিত্র রেখাপাত করতে বাধ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি তাকালে মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের বিভিন্ন অধ্যায়ে সভ্যতা সংস্কৃতি ও অধিকারের দ্বন্দ্ব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তাই প্রতিটি জনপদে নিকট অতীত বা দুর অতীত অথবা বর্তমান সংঘাতে সমাজ জর্জরিত। স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার সংগ্রাম মানুষের জন্মগত স্বভাবের সাথে মিশে আছে প্রতিটি মানুষের অস্থিমজ্জায়, আর এইসব বিশ্বজনীন চরিত্র ও চিত্রকে প্রকৃতির বিচিত্র শোভায় চিত্রিত করেছেন ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম তাদের শিল্পতুলিতে আরবী কালি দিয়ে।

মিসরের স্বাধীনতার আন্দোলন আর স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অন্য দেশেও প্রযোজ্য অতএব উপন্যাসে চিত্রিত এসব চরিত্র অনেক দেশের জন্যই প্রযোজ্য। প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তর এশিয়া ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বে সভ্যতা ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব স্নায়ু যুদ্ধের সৃষ্টি করে। সার্থক সাহিত্য হিসেবে উপন্যাসে পরিবেশ সমাজের এসব প্রেক্ষাপট নিয়ে গল্পের প্লট তৈরী হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব এসব উপন্যাসের চরিত্র গুলো ভিনদেশের সমাজের কাছে পরিচিত বিষয় হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে।

ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম আরবী ভাষায়ই শুধু দক্ষ ছিলেন না। তাঁরা ইংরেজী ফরাসী ও রুশ ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন এমনকি গ্রীক ইতালী ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল। ব্যক্তিগতভাবে উভয়েই ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কয়েক শতাব্দী থেকে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসারী। ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে তাদের গভীর অনুরাগ ও অধ্যয়ন ছিল।

পক্ষান্তরে কয়েক শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতা পৃথিবীকে পরিচালিত করেছে, এই মুসলিম সভ্যতা শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মিসরে। মিসরের সমাজের সদস্য হিসেবে ত্বাহা ও তওফীক উত্তরাধীকারী সূত্রে এসব সভ্যতার প্রভাব বলয়ে ছিলেন। মুসলিম সভ্যতারও পূর্বে মিসরে ছিল প্রাচীন সভ্যতা যা পৃথিবীর আদি সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত। আধুনিক যুগের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'জামে আল-আযহার' ত্বাহা হোসাইন ছিলেন এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তওফীক আল-হাকীমের পিতা ও দাদাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আযহার কেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে ছিল তওফীক আল-হাকীমের পারিবারিক সম্পর্ক।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সাহিত্যের চাহিদা ও মান অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করা তাঁদের জন্য সহজ হয়েছে। ত্রিমুখি সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সূত্রের সাথে জড়িত থেকে এবং ব্যক্তিগত গভীর অধ্যয়ন ও নিষ্ঠাই ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমকে বিশ্বসাহিত্যের মানে উপন্যাস রচনায় সহযোগীতা করেছিল। এই জন্যই তাঁদের উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের আসনে আসীন হয়েছে।

ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই দু বন্ধুর নেতৃত্বে মিসরে তথা আরব বিশ্বে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি অন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের এই আন্দোলন শুধু মাত্র সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজ সংস্কারসহ রাজনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক দূর এগিয়েছিলেন। যদিও তওফীক আল-হাকীম বরাবরই রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা কিন্তু সব সময়ই এসবে সক্রিয় ছিলেন।

অতএব একথা সাহিত্য সমালোচকগণ স্বীকার করবেন যে, ত্বাহা ও তাওফীকের উপন্যাস শিল্প বিচার ও জনপ্রিয়তার বিচারে বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখ যোগ্য সংযোজন। তাঁদের আন্দোলনের ফসল

Dhaka University Institutional Repository

অনেকাংশে সফল হয়েছে নাজীব মাহফুজের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে। নাজীব ছিলেন ত্বাহা ও তাওফীকের সফল উত্তর সুরী যে কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। নাজীব নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের জন্য। অতএব আধূনিক আরবী উপন্যাস তথা ত্বাহা ও তাওফীকের উপন্যাসে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই।

ত্বাহা ও তওফীক অনেক গল্প উপন্যাস ও নাটকসহ বহু রম্য রচনা লিখেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিটি রচনাই অনূদিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে। পৃথিবীর নিরক্ষর জনগোষ্ঠির কাছেও তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়েছে। ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমের উপন্যাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে গবেষক সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বাংলা উপন্যাসের সাথে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও শিল্প ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তুলনা করার মত সুযোগ কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিক কবি আবদুস সাত্তার মন্তব্য করেছেন "আধুনিক আরবী সাহিত্য ও আধুনিক উপন্যাস সমৃদ্ধ সহিত্যে হিসেবে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে, বাংলা উপন্যাসের সাথে আরবী উপন্যাসকে তুলনা করার মত বিষয় খুবই স্বল্প।" একই মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ।

ত্বাহা ও তাওফীকের উপন্যাসে মানববোধ ও মানবিকতা যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় কয়েকটি বই অনূদিত হলেও তাঁদের সবগুলো উপন্যাস ও নাটক বাংলায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে গবেষক ভবিষ্যতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেই 'উপন্যাসিক হিসেবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীমঃ তুলনামূলক আলোচনা' গবেষণা অভিসন্দর্ভ এর সমাপ্তি টানা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

১. ত্বাহা হোসাইন, দোআ'আল্-কারাওয়ান দার আল্-মা'আরিফ (কায়রো) মিসর ১৯৭৪খৃ.

২. '' শাজারাত আল্-বু'স - - ঐ

৩. '' আদীব - - ঐ

৪. '' আল্-হুব্ব আল-দা'য়ি' - - ঐ

৫. '' আল্- ও'আদ আল্-হক্ক - - ঐ

৬. '' ফীআল্-আদব আল্-জাহিলী - ঐ

৭. '' মেরয়াত আল্-ইসলাম - ঐ

৮. '' কাদাত আল্-ফিকর - ঐ

৯. '' আল্-আয়্যাম' - ঐ

১০. '' হাদীছ আল্-আরবি'আ' - ঐ

১১. '' মা'আল্-মুতানাব্বী - ঐ

১২. '' ফসুল ফীআল্-আদব ওয়া আল্-নকদ - ঐ

১৩. '' হযরত উসমান (উর্দু সংস্করণ, পাকিস্তান)

১৪. '' খোদায়ী ও'আদা ('' '' '')

১৫. তওফীক আল-হাকীম, আওদাত আল-রূহ, দার আল-মা'আরিফ কায়রো ১৯৩৩ খৃ.

১৬. '' হিমার আল-হাকীম '' '' ১৯৪০ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	''	উসফুর মিন আল-শারক	''	১৯৩৭ খৃ.
১৮.	''	ইয়াওমিয়াত নাইব ফী আল-আরইয়াফ	''	১৯৩৭ খৃ.
১৯.	''	আল-রাবাত আল মুকাদ্দাস	''	১৯৪৪ খৃ.
২০.	''	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	''	১৯৩৬ খৃ.
২১.	''	সিজন আল-উমর	'' ''	১৯৭৩ খৃ.
২২.	''	যাহরাত আল-উমর	'' ''	১৯৪৩ খৃ.
২৩.	''	হায়াতী	'' ''	
২৪.	''	আল-তা'আদালিয়া	'' ''	
২৫.	''	ফান্ন আল-আদাব	'' ''	১৯৫২ খৃ.
২৬.	''	শাজারাত আল-হিকাম	'' ''	১৯৪৫ খৃ.
২৭.	''	আল-মালিক উদীব	'' ''	১৯৪৭ খৃ.
২৮.	''	মাসীর সারসার	'' ''	১৯৬৬ খৃ.
২৯.	''	আল-সুলতান আল-হায়ির	'' ''	১৯৬০ খৃ.

৩০. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আবারিয়্যা আল-হাদীছা ফী মিসর, কায়রো, ৫ম সংস্করন, ১৯৯২ খৃ.

৩১. ডঃ শাওকী দায়ফ, হাফিজ ওয়া শাওফী '' কায়রো

৩২. '' '' '' তারীখ আল-আদব আল-আরবী, বৈরুত, ১৯৮৪ খৃ.

৩৩. মুস্তফা লুৎফী আল-মানফালুতি, আল-ফাদীলা, ''

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. মুস্তফা লুৎফী আল-আবারাত,

৩৫. আলী আল-ত্বানত্বাবী, কিসাস মিন আল-তারীখ, বৈরুত

৩৬. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, দার আল-মা'আরিফ, (কায়রো,মিসর), ১৯৬১ খৃ.

৩৭. শুনাইমি হিলাল, আল-আদব আল-মোকারিন (দারন্নাহদা, মিসর)

৩৮. ফী আল-আদব আল-হাদীছ, ওমর আল-দাসুকী, দার আল-ফিকর (কায়রো, মিসর) ১৯৭৩ খৃ.

৩৯. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-'আরবী, (বৈরুতঃলেবানন,)

৪০. আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদব আল'আরবী, উর্দু অনুবাদ আঃ রহমান তাহের সুরতী (লাহোর ১৯৬১ খৃ.)

৪১. আনীস আল-মুকাদ্দাস, আল-ফানুন আল-আদবিয়া ওয়া ইলামুহা ফী আল নাহ্দাআল-আরাবিয়া আল-হাদীছা, বৈরুত, ১৯৭৮ খৃ.

৪২. ইবরাহীম আল-সাআফীন, তাত্বাওয়ার আল-রেওয়া আল-'আরাবীয়া আল- হাদীছা ফী বিলাদে আল-শাম (১৮৭০-১৯৬৮) ইরাক, ১৯৮০ খৃ.

৪৩. জুরজী যায়দান তারীখ আল-আদব আর-লুগাত আল-'আরাবিয়া ৪র্থ খন্ড দার আল-হিলাল (কায়রো, মিসর)।

৪৪. উর্দু দয়েরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়া (পাঞ্জাবঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, লাহোর ১৯৬৪ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ নদভী, জাদীদ 'আরবী আদব কাইরতিকা (হায়দারাবাদ, চারকামান ন্যাশনাল ফাইন প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯ খৃ.)।

৪৬. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সহিত্য (ঢাকাঃ মুক্তধারা ১৯৭৪ খৃ.)

৪৭. '' আধুনিক আরবী নাটক, (ঢাকাঃ মুক্তধারা ১৯৭৬ খৃ.)

৪৮. '' তেলাপোকার ভাগ্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯৪ খৃ.

৪৯. '' সম্রাটের দ্বন্ধ, মুক্তধারা '' ১৯৮৭ খৃ.

৫০. '' শ্রেষ্ঠ আরবী গল্প, অনুক্ত প্রকাশনী '' ১৯৮৮ খৃ.

৫১. '' আরবী লোক সাহিত্য সাকীব ব্রাদার্স '' ১৯৭৪ খৃ.

৫২. '' আধুনিক আরবী কবিতা '' '' '' ১৯৭৬ খৃ.

৫৩. '' আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ খৃ.

৫৪. '' অন্ধ হয়েও অন্ধ নয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬ খৃ.

৫৫. মুহাম্মদ রেজাই করীম, আবর জাতির ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.

৫৬. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সহিত্যের ইতিহাস ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৫৭. খাদিজা আখতার রেজারী, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লাম আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন ১৯৯৭ খৃ.

৫৮. খোন্দকার শওকত হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীন সমাজ, ঢাকা ১৯৯২ খৃ.।

৫৯. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, লালসালু, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ.

৬০. আবদুল হাই - সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,

Dhaka University Institutional Repository

৬১. আবু ইছহাক, সূর্যদীঘলবাড়ী, ১৯৫৫ খৃ.

৬২. আবুল মনসুর আহমদ, আয়না,

৬৩. '' '' '' আসমানীপর্দা

৬৪. গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা, ১৯৭৭ খৃ.

৬৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ.

৬৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার মোমতাজী, ইসলামের আলো, তরফদার বিপনী ঢাকা, ১৯৭৬খৃ.

৬৭. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, ইংরেজী সহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ.

৬৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (১২শ খন্ড)

৬৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.

৭০. আল-মাহমূদ - যে ভাবে বেড়ে উঠি, অঙ্গীকার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ.

৭১. আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস, কে, আলী

৭২. বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭৩. ডঃ ইবরাহীম আবদুহ তারীখ আল- ওয়াকিয়া আল-মিসরিয়া (১৮২৮-১৯৪২) কায়রো, ১৯৪২ খৃ.

৭৪. E.H. Paxton, An Egyptian childhood, The Autography of Taha Hussein, London, 1932.

৭৫. R.A. Nicholson - A Literaroy History of the Arabs. London - 1979.

৭৬. M.M. Badawi - Modern Arabic Literature, London 1992.

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িকী

১. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা জুলাই-ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৭৭ খৃ.

২. ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সাহিত্য পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৯৩ বাংলা

৩. ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, নাজীব মাহফুজের সাহিত্যে জীবন সত্য, সাহিত্য পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০০ বাংলা

৪. আল-আরবী, অক্টোবর ১৯৯৩ খৃ. কুয়েত, ১৯৯৩ খৃ.

৫. মুহাম্মদ আবদুলহক, উপন্যাসিক হিসেবে ডঃ ত্বাহা হোসাইন, কলম, সাহিত্য মাসিক, মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট ১৯৯২ খৃ.

৬. অক্টোবর, কায়রো ১৯৮৪ খৃ., ২য় বর্ষ ৩৭৭ সংখ্যা ১৫ ই জানুয়ারী

৭. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর পটভূমি, সোনার বাংলা, ঢাকা, সংখ্যা জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯৮৪ খৃ.

৮. অধ্যাপক আহমদউল্লাহ, আধুনিক আরবী সাহিত্য ও ডঃ ত্বাহা হোসাইন, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২২ শে ফাল্গুন, ১৩৯২ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

৯. H.A.R. Gibb, the Egyptian Novel, Bulletin of the School of oriental studies London Institution Vol. VII, PP.1-22, 1935, London

১০. Pierrechachia, Taha Husayn his place in the Egyptian Literary Renaissance, London - 1956.